বিকিকিনির হাট

বিকিকিনির হাট

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

নতুন সাহিত্য ভবন ॥ কলিকাতা-২০

প্রকাশক

সুশীলকুমার সিংহ

নতুন সাহিত্য ভবন

৩ শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট

কলিকাতা-২০

মুদ্রক

প্রাণকৃষ্ণ পাল

শ্রী শশী প্রেস

৪৫, মসজিদবাড়ি স্ট্রীট

কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট

পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী

প্রথম সংস্করণ : শ্রাবণ ১৩৬৪

দাম চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

—এই লেখকের অন্যান্য বই—

তিন তাসের খেলা

কুয়াশার রঙ

প্রিয় প্রসঙ্গ

মা-কে—

যাঁর কাছে সাহিত্য ও জীবনের প্রথম পাঠ পেয়েছি, যাঁর মধ্যে গত যুগের সত্যনিষ্ঠ সংস্কারমুক্ত বাঙালী মহিলার আদর্শ রূপকে প্রত্যক্ষ করেছি।

একজন লোক যেন একটা শহরের কতকগুলি ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছিল। কতকগুলো স্মৃতিকে সে লালন করে রেখেছিল সযত্নে। বিকিকিনির হাট তারই স্মৃতির প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ বিবরণ। পুরোদস্তুর উপন্যাসের কোন্ পরিচয়-চিহ্ন এর মধ্যে উপস্থিত, কোন্‌টা অনুপস্থিত এ মীমাংসার দায় তার নয়।

একটা প্রশ্ন উঠতে পারে নবগঞ্জ কোথায়? ভূগোলে অথবা টাইম-টেব্‌লে সে নেই। কিন্তু বজবজ থেকে হাজিনগর পর্যন্ত গঙ্গার দু-ধারে ছড়ানো চিমনি-চিহ্নিত যে-কোনো উপনগরই নবগঞ্জ। যে-কোনো জায়গাতেই কাটিকেষ্ট, অ্যাসটন সায়েব, ধীরুবাবু, বকুলবালা, শোভার সাক্ষাৎ একদিন পাওয়া গিয়েছিল। স্পষ্টতই বলে রাখা প্রয়োজন এ কোনো বিশেষ শহরের গল্প-কাহিনী নয়।

আর একটা কথা—ঘটনা অথবা চরিত্রগুলি কতদূর সত্য? উপন্যাস (যদি এটা উপন্যাস) যতদূর সত্য এরা ততদূর সত্য। উপন্যাস যে অর্থে মিথ্যা সে অর্থে এরা মিথ্যা।

বিকিকিনির হাটের পাণ্ডুলিপির সঙ্গে অনেক তরুণ মুখের স্মৃতি জড়িয়ে রইল। আপাতত এ রচনার সেইটাই প্রথম পুরস্কার। বন্ধুবর প্রভাস বন্দ্যোপাধ্যায় নানান তথ্যাদি নির্ণয়ে আমায় সাহায্য করেছেন। আর একজনের সাহায্য না পেলে এ বই লেখা সম্ভব হত না,—তিনি শ্রীমতী মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তিনি আমার ধন্যবাদের কোনো ধার ধারেন না। —লেখক

এক

কুম্ভকারে ধুম্রাকার
ধুম্রাকারে মেঘাকার……

আজ কাল পরশু করে অনেক দিন কেটে গেছে।

সে অনেক দিন আগের কথা। এক গ্রামে দুই ব্রাহ্মণ থাকতেন। দুই ব্রাহ্মণ দুই ভাই। কিন্তু তাঁরা বড়ো গরিব। মাথায় তেল জোটে না, পরনে কাপড় মেলে না, জুটেছে ট্যানা। পায়ে খড়ম নেই, গলায় নেই উড়ুনি। পেটে নেই বিদ্যে, মাথায় নেই বুদ্ধি। তাঁদের দিন যায় তো প্রহর যায় না, প্রহর যায় তো ক্ষণ চলে না। থাকার মধ্যে একখানা কুঁড়ে, কিন্তু চালে খড় নেই। আর আছে দুজনের দুই বউ। তাও আবার দুই বউয়ে নেই মনের মিল। দুই জায়ে দিনরাত হয় কুরুক্ষেত্র, নয় লঙ্কাকাণ্ড। এটা দাও, ওটা নেই, আর অমুক দাও, তমুক চাই এই লেগে আছে। লক্ষ্মী নেই। অলক্ষ্মী আছে। বেস্পতি নেই, শনি আছে। কাজেই দুই ভাইয়ের মনে নেই সুখ। ঘরে মন তিষ্ঠোয় না। কাক চিল তো বসতেই পায় না, উপরন্ত শিয়াল কুকুরও ঘরের কাছে ঘেঁষে না—মানুষ কোন্ কথা। মনের দুঃখে এ গাঁয়ে ও গাঁয়ে তাঁরা ঘুরে বেড়ান—সেধে যেচে মেঙ্গে নিয়ে আসেন। আভরা পেট তবু ভরে না। মাথার জট মাথাতেই থাকে। চোখের জল চোখেই শুকোয়। গায়ের ঘাম গায়ে—কিন্তু দিন যে আর কাটে না।

মাঝে মাঝে মনে হয় গঙ্গার জলে ঝাঁপ দিয়ে সকল জ্বালা জুড়োন। কিন্তু বাঁচার আশা যে ফুরোয় না। তাই জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়েও খানিক ডুব দিয়ে খানিক সাঁতার কেটে চান করে মানুষকে আবার উঠে আসতে হয় ডাঙায়। গায়ের জল গায়ে বসিয়ে পরনের কাপড় পরনেই শুকিয়ে তাঁরা আবার ঘুরে বেড়ান। ঘরে ছায়া নেই, কাজেই ঘরের মায়াও নেই। গাঁয়ের নাম জামতলি। টোডরমলের জরিপেও জামতলি মৌজার কথা লেখা আছে। পাশ্চাত্ত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, রাঢ়ী শ্রেণীর কয় ঘর আর কিছু অন্য বর্ণের গেরস্ত নিয়ে গ্রাম। গ্রামের নিচেই প্রশস্ত গঙ্গা দক্ষিণবাহিনী। ওপারে বিস্তৃত ভূখণ্ডে ডাচ ডেন—ফরাসীদের সওদাগরী কুঠি, নৌ-ঘাঁটি—মোগল মহিমার শেষ অস্তলেখা তখন কবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে গাঙ্গেয় আকাশ থেকে। জামতলির জীবন

দেবনাগরী হরফে শাস্ত্র সংহিতার চর্চায় ব্যস্ত। ভারত ভাগ্যাকাশে তখন নতুন আভাস দেখা দিচ্ছে। দিচ্ছে দিক—জামতলি সে হরফকে চেনে না।
যে দুই ব্রাহ্মণের কথা বলছি তাঁরা কোনো হরফই জানেন না। জিজ্ঞাসা করলে বলতে পারেন আমরা অমুকের সন্তান। বংশ পরিচয়ও আর কিছু জানেন না। পিতৃ-পিতামহের নাম ছাড়া বংশ পরিচয় আর কিছু আছেই বা কোথা? কাজেই একইভাবে খুঁড়িয়ে হামাগুড়ি দিয়ে দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়। যেদিনের কথা সেদিন বৈশাখের শেষ দিন। সারাদিন গাছের একটি পাতা নড়েনি, দোলেনি একটিবারও তালগাছে বাবুয়ের বাসা। স্থির, নিস্পন্দ দিন ধিক্ ধিক্ ধিক্ ধিক্ নিঃশব্দে জ্বলে গেল আর সূর্য গঙ্গার ওধারে ঢলে পড়বার অনেক আগে, উজ্জ্বলরঙ আকাশ ছাই হতে লাগল কী এক আতঙ্কে। আকাশের কোণে যেন ঘুম ভেঙে মাথা চাড়া দিল কালো বুনো মোষের মতো মেঘ। সূর্য কখন ডুবল সে খবর আর সরেজমিনে জানা গেল না। রাখাল এক মাঠ গোরু গুটিয়ে নিয়ে ঘরমুখো হল। এক ঝাঁক বক কক্ কক্ শব্দ তুলে মেঘের উল্টোপিঠে উড়ে গেল। ঝড় এল কালবৈশাখীর দাপট নিয়ে। বিদ্যুতের দাঁত খিঁচিয়ে হিংস্র শ্বাপদের মতো বাজ লাফিয়ে পড়ল গঙ্গার ধারের নারকোল গাছের মাথায়।
অনেক........অনেকক্ষণ পরে ঝড় থামল। আরো অনেকক্ষণ পরে বৃষ্টি ধরল। দুই ব্রাহ্মণের সন্ধ্যাহ্নিক ইত্যাদি কিছুই হয়নি, সন্ধ্যের ঝড়ে গেরস্থালি হয়েছে তছনছ। অর্ধাশনে গেছে ওদিকে সারাদিন। সায়ংস্নানের জন্য গঙ্গার ঘাটের দিকে পা বাড়ালেন দুজন। এতক্ষণ আকাশের মেঘের কড়কড়ানিতে ঘরনীদের কলহ ছিল স্থগিত। এইবার আকাশ রেহাই দিতেই দুই জায়ের পালা শুরু হল। দুঃখের সংসারে কোথা থেকে দুই অলক্ষ্মী এসে জুটেছে—মনে মনে উভয়ের মুণ্ডপাত করতে করতে দুই ভাই ঘাটে গিয়ে নামলেন। ঘাট নির্জন। চারিদিক শোন্‌শান্। এত রাত্রে কেউ কোথাও নেই। কেমন ছম্‌ছমে অন্ধকার। সবে ডুব দিয়েছেন এমন সময় অন্ধকার চিরে গঙ্গার বুক থেকে গর্জে উঠলো—'কে তোমরা?' এও যেন আর এক বজ্রপাত। ভয়বিহ্বল কণ্ঠে দুজনেই জবাব দিলেন—'আমরা।' আবার মেঘগর্জন হল, 'কে তোমরা? এটা কোন্ গাঁ?' এতক্ষণে ঠাওর করে দুই ব্রাহ্মণ দেখলেন—ঘাট থেকে একটু পাশে নোঙর করা রয়েছে এক বিশাল বজরা এবং যে-সে বজরা নয়। আন্দাজে বোঝা গেল সুসজ্জিত জমকালো বজরা। লাফ দিয়ে বজরা থেকে ঘাটে নামল

দুজন। কাছে এসে ফের জিজ্ঞাসা করল—'এটা কোন্ গ্রাম?' 'জামতলি।' 'আপনারা?' 'ব্রাহ্মণ।' 'দণ্ডবৎ।' অন্ধকারে করজোড়ে দণ্ডবতের ভঙ্গি করলেন তাঁরা। এবারে ব্রাহ্মণেরা জিজ্ঞাসা করলেন—'বজরায় কে?' ওরা দুজন সে কথার কোনো উত্তর দিলেন না। শুধু বললেন আমরা দূর থেকে আসছি, যাব দূরে। ঝড়ের মুখে পড়ে সঙ্গের ছিপ-নৌকা সব দলছাড়া হয়ে পড়েছে। আমরা উঠেছি এখানে। সকলেই খিদে তেষ্টায় ছটফট করছি, কিন্তু রসদের নৌকা হারিয়ে গেছে। আপনাদের নিবাস কতদূর?'

'নিবাস বলে কিছু নেই, আছে শুধু একখানা মাথা গোঁজবার মতো কুঁড়ে। কাছেই বটে, ঘাট থেকে দেখা যায়।'

'শুনুন ঠাকুর, আমাদের বড়ো বিপদ; আজকের রাতের মতো অন্তত আমাদের মনিবকে আপনাদের কুঁড়েয় আশ্রয় দিন। সত্যিই যদি গরিব হন বিনিময়ে প্রচুর পুরস্কার পাবেন।'

'পুরস্কারের কথা থাক। আপনাদের পরিচয় কি?'

'পরিচয় যখন দেবার দেওয়া হবে—আপাতত তাঁর সৎকারের ব্যবস্থা করুন। আর এই আশ্রয়ের কথা যতক্ষণ না আমরা এখান থেকে চলে যাই ততক্ষণ গোপন রাখতে হবে।'

দুই ব্রাহ্মণ নিম্নস্বরে নিজেদের মধ্যে খানিক পরামর্শ করে বললেন—'আমরা প্রস্তুত, আপনাদের মনিবকে আসতে বলুন।'

মশালচী দীর্ঘ এক মশাল জ্বালল। বিরাট বন্দুক নিয়ে এক বরকন্দাজ বজরা থেকে মাটিতে নেমে দাঁড়াল। ধীর মন্থর গতিতে তার পিছু পিছু এক সম্ভ্রান্তকায় রাজপ্রতিম ব্যক্তি তাঁর জমকালো পাগড়ির হীরা মুক্তা মানিক্যের ছটা ঝলসিয়ে মাটিতে নামলেন। অভিভূত ব্রাহ্মণদের একজন ভয়ে উৎকণ্ঠায় রইলেন নীরব। আর একজন অস্ফুটকণ্ঠে শুধু বললেন—'আস্তাজ্ঞা হোক হুজুর, আস্তাজ্ঞা হোক।'

আর ঠিক সেই সময় দুই ব্রাহ্মণের কুঁড়ের সামনের বাবলা গাছে উড়ে এসে বসেছে এক শঙ্খধবল লক্ষ্মী প্যাঁচা। দুই জা হঠাৎ থামিয়ে ফেলেছে তাদের ঝগড়া। চারহাত যুক্ত করে করজোড়ে তাঁকে প্রণাম করল তারা। একজন ছুটে গিয়ে শাঁখ নিয়ে এসে বাজিয়ে দিল। দুই জায়ের চার চোখ দিয়ে চারটে বড়ো বড়ো মুক্তোর ফোঁটার মতো জল পড়ল। তারা বলল—'ঠাকুরানী কৃপা করো, কৃপা করো।'

বজরায় ছিলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়—কৃষ্ণনগরাধিপতি। তিনি যাচ্ছিলেন কলকাতার ইংরেজ কুঠিয়ালদের সঙ্গে সলা করতে। যাচ্ছিলেন পাশা খেলতে নিজের ভাগ্যের সঙ্গে দেশের ভাগ্য নিয়ে, পথিমধ্যে এই বিপত্তি। মহারাজ দেশপ্রাণ না থাকলেও ধর্মপ্রাণ ছিলেন। ব্রাহ্মণদের উপকার তিনি ভোলেননি। সঙ্গের লোকজন, ছিপ-নৌকা যখন তাঁর সন্ধান করতে করতে জামতলির ঘাটে এসে ভিড়ল তখন শেষ রাত। শেষ রাতের বিলম্বিত চাঁদের আলোয় জামতলির ঘাট সেদিন জীবনের মতো সাধ মিটিয়ে সেজে নিল। ঘাট যেন হয়ে উঠল বন্দর। ভোরের আলো তখনও ফোটেনি। মহারাজ এসে উঠলেন নিজের বজরায়। রাজঅতিথির যোগ্য সমাদর কিছুই হয়নি। যে খিচুড়ি ব্রাহ্মণীরা তাঁকে খাইয়েছেন তা আর যাই হোক আইনী-আকবরীর মোগলাই খিচুড়ি নয়। শয্যা বলতে কিছুই জোটেনি। তবু ব্রাহ্মণ পরিবারের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র। অতি প্রত্যুষে জামতলির কাক-চিল কেউ জানার আগেই মহারাজের নৌবহর কলকাতামুখো রওনা হল। মাস খানেক বাদে ঘোড়ায় চড়ে রাজার দূত এসে হাজির। সঙ্গে নিয়ে এসেছে দানপত্র। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র জামতলির এই ব্রাহ্মণ ভ্রাতাদের গঙ্গার ধারের দুশো বিঘে জমি লিখে দিয়েছেন। লা-খিরাজ।

প্রতিষ্ঠাপন্ন বিদ্যাব্যবসায়ী বৈদিক ব্রাহ্মণেরা এই নিরক্ষরদের হঠাৎ ভাগ্যোদয়ে আর একবার নিশ্চিন্ত হলেন যে ঘোরকলি। তাতে কিছু এল গেল না। সেই ছোট্ট গাঁয়ের তখনকার ছোট্ট ইতিহাসে প্রতিষ্ঠা হল বাঁড়ুজ্যে জমিদারেরা। চিরকালের মতো জামতলির ইতিহাসে রাঢ়ী বৈদিকের রেষারেষি স্থায়ী হয়ে রইল। একদল বিদ্যায় আর একদল বিত্তে লক্ষ্মী সরস্বতীর বিবাদ জাঁকিয়ে রেখে দিল এ অঞ্চলে, তবে সে কাহিনী এখন নয়।

কিন্তু এ উপকথা নয়। এ হল উপকথার গোড়ার কথা। উপনগরের জীবন-নাট্যের নান্দীমুখ। সে জীবন-নাট্যের প্রথম দৃশ্যের আয়োজন তখনও বাকি। আয়োজন রচনার তোড়জোড়ের আভাসই তখন বাতাসে ভেসে আসছে—কেউ তখনও জানে না কী দৃশ্যপট পরিকল্পনা করে রেখেছেন কালপুরুষ প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে।

জামতলির উ[illegible]লের বিচিত্র কাহিনীর বীজমাত্র রোপিত হয়েছিল সেদিন। তার পরের কয়েক বছরের মধ্যেই এতদিনের স্থাবর এবং

স্থবির ইতিহাস ঘন ঘন মাথা নাড়া দিতে লাগল। জামতলির পাশেই উত্তর দিকে নবাব সিরাজদ্দৌলা বসালেন নবগঞ্জের বাজার। সৈন্য চলাচলের জন্য রসদের মুখ চেয়ে যাতে বসে থাকতে না হয় তারই দরকার মেটাতে নবগঞ্জের বাজার গড়ে উঠতে লাগল। বাঙালী ব্যবসায়ী শ্রেণী এবং বর্ণের দল বাসা বাঁধলেন বাজারকে কেন্দ্র করে। পাল, সাধুখাঁ প্রভৃতি বণিক বর্ণের বোলবোলা ও প্রতিপত্তি বাড়তে থাকলো। ওপারে ডাচ ডেন—ফরাসীদের সঙ্গে নৌকাযোগে লেনদেন—আর এদিকে নবাবের পৃষ্ঠপোষকতায় ধীরে ধীরে এ অঞ্চলের নামই দাঁড়িয়ে গেল নবগঞ্জ। জামতলি হল তারই একটা অংশ মাত্র। মূল নবগঞ্জে কোনো প্রাচীন মন্দির নেই। চব্বিশ পরগনার নানা গ্রামের বৃক্ষতলশায়ী গ্রামদেবতা পঞ্চাননের পূজাই এখানে প্রচলিত পূজা। জামতলির আকাশে যেমন পঞ্চকলস মন্দির চূড়ার অনায়াস সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নবগঞ্জের আকাশে তা পাওয়া যায় না।

তবু নবগঞ্জ গ্রাস করল জামতলিকে। জামতলির শাস্ত্রচর্চায় তখন পূর্ণ জোয়ার। কিন্তু শাস্ত্রের কালাধিপত্য শেষ হয়ে গেছে। সিরাজদ্দৌলা থেকে মিরকাশিম পর্যন্ত, পলাশি থেকে উদয়নালার ক্ষণস্থায়ী শস্ত্রের কালও মিলিয়ে গেছে ছুটো একটা চমক দিয়েই। ইংরাজের পদতলে চব্বিশ পরগনার মাটি প্রথম উপঢৌকন হিসাবে তখন ইংরাজ শক্তির পদক্ষেপকে বুকে এঁকে নিয়েছে। এ যুগে আর শাস্ত্রও নেই, শস্ত্রও নেই। আছে বেনেতি বুদ্ধির কৌটিল্য, ফড়েটি-দালালি আর ঝোপ বুঝে কোপ মারার শৃগাল-বুদ্ধির প্যাঁচ। নবগঞ্জের বাজারের পসারীরা তাই বেসাতির বাইরে আর কোথাও যেতে পারলেন না। চাতুর্যের সঙ্গে ব্রাহ্মণ-কায়স্থের বুদ্ধির মিলন এখানে হল না।

সে কৌশলের দায় ব্রাহ্মণ-কায়স্থের হাতেও সেদিন ছিল না—ছিল গঙ্গার পশ্চিমকূলে সাত সমুদ্র তের নদীর ওপার থেকে যারা এসেছিল তাদের হাতে। এক একটা বিদেশীদের কুঠি দোর্দণ্ড প্রতাপে নিজের নিজের এলাকা শাসন করতে লাগল। কতবার যে ডাচ এলাকার হাত বদল হল ইংরেজদের সঙ্গে—কতবার যে প্রতিযোগিতার আগুন মানদণ্ড ছেড়ে পতাকাদণ্ডে গিয়ে লাগল তার ইয়ত্তা নেই। নবগঞ্জের বাজারে তার পরোক্ষ প্রভাব মাঝে মাঝে এল গেল—জামতলি রইল শুধু নীরব সাক্ষী হয়ে। 'নবগঞ্জের সবটা জুড়ে সাধুখাঁ এবং পালদের মসলাপাতি, সাজিয়ে, তেজপাতা, লঙ্কা, ধান, চাল, পাট, গুড়ের

আড়ত মাথা চাড়া দিল। কামার কুমোরেরা পাড়া সাজিয়ে বসল। নেহাইয়ের ঠকঠক বাজতে থাকল এবং কুমোরের পোণের আগুন জ্বলতে থাকল দিবারাত্র—স্যাকরা এবং মণিকার সমাজ এল পরে—যখন পাল সাধুখাঁদের বিত্তের চূড়া বেশ সুঁচলো হতে আরম্ভ করেছে, যখন তাদের উপচিত অর্থের অকেজো স্রোতকে সোনার বাঁধ দিয়ে বেঁধে ফেলা দরকার তখন।

শুধু নবগঞ্জের ভূগোলে বামুনপাড়া বলে কিছু নেই। বামুন ডাকতে হলে নবগঞ্জের মানুষকে যেতে হয় জামতলি। এ কথা সেদিনও যেমন সত্যি —আজও তেমন সত্যি। এই নিয়েই জামতলির গর্ব। আর এই নিয়েই নবগঞ্জের উপহাস। নবগঞ্জ আর জামতলি যদি যমজ ভাই হত কিংবা হত অখণ্ড একটা শরীর তাহলে চতুর্বর্ণ সমাজের সেই উপহাস-গর্বের দ্বন্দ্ব থাকত না। এ নবগঞ্জ জামতলির সঙ্গে ইতিহাসের নিজের হাতে জুড়ে দেওয়া ক্রোড়পত্র। সেই জোড়ের দাগ এর সর্বাঙ্গে।

তাই জীবনের ছোট বড়ো ব্যাপার থেকে বৃহৎ ব্যাপার পর্যন্ত সর্বত্রই এক ব্যবধানের অস্তিত্ব। সন্ধ্যে হয়ে গেলেও নবগঞ্জের বাজারে সন্ধ্যে হতে দেরি হত—জামতলির সন্ধ্যে সন্ধ্যের সঙ্গে সঙ্গে ঘনিয়ে আসত। নবগঞ্জের হাট বাজারে জাঁকিয়ে তখন শুরু হত সারাদিনের কেনা-বেচার গল্প। সারা দিনের ধুলোওড়ানো বাতাসে গুড় তামাক মেশানো গন্ধ তখন স্তিমিত হত। রেড়ির তেলের প্রদীপ আর শেজবাতি জ্বালিয়ে কোনোদিন শুরু হত কবিগান কখনও কথকতা। কোনোদিন বা নিজেদের প্রিয় ধনপতি সাধুর কাহিনী বা চন্দ্রধর সাধুর গল্প।

এইভাবেই নবগঞ্জের সামাজিক জীবন জেঁকে উঠতে লাগল। মহাপ্রভুর নামগানের ধুয়ো বাজতে লাগল সময়ে অসময়ে। স্মৃতি আর ন্যায়ের নৌকায় জামতলির প্রবীণদিগের পাড়ি চলতে লাগল যেমন তেমন—রইল টোল, অধ্যাপনা, যজন-যাজন। এখন যেখানে চটকলের জেটি, স্টিমার আর গাধাবোট ভিড় করে থাকে, সিটি বাজায়, পাটের গাঁট ক্রেনে ওঠানামা করে তখন সেখানে ছিল খেলারাম সার্বভৌমের চতুষ্পাঠী। জ্যোতিষ, কাব্য, ন্যায় আর স্মৃতির চতুরঙ্গ সেই পুণ্য জাহ্নবীতীরের বিদ্যাপীঠের অঙ্গনে খেলা করে বেড়াত। এদের চিনত না নবগঞ্জের হরিভক্তি বিলাসীর দল। লাভের কড়িতে এপারের ব্যবস্থা আর নামের কড়িতে ভবপারের পুণ্যের বাজারেও

হেটো বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে নবগঞ্জের পথে তখন নিত্য ধুলট, হরিবোল আর অষ্টম প্রহর। বেদ উপনিষদ ন্যায় স্মৃতি রঘুবংশ তোলা রইল জামতলির জন্য—ওতে অধিকার ছিল না কোনোদিন নবগঞ্জের—এবার আর লোভও রইল না।

ওপার থেকে ...র দাঁড়ি আট দাঁড়ি নৌকা এসে ভিড়ত। ইংরেজ নয় ডাচ কিংবা ফরাসী বেনের দল পাইকারদের সঙ্গে নিয়ে বাজারে কিনতেন বেচতেন। পাগড়ি মাথায় বেনিয়ান পরা সিড়িঙ্গে চেহারার দালালেরা ঘুরে ঘুরে প্রভুদের সাহায্য করত। কিন্তু এ আর সে মঙ্গলকাব্যের পুরনো দিনের লবঙ্গের বদলে মাতঙ্গ মুনাফা নয়। দাঁড়ি পাল্লা সঙ্গে নিয়ে আসতেন প্রভুরা। এক কাঁচ্চা এদিক ওদিক হলেই রসাতলে যাবে ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি, সুতরাং হুঁশিয়ার। চুঁচড়োর তোলা ফটকের কাছে তোলা না দিয়েই বেরিয়ে যাবে এমন দুঃস্বপ্ন কার ?

শুধু মাঝে মাঝে গভীর রাত্রে ঘুমিয়ে পড়লে নবগঞ্জ আর জামতলির সমস্ত বঞ্চনা এবং সমস্ত অহমিকা, মশাল জ্বালিয়ে কোশা বোঝাই ডাচ ফরাসী পর্তুগীজ নাবিকের দল নবগঞ্জের কূলে ভিড়ত। বন্দুকের সঙ্গীন উঁচিয়ে সশব্দ পায়ে সদর্প ভঙ্গিতে তারা জমত গিয়ে নবগঞ্জের গঙ্গার ধারের নিষিদ্ধ পাড়ায়। হার্মাদদের হাতে বন্দিনী অথবা কোনো কারণে কুলছাড়া তরুণীদের নিয়ে তখন এই নিষিদ্ধ পল্লী গঞ্জের আসর জমাতে শুরু করেছে। রাত্রে রাত্রে রচিত হয়েছে অনেক অকথ্য কাহিনী। উৎকট লাম্পট্যের সমুচ্চ হাসির সঙ্গে অসহায় আর্তনাদের মিশ্রণে সে কাহিনী পঙ্কিল হয়ে বেঁচে আছে এই পল্লীর পাঁজরে পাঁজরে।

কোনোও কোনোও দিন প্রমত্ত নাবিকেরা কামনার উত্তাপে কখনো হয়তো গৃহস্থ বাড়ির দরজায় হানা দিয়েছে—রাত্রি শেষের জান্তব আতঙ্কের মতো। তারই একটি ছিল হয়তো অধ্যয়নরত চন্দ্রশেখরের গৃহে লরেন্স ফস্টারের সবুট পদাঘাত।

ঐ বাঁড়ুজ্যে জমিদারেরাই নব অধ্যায় রচনা করলেন শেষটা নিজেদের অজান্তে। কিংবদন্তির মতো সে কাহিনী মুখে মুখে চালু আছে নবগঞ্জ-জামতলিতে। ছোট কলকাঠি কেমন করে ইতিহাসের চাকা ঘোরায় এ গল্প তারি গল্প।

বাঁড়ুজ্যেরা ছিলেন বংশজ। বংশজের প্রতি কুলীনের অবজ্ঞার খোঁচা চিরদিনই অসহ্য না হলেও দুর্বিষহ। কৌলীন্যের ছিল সাতখুন মাপ। শুধু ঐ এক চাপরাশেই পেরিয়ে যাওয়া যেত রাজার দেউড়ি, ডিঙিয়ে যাওয়া যেত সকল

বেড়া। কৌলীন্যের মণি যার মাথায় আছে সে সাপ হলেও বরণীয় এমনই ছিল এ চাপরাশের মহিমা।

এই চাপরাশ থেকেই বাঁড়ুজ্যেরা ছিলেন বঞ্চিত। রাজদাক্ষিণ্যের জলে জল বাধিয়ে এক পুরুষের মধ্যেই বাঁড়ুজ্যেরা ফিরিয়ে ফেললেন হালচাল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের হাতে যে দিনের শুরু নানা কৌশলে বাঁড়ুজ্যেরা তাকে জলুসদীপ্ত করতে লাগলেন। বিরাট অট্টালিকা, গাড়ি ঘোড়া, দোল দুর্গোৎসব—বিত্ত তাদের সব দিয়েছিল কেবল ঐ মহিমাটুকু ছাড়া।

দু-পুরুষ বাদে বাঁড়ুজ্যেরা তৎপর হলেন—প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাৎউদ্বাহুরিব বামন। স্বভাবতই এ ধরনের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতির প্রচলন ছিল বাঁড়ুজ্যেদের তৎকালীন বড়ো কর্তা শ্রীধর বাঁড়ুজ্যে বংশমর্যাদার বৃদ্ধির জন্য সেই পদ্ধতির প্রয়োগ করতে চাইলেন। তিনি সন্ধান করতে লাগলেন কুলীন পাত্রের তাঁর কন্যা মাধবীর জন্য। বহু পণের বিনিময়ে সেকালে কুলীন এভাবে স্বকৃতভঙ্গ হতেন —পাণিগ্রহণ করতেন বংশজের ঘরে। এ নিয়ে ঠাট্টা-পরিহাসও নানা রকমের প্রচলিত ছিল। বংশজের ঘরে জল গ্রহণে অনিচ্ছুক কোনো কুলীনকে বিদ্রূপ করেছিলেন কেউ—পণের বিনিময়ে এখানে পাণিগ্রহণে আপত্তি নেই আপনাদের; আপত্তি শুধু পানি-পানে! যাই হোক শ্রীধর বাঁড়ুজ্যে প্রাণে বড়ো ব্যথা পেতেন যখন পাশের গাঁয়ের কুলীন বংশের কৌলীন্যের খ্যাতি প্রায়ই তাঁদের সাত দেউড়ি অতিক্রম করে মর্মমূলে এসে বিঁধত।

ঘটকেরা খুঁজে খুঁজে এক পাত্র এনে হাজির করলেন। নবধা কুললক্ষণমের নটা লক্ষণ না হোক গোটাকতক তাঁর আছে। সত্যিই ভালো পাত্র। অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রী, গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায় যুবক। বহু সমারোহে বিবাহ নিষ্পন্ন হল। বিঘে পঞ্চাশ জমি দিয়ে, ঘর বসত নিজ ব্যয়ে গড়ে দিয়ে স্বীয় জামাতাকে স্বগ্রামে প্রতিষ্ঠিত করলেন শ্রীধর বাঁড়ুজ্যে। ঘর আলো করা দৌহিত্রের মুখ দেখলেন বাঁড়ুজ্যে মশাই কয়েক বছরের মধ্যেই। জামাইয়ের আর সবই ভালো কেবল অত্যন্ত আত্মাভিমানী। ফলে শ্বশুর জামাইয়ে সম্মানের সংঘাত লেগেই থাকত। জামাই ভবশঙ্কর ভুলতে চাইতেন না তিনি কুলীন, শ্বশুর শ্রীধর বাঁড়ুজ্যে সদাই মনে করে রাখতেন তিনি একধাপ ওপরে উঠেছেন—সেই ধাপটা হল ভবশঙ্কর। তাঁর নানা সম্পত্তির মধ্যে ভবশঙ্করও একটা।

একদিন—বছর সাত-আট বাদের কথা, শ্রীধর বাঁড়ুজ্যের বাড়িতে কি এক ক্রিয়া

উপলক্ষে ব্রাহ্মণ অধ্যাপক অভ্যাগতের ভিড়। অনেকেই নিমন্ত্রিত হয়েছেন। পাশের গ্রামের সেই কুলীন কুলপতিদেরও কেউ কেউ আছেন। প্রশস্ত সামিয়ানার নিচেয় অভ্যাগতদের নিয়ে মজলিস জমিয়ে বসেছেন শ্রীধর বাঁড়ুজ্যে। স্মিত অনাবিল হাসি তামাশা ব্যঙ্গ সবই চলছে। এমন সময় সদ্য আগত কে একজন বায়না তুললেন তিনি এখানে অন্ন গ্রহণ করবেন না, ফল মিষ্টান্নাদি গ্রহণ করবেন। কেন? না, তিনি দু পুরুষে ভঙ্গ—বংশজের ঘরে অন্ন স্পর্শ করে মান খোয়াবেন কী করে? বলে রাখা দরকার এ সমস্তই হাসি ঠাট্টার মোড়কে মুড়ে চলছে। বন্ধু বান্ধবদের আপসে ধুলো ছোঁড়ার ব্যাপার, কেউই বিষয়টাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। কিন্তু হাসতে হাসতে কপাল ব্যথা—শ্রীধর বাঁড়ুজ্যে হঠাৎ ভেতরে ভেতরে উষ্ণ হয়ে বলে উঠলেন—তোমরা দু-পুরুষে ভঙ্গ, কিন্তু তোমার ভায়া বিষদাঁত এখনও ভাঙেনি দেখছি। বলেই দৌহিত্র লোচনকে ডেকে পাঠালেন। জামাতাও মজলিসে বসেছিলেন। উপভোগ করছিলেন বয়ঃজ্যেষ্ঠদের কৃত্রিম দ্বন্দ্ব। লোচনকে ডাকা হতে তিনি একটু সচেতন হলেন। লোচন আসতেই শ্রীধর তাকে বললেন—দাদু, ইনি অভ্যাগত ব্রাহ্মণ, গাড়ু নিয়ে এসো, জল নিয়ে এঁর পাদ প্রক্ষালন করিয়ে দাও। লোচন বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে গাড়ু আনতে গেল। শ্রীধর উষ্ণতা আর কিছুমাত্র গোপন না করেই বললেন—এ সাক্ষাৎ কুলীন সন্তান কিন্তু আমার নির্দেশে এ আপনার পাদ প্রক্ষালন করিয়ে দেবে—এর কৌলীন্য আপনার থেকে বড়ো। এখন আশা করি অন্ন গ্রহণে আপনার আর বাধা নেই। ইতিমধ্যে লোচন গাড়ু গামছা নিয়ে হাজির। সকলেই এক অস্বস্তিকর নীরবতার মধ্যে চুপ করে রইলেন। লোচন ঐ ব্রাহ্মণের পাদপ্রক্ষালন করতে এগুল। সকলেই নীরব।

এবং সে নীরবতা ভেঙে প্রথম কথা বললেন তীক্ষ্নস্বরে শ্রীধর বাঁড়ুজ্যের জামাই ভবশঙ্কর। তিনি লোচনের হাত থেকে গাড়ু গামছা কেড়ে নিয়ে সামিয়ানার বাইরে টেনে ফেলে দিলেন। তারপর সেই দীপশিখার মতো শীর্ণ কিন্তু উজ্জ্বল ব্রাহ্মণ শ্বশুরের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন—আপনি গুরুজন। আপনার প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ করা শোভন নয়। কিন্তু আপনি আপনার দম্ভের গলায় জয়মাল্য পরানোর জন্য আমার কৌলমর্যাদাকে ধুলোয় লুটিয়ে দিতে চাইছেন। লোচন, আমার সঙ্গে চলে এসো। এই বলে বিহ্বল বালকের হাত ধরে জামাই সভাস্থল পরিহার করলেন।

শুধু সভাস্থল নয় কয়েক দিনের মধ্যে তিনি জামতলির সঙ্গে সকল সম্পর্ক

ত্যাগ করে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে চলে গেলেন কোথায় যেন। শ্বশুর জামাইয়ে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গেল।
কিন্তু তাঁর ক্রোধের প্রকাশ মাত্র এইটুকু নয়। এক বছর বাদে জামাতা বাবাজীবন জামতলিতে প্রত্যাবর্তন করলেন। সঙ্গে কয়েকজন লালমুখো আকাঁড়া সায়েব। শ্রীধর বাঁড়ুজ্যের বিরাট অট্টালিকার পরেই শুরু হয়েছে জামাইয়ের বাড়ি। তারপরেই প্রশস্ত আম কাঁঠালের বাগান—শিবমন্দির, পুকুর। এই বাগান, পুকুর, জমি—জামাই যৌতুক পেয়েছিলেন। মন্দির আর মন্দিরের লাগোয়া জমি দেবত্র—সেবাইত ছিলেন ভবশঙ্কর। জামতলির অধিকাংশ বড়ো বাড়ির মতো এই অংশেরও নিচে বয়ে চলেছে গঙ্গা। এই শিবমন্দির, পুকুরের পরেই জামতলির সীমানা শেষ। তারপরেই কিছুটা পতিত জমি, ঝোপ ঝাড় জঙ্গল। দু-এক ঘর দুলে বাগ্‌দীর বাস।
বিস্মিত জামতলির বাসিন্দাদের সামনে সায়েবরা ভবশঙ্করকে নিয়ে এদিক ওদিক ঘুরলেন। শিবমন্দিরের সামনে একবার পায়চারি করলেন। গঙ্গার ধারে গিয়ে কলকাতামুখো দাঁড়িয়ে দুরবীন কষলেন চোখে। তারপর ভবশঙ্করকে জিজ্ঞাসা করলেন—বাট হোয়াট অ্যাবাউট দি টেম্পল, পণ্ডিত ?—ও দেবোত্তর ওতে হাত দেওয়ার অধিকার আমার নেই সায়েব। ভিজে কাপড়ে দুলে মেয়েরা পুকুর থেকে জল নিয়ে ফিরছিল। তাদের দেখতে দেখতে সায়েবরা জবাব দিলেন, অল্ রাইট !
এঁরা বুথ অ্যাণ্ড হেণ্ডারসনের প্রতিনিধি। রিষড়ের পর সমস্ত সওদাগরী বুদ্ধির টনক নড়েছিল—চোখ পড়েছিল এই দিকেই। গঙ্গার দুই ধারের জমির দিকে তখন তাদের ঝোঁক পড়েছে। সমস্ত বেনিয়া কল্পনার সামনে তখন চটকলের কালো চিমনির চূড়া। ভবশঙ্কর এঁদের কাছেই তাঁর সম্পত্তি বেচতে চান। এই হল তাঁর শ্বশুরকে সাজা। এই হল তাঁর নিজের নাক কেটে জামতলির যাত্রাভঙ্গের উদ্যোগ।
সভা ডাকলেন জামতলির ব্রাহ্মণেরা। বিশেষ বাঁড়ুজ্যেদের প্রতিদ্বন্দ্বী বৈদিকেরা এতদিনে রাঢ়ী অহমিকার কেল্লা ধূলিসাৎ করার একটা সূত্র পেয়েছেন। বৈদিকেরা সকলেই কৈফিয়ত চাইলেন শ্রীধরের কাছে গ্রামে এই ম্লেচ্ছ অনুপ্রবেশের জন্য। জামাতার এতাদৃশ আচরণ যদি তিনি রোধ করতে না পারেন সমস্ত সামাজিক সম্পর্ক থেকে তাঁদের বিচ্যুত করা হবে। মনে মনে আশঙ্কিত হলেও কাছারিতে বসে মুখে জবাব দিলেন শ্রীধর—ওদের বোলো

আমি বৃত্তিভোগী ব্রাহ্মণ নই, কীর্তিভোগী ব্রাহ্মণ। ওসব জুজুর ভয়ে আমি মায়ের আঁচল খুঁজব না। উভয় পক্ষের বিতণ্ডায় জামতলির আকাশ হু-হু করে গরম হয়ে উঠল।

দেবোত্তরের ব্যাপারটা শ্রীধর নিজেই একবার সায়েবদের সঙ্গে দেখা করে বুঝিয়ে বললেন। বললেন—সায়েব এখানে তোমাদের কারখানার কাজ হবে না।......

সায়েব বললেন, ড্যাম ইয়োর দেবোত্তর।

ভবশঙ্কর দেবোত্তর ছাড়াই গঙ্গার ধারের সুদীর্ঘ ভূমিখণ্ড সায়েবদের বেচে দিয়ে দেশান্তরী হলেন। শ্রীধর একবারও জামাইকে ডেকে কোনো অনুরোধ করলেন না। শুধু সেবাইতের অধিকারটা কেড়ে নিলেন।

কেটে গেল কয়েক মাস। সময়ের চাকা ঘুরতে লাগল দ্রুত। নৌকো বোঝাই করে ইঁট আসতে লাগল। এল চুন সুরকি। কলকাতা থেকে এল লোহার রেলিং ফটক। এল গোল গোল চিমনির টুকরো। মাটি কেটে ইঁট পুড়িয়ে নেবার পাঁজা বসলো। হাতুড়ির দুমদাম, করাতের দাঁতালো হিস্‌হিস্‌, কামারের হাপরের ফোঁসানি—ঢালাই চেরাই পেটাই। লোকজন মিস্ত্রী ছুতোর মুটে মজুর—এক নতুন জীবনের গোড়াপত্তন শুরু হল। নবগঞ্জে একটা নতুন বাড়ি উঠেছিল ছিরু মোদকের, সেটা আপাতত বন্ধ হয়ে গেল—বড়ো দর চড়েছে রাজের, বড়ো দর উঠেছে চুন সুরকি ইঁটের।

অঞ্চলের সমস্ত মিস্ত্রী ভিড়ে পড়ল এখানে। ঘরামিরা লেগে পড়ল অন্য কাজে। নবগঞ্জের ফাঁকা জায়গায় গোলপাতার ছাউনি দেওয়া নতুন চালাবাড়ি তুলতে গেল তারা। ভিন্‌দেশী অনেক লোক শহরে আসছে, বাসিন্দাদের কেউ কেউ সুবিধাটা নিলে। বাসাবাড়ি তৈরি করে ভাড়া দেওয়া শুরু হল। উড়িষ্যা অঞ্চলের সস্তা মজুরেরা হল তাদের প্রথম ভাড়াটে। ঠিকাদারেরা এলেন। নবগঞ্জের মাঝখানে জঙ্গল কেটে নতুন বসতি বসল। নাম হল নতুন পাড়া। আজও সে পাড়া নতুন পাড়াই।

সায়েবদের পেল্লার পেল্লায় গুদামঘর তৈরি শেষ হল, বিরাট লম্বা দু-মানুষ ভোর পাঁচিলের মাথায় কাঁচের কুচি বসানো শেষ হল। ফটকে দাঁড়াল বন্দুকধারী ভোজপুরী দরোয়ান। চারিদিকে ধুলোর সঙ্গে এইবার ধোঁয়া মিশতে শুরু করবে। ইঁট, কাঠ, লোহা, রুলডাণ্ডা, খেরোখাতা, চুরি, জোচ্চুরি, দালালি এক চৌঘুড়িতে সোয়ারি হয়ে হাঁকিয়ে চলেছে সদর্পে। আর ভয় নেই। কলকাতা থেকে পঞ্চাশ ষাট সত্তর খানা একশমনী নৌকা রোজ আসা-যাওয়া করছে এই

নতুন পত্তনের নিচের গঙ্গার ঘাটে। রানী ভবানীর বাঁধিয়ে দেওয়া ঘাটের পাশেই জামতলির মেয়েদের আব্রুকে ব্যঙ্গ করে এই সায়েব ঘাট গড়ে উঠল—আর ভয় নেই—

এক শুভদিন দেখে সায়েবদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা রুজু্ করলেন শ্রীধর বাঁড়ুজ্যে। একশ বছরের মন্দিরে যাওয়ার পথ মন্দির সমেত পাঁচিল তুলে ঘিরে নিয়েছে সায়েবরা। অন্তঃপুরিকাদের তো কথাই নেই—পুরুষ মানুষদেরও শিবপূজায় যাওয়ার বহু ব্যাঘাত। ফটক পেরিয়ে বেরুবার সময় সায়েবরা অসুবিধা সৃষ্টি করে। মন্দিরের চত্বরে অনাচার হয়। তারা তাদের সময়মতো ফটক খোলে ফটক বন্ধ করে—পূজার সময় পেরিয়ে যায়—তিথি ফসকে যায়—ইয়োর অনার তবে কুইন্স্ প্রোক্লেমেশনের অর্থ কী?

চারিদিকে হৈহৈ রৈরৈ। সরগরম। ভাঁটা পড়ে গেল কারখানার কাজে। বড়ো বড়ো কৌঁসুলীরা উভয়পক্ষে এসে জড়ো হলেন। মোকদ্দমার দিন পড়ে আর দিন ঘোরে। গলে যায় দু-তরফের অনেক দিনের রৌপ্যমদিরার অনেকখানি। কখনো মনে হয় সায়েবদের বুঝি পাতপাড়ি গুটোতে হল—কখনো মনে হয় গেল বুঝি শ্রীধর বাঁড়ুজ্যের দম্ভের বেলুন ফুটো হয়ে। আদালত প্রাঙ্গণেই শ্বশুর জামাইয়ে আর একদিন হয়ে গেল। পৈতা ছিঁড়ে অভিশাপ দিলেন শ্বশুর—কন্যা বিধবা হোক।

দীর্ঘ চার বছর পরে রায় বেরুল—জিত শ্রীধর বাঁড়ুজ্যের। মন্দিরে যাওয়ার জন্যে ফটক সারাদিন খোলা রাখতে হবে। মন্দির-সংলগ্ন ভূমির ওপর কোনো এক্তিয়ার নেই কোম্পানির। প্রথম পাঁচিল ছেড়ে দিয়ে মিল কোম্পানিকে পেছু হটতে হল। সেখানে রইল শুধু গুদামঘর। দু-নম্বর পাঁচিলের পরে বসাতে হল তাঁতঘর। এক নম্বর পাঁচিলের মাঝখানে রইল সেই শিবমন্দির।

আজো রয়েছে সে মন্দির চটকলের অদ্ভুত পরিবেশের মধ্যে ছন্দপতন হয়ে—রয়েছে হংস মধ্যে বকো যথা। আমাদের এই আধা শহুরে আধা গ্রাম্য, এই কিছুটা শিল্পায়িত পুরোটা ঔপনিবেশিক, এই ন যযৌ ন তস্থৌ জীবনের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। শীতকালের সন্ধ্যেয় মিলের ছুটির বাঁশি বাজলে তারই সঙ্গে মন্দিরের কাঁসর ঘণ্টা বাজে। বিদ্যুতালোকিত সন্ধ্যায় মন্দিরের প্রদীপভাতি মৃতের নিষ্প্রাণ চোখে তাকিয়ে থাকে। কোনো ব্যাধিগ্রস্ত মজুরের বধূ যখন মন্দিরের চত্বরে মাথা ঠোকে তখন মিলের ল্যাবরেটারিতে চটের নতুন নতুন রঙ নিয়ে নয়া গবেষণা হয়।

লিভারপুল ম্যাঞ্চেস্টার আমার কাছে দিবাস্বপ্ন—জামশেদপুর কখনও দেখিনি। জন্মাবধি দেখে আসছি শুধু এই নবগঞ্জ-জামতলির পাটনগরীর জটিলতাকে। এই জটপাকানো ধাঁধাকেই আমি চিনি। জানি এর রন্ধ্রে অনুরন্ধ্রে যে জ্বালা গুমরে মরছে তাকে, এর স্টীম টারবাইনের ঘূর্ণিপাককে—এর তাঁতঘরের যন্ত্র গুঞ্জনকে—এরই ময়ালমন্থর শ্রমিক শ্রেণীকে, আর এর বহুভাষী এবং হতবুদ্ধি মধ্যবিত্তকে। নবগঞ্জের স্মৃতিধর মতিচাঁদ গাড়োয়ান তার ভূষণ্ডি দৃষ্টিতে এতক্ষণ যার জন্মবৃত্তান্ত শোনালাম এই নগরেরই ত্রিকালকে ধরে রেখেছিল। —আসুন তারি কিছু নমুনা শোনাই।

মতিচাঁদ ছিল এই শহরের সবচিন্ ঘোড়ার গাড়িওয়ালা। কী করে তার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল আর কী তার বৃত্তান্ত, কী তার ব্যাপার সে কথার প্রয়োজন এখানে নেই। শহরে বাস্, সাইকেল-রিকশা চালু হবার পর থেকেই দিন শেষ হয়ে গিয়েছিল ঘোড়ার গাড়িওয়ালাদের। মতিচাঁদ গত যুগের ঘোড়ার গাড়িওয়ালাদের শেষ প্রতিনিধি। দু-তিন বছরের মধ্যেই তাদের তেজিয়ান ঘোড়াগুলো চিমসে হয়ে গেল শুকিয়ে, কেউ কেউ বেচে দিল তাদের গাড়ি আর ঘোড়া। মতিচাঁদও ছিল এই দলের। মতিচাঁদের তখনকার অবস্থা ছিল এই নবগঞ্জেরই প্রাচীন যুগের মতো—একটি মূর্তিমান ধ্বংসাবশেষ। বাতে হাঁপানিতে তার লম্বা চওড়া শরীরখানা তখন অকালেই শ্রান্ত জীর্ণতায় ভরপুর। কলেজ ছাড়ার পর আমার বেকার যৌবনে একদিন কী করে যেন তার সঙ্গে আলাপ হয়ে গিয়েছিল। সে-ই ছিল আমার বড়ো বয়সের উপকথার ভাঁড়ারী, অবকাশের সঙ্গী।

যে-কোনো শহরের ঘোড়ার গাড়িওয়ালারা সেই শহরের ত্রিকাল-দ্রষ্টা। কোচ-বাক্সের নাতিউচ্চ আসন থেকে নিরাসক্তের দৃষ্টি নিয়ে মতিচাঁদেরা অনেক দিন ধরে শহরের ছুঁচোর কেত্তন, সঙের নেত্য দেখে আসছে। দেখে আসছে নগর জীবনের বহু ঘটনাকে, চিনে রেখেছে বহু মানুষকে। এরা একটা টাইপ। মতিচাঁদ বলত—বাবু, দেখা ছাড়া তো আমার কিছু করার নেই, যখন এই আজব শহরের কোনো তাজ্জব কারখানা দেখে মনে ফুর্তি হয়েছে—তখনো ঘোড়ার পিঠে চাবুক হাঁকড়িয়েছি, গাড়ি ছুটিয়েছি জোরে, আবার যখন দাগা পেয়েছি ভদ্দরলোকদের ছোটলোকপনা দেখে কিংবা ছোটলোকদের বেইমানি দেখে তখনও মনের রাগটা ঘোড়ার পিঠেই কষিয়ে দিয়েছি—আমার তো আর কিছু করার ছিল না।

এই মতিচাঁদই আমাকে বলেছিল নবগঞ্জের গল্প। বলেছিল বকুলবালার গল্প, দুলালচাঁদের কাহিনী, শ্যামধারীর ইতিকথা, অ্যাসটন সাহেবের কেচ্ছা। বলেছিল লালমোহন-বিনি সংবাদ, সিঁটে গুণ্ডার বিবরণ, কাটিকেষ্ট মিত্তিরের কেরামতি, ব্রজেশ্বরী দেবীর ইতিবৃত্ত। বলেছিল এ-ও-সে আরো অনেকের কথা। বলেছিল বেপরোয়া জোয়ান ছেলে বুধোর গল্প।

যখন কাহিনীগুলো আমি শুনেছিলাম তখন আমার মনে হয়েছিল যে এক একজনের কাহিনী বুঝি একজনেরই কাহিনী। মনে হয়েছিল এ কাহিনীর সঙ্গে ও কাহিনীর কোনো মিল নেই। কিন্তু সব গল্প শেষ করে মতিচাঁদ যেদিন বলেছিল, আমার দিনের কেচ্ছা সব শুনিয়ে দিলাম বাবু এবার ঝুলি ঝেড়ে সরে পড়ার পালা—তখন আমার মনে হয়েছিল সব কাহিনী কেচ্ছা যেখানে শেষ হল সেখানে আসলে একটা কাহিনীই গড়ে উঠল তা হল নবগঞ্জ-জামতলির কাহিনী —যে কোনো চটকল শহরের গল্প। যে কোনো চটকল শহরেই মিলবে বুধোর সাক্ষাৎ, অ্যাসটনের দেখা।

হয়তো অনেক শহরেই এ ধরনের গালগল্প কেচ্ছাকাহিনী কিংবদন্তির ছদ্মবেশে ছড়িয়ে থাকে। অনেকেই হয়তো এ ধরনের গল্প জানে। চায়ের দোকানে, গঙ্গার ঘাটে, পুকুর পাড়ে, দুপুরে মাদুর বিছিয়ে অথবা বিকেলে চেয়ার পেতে— আমাদের পরচর্চাপ্রিয় মন লোলুপ হয়ে ওঠে এই গল্পগুলোর জন্য। নবগঞ্জের ক্রনিক্‌লার মতিচাঁদ সেগুলো একসঙ্গে ঝুলিতে ভরে রেখেছিল। সেই ঝুলিটাই আপনাদের এনে দিলাম।

সে কিছুদিন আগের কথা। কী যেন একটা সভা হচ্ছিল। মূল সভাপতি চলে যাবেন। শেষ ট্রেন চলে যাবে বলে। বসিয়ে যাবেন তাঁর আসনে— জামতলির এক পরিচিত পণ্ডিতকে। তিনি স্বভাবসঙ্গত রসিকতা মাখিয়ে বললেন—পতি বিগত হলে দ্বিতীয়বার পতি পরিগ্রহ করা এই সভার পক্ষে সমীচীন হবে না। অবশ্য এ উপনগর—এখানে সায়েবরা গঙ্গাতীরে গড়েছেন উপবন, আর ত্রিপাদকলির প্রকোপে উপপত্নীর মেলা এই শহরে, কাজেই সভা হয়তো উপপতি গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু আমি পুরনো কালের, আমাকে এ থেকে রেহাই দিন।

তখন মনে হয়েছিল সত্যিই এ 'উপ' উপসর্গের দেশ—এখানে মতিচাঁদই বা উপকথা ছাড়া কী শোনাতে পারে আমাদের।

ফুল ধুলিমাখা অগ্নি ভৈরবী……

শুক্রবারের সন্ধ্যা চটকল বাজারের দিলদার সন্ধ্যা। এই এক সন্ধ্যার জন্য দুনিয়াকে আর লুটেরা বলে মনে হয় না। মনে হয় না উদাস হয়ে গেছে চোখের জলও, মনে হয় না দেওয়ানা হয়ে বেরিয়ে পড়ি। নবগঞ্জের অভিধানে শুক্রবারের নাম হপ্তাবার। এক সপ্তাহের তলব মেলে এই দিন। শনিবার দিন আগেকার কালে প্রায়ই থাকত ছুটি—বিশেষ মজুরদের। শুক্রবার সন্ধ্যায় চটকল ফটকের সামনে বাজার বসে। মূলো বেগুন আলু মাছের বাজার। দাঁতনকাঠির আর সস্তা সাবুনের। লাড্ডু বেচে দু-পয়সা কামাতে আসে ভিখু। ফুচকাওয়ালা ত্রিনাথের হাতের কামাই থাকে না। ফিক্ করে হেসে এক ঝলক রঙ ছড়ায় লাল নীল সবজে ছিটওয়ালা হপ্তাবাজার। এক ক্লাস প্রমোশন পায় ওপরের দিকে, হতে চায় ফ্যাশন-দোরস্ত মার্কেটের জ্ঞাতি বা আত্মীয় যখন বাবু বাজারের খারিজ কপি অগত্যা এখানে এসে আসন গ্রহণ করে—যখন আর কোথাও না-পাত্তা-পাওয়া পটোল বিরস গাম্ভীর্যে এক কোণে বসে পড়ে, বলে, কোথায় এলাম। বড়ো বড়ো মরা মাগুরমাছ আর আণ্ডার দোকানের সামনে 'ইয়ে হপ্তাবাজার হ্যায়' বলে পসারী যখন চিৎকার করে আর ছুটি পাওয়ার উল্লাসে সাড়া দেয় মজুরের দল তখন মনে হয় সত্যিই জমে গেছে হপ্তাবাজার।

চটকল ফটকের সামনেই বসে হপ্তাবাজার। ঠিক সময়মতো এসে যায় কেরামত আলি। আসলি নেই মাংতা সুদ নিকালো—হাম আগা সায়েব। বকের মতো নিস্পৃহ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে আফজল মিয়া। মনে হয় না এখানে ওর কোনো কাজ আছে তারপর বকেরই মতো ছোঁ দিয়ে পড়বে—এঃ শালা সাদেক, তুমি হররোজ ভাগতা—রূপেয়া ছোড়ো। আর দাঁড়িয়ে আছে মিলগেটের সামনেই বুধুয়ার বউ মেয়ে। ডাগর মেয়ে। কবে যেন ভুজাওয়ালার গা ঘেঁষে একবার চলে গিয়েছিল। অন্ধকার হলে সেই কথাটাই ভুলতে পারে না ভুজাওয়ালা। বুধুয়ার বউ দাঁড়িয়ে রয়েছে ; গেট থেকে বেরুলেই বুধুয়াকে ধরে নিয়ে যাবে। না নিয়ে গেলে বুধুয়া চলে যাবে দেশী সরাবের দোকানে। হপ্তার তলব দিয়ে আসবে বামুন শুঁড়ীর ক্যাশবাক্সে। চটকল ফটক পেরিয়ে ওরা সব বেরিয়ে এলেই হপ্তাবাজার ঝলসে উঠবে এক ঘণ্টার জন্য। কেনা-বেচা,

চেঁচামেচি, কাঁদা-কাটা, দু-একটা ঘুষি চড়। কম বেসাতি, নামমাত্র মুনাফা আর প্রচুর উত্তেজনা—এই হল চটকল বাজারের চরিত্র। শুধু আজ সন্ধ্যা শেষ হলেই সব ফুরিয়ে যাবে।

অনেক দিন আগে একদিন মতিচাঁদ গাড়োয়ানের মুখোমুখি বসেছিলাম হপ্তাবাজারের এক বিভোর সন্ধ্যায়। গল্পের মদে আমরা দুজনেই ছিলাম নেশাচ্ছন্ন। সেদিন হপ্তাবাজারের ঢেউ লেগেছিল নবগঞ্জের রাস্তায়, অলিতে গলিতে সেদিন নবগঞ্জের সন্ধ্যা ছিল একটু বেশী মুখর, সেজেছিল বেশি প্রগলভ। এসব দিনে তাড়িখানায় দু-একটা মারপিট হয়—ভরে যায় দেশী সরাবের দোকান—আজ মাতাল হয়ে পাতাল পানে ধাওয়া। চটকল ফটক পেরিয়ে হপ্তাবাজারের হাওয়া মিলের কুলি-লাইনকে ছুঁয়ে যায়, সন্ধ্যে অনেকটা গড়িয়ে গেলে সেই হাওয়া দু-একবার দেশী সরাবের দোকানে মাথা ঠুকে নটা নাগাদ ধাক্কা দিতে আসে বিন্দির গলির মোড়ে। বিন্দির গলি—সেখানে টাকার হাটে যৌবন দেউলে হয়—অবেলায় বেলা বয়ে যায়।

বিন্দির গলি তখন সেজেগুজে বসেছিল। মাথায় ঘষেছিল লেবু তেল—সস্তা পাউডার মেখেছিল মুখে। ঠোঁটে রঙ, পাতাকাটা চুল বাঁধা, হাতে রুমাল নিয়ে যে যার দরজায় দাঁড়িয়েছিল তারা। এখন এই সন্ধ্যায় তারা সকলেই মূর্তিমান প্রমত্ততা, মুখর প্রগলভতা। কিন্তু কে না জানে এ চটকল বাজারে যে এই প্রগলভ প্রমত্ততার অন্তরালে অপেক্ষা করছে ব্যাধি—বিবরবাসী সাপের মতো নিঃশব্দে। বিন্দির গলির মোড়ে এখন জ্বলে বিদ্যুৎ বাতি, আগে জ্বলত পেট্রোম্যাক্স। গ্যাসবাতির আলোয় বিন্দির গলির ডাকসাইটে মেয়েমানুষ পঞ্চি পানওয়ালীর দোকানে লাল নীল কাটাকাঁচের মালা দুলত আর কাগজের রঙ-বেরঙের ঘুরনচাকি বন বন মাতালের মাথার মতো ঘুরত। সাদা চাঁদের মতো গোল পরোটা আর লাল টকটকে ডিমের ডালনার বাহার খুলত চাটের দোকানে। হাত দিয়ে আছড়ে আছড়ে তৈরি করা পরোটা তাই নাম চাঁটাই পরোটা। সস্তা সেণ্টের গন্ধও মাতাল হয়ে যেত—অশ্লীল খেউড় গান, দমকে দমকে গমক দেওয়া জড়ানো কথা আর জড়িয়ে যাওয়া আর ফোঁপানো ছোট মেয়ের কান্না মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে উঠে বন্ধ হয়ে যাওয়া, দশটার সময় গুলজার হয়ে গেল বিন্দির গলি—আজ হপ্তাবাজার।

শুধু ঐ বুড়ো অশথ গাছটা মাথা নাড়ছিল—না, আমার সায় নেই। সে বলছিল, আমি নবগঞ্জের দেড়শ বছরের সাক্ষী। দেড়শ বছরের সহস্র রজনীর

আরব্যোপন্যাসের খেলা আমি যে দেখেছি। হার্মাদের হাতে বন্দিনী বিক্রমপুরের মেয়ে, এই আমারই পায়ে মাথা ঠুকে সাড়া পায়নি—শেষে আমারই হাতে সঁপে দিল সমস্ত দায়। কত রাত বিরাতে নাবিকের দল ঘা দিয়েছে দরজায় দরজায়। কিনে আনা মেয়ে, লুঠ করা মেয়ে, পালিয়ে আসা মেয়ে—ভুলিয়ে নিয়ে আসা মেয়ে—মেয়ে আর মেয়ে। রাতে রাতে জমে উঠেছে হুল্লোড়ের নরক। সেই অশথতলায় বসে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম সেদিন নবগঞ্জের এই একবর্গ মাইল নারীদেহের উপনিবেশের গল্প শুনে। আদিবাসী থেকে শুরু করে পাঞ্জাবী মাদ্রাজী বাঙালী ওড়িয়ার বিচিত্র সমাবেশ এই বিন্দির গলিতে। শুনেছি তিন কি চার পুরুষ ধরে একই উপজীবিকায় অভ্যস্ত ঘরেরও অভাব নেই এখানে। জন্ম এখানে জটিল পথে। এই একমাত্র জায়গা বাংলা দেশে যেখানে কন্যা জন্মগ্রহণ করলে খুশি হয় মায়েরা। পুত্র তো বয়স বাড়লেই পলাতক। মেয়ে যে কিছুকাল পরেই উপায়ক্ষম হবে। ডাচ্ প্রপিতামহের সাক্ষ্য বহন করে দুই চোখে, দৈর্ঘ্যে নিয়ে পাঞ্জাবী পিতামহের ছায়া আর অঙ্গে নিয়ে বাঙালী পিতার কোমলতা হয়তো একজন বড়ো হচ্ছে কোনো নেপালী যুবকের সন্তানের জননী হবার জন্য। স্বভাবতই মায়ের বিনষ্ট যৌবন ভবিষ্যতের সম্বল এই মেয়ে। অবাক হতে হয় এক একজনকে দেখে—তাদের নীলচে চোখ আর পিঙ্গল চুলের বিদেশিনী মোহে। কল্পনা করতে পারা যায় সেই আদিম জাহাজীদের নৈশবিহার। কিন্তু সে কল্পনা থামিয়ে দিয়েছিল বিন্দির গলির কথক মতিচাঁদ গাড়োয়ান—ওর বাবা প্রথম যুদ্ধের সময় ছিল জাহাজী নাবিকদের একজন সরেস কাপ্তেন। জাহাজ চলে গেছে—উড়ে গেছে কাপ্তেনী ডানা মেলে—রইল শুধু নীল চোখের ব্যর্থতা আর পিঙ্গল চুলের দহন এই মেয়েটির শরীরে। ও তা জানে না। মতিচাঁদ বলেছিল, ওর দর খুব। অনেক রাতে অনেক বাবুকে আমি গাড়ি করে ওর দরজায় পৌঁছে দিয়েছি। ডিক্যাণ্টারে করে ফতুর বাবু শেষটা লুকিয়ে আনিয়ে দেশী মদ খায়—এই মেয়েটির দেহাধারে তেমনি করে পান করে এরা বিদেশিনী আসঙ্গের আসব।

এই অশথতলায় বসেই মতিচাঁদ গাড়োয়ান সেদিন হপ্তাবারের রঙিন সন্ধ্যায় আমাকে শুনিয়েছিল বকুলবালার কথা। বকুলবালার খালি বাড়ির পোড়া দালানের দিকে চেয়ে মতিচাঁদ হাঁপাতে হাঁপাতে যার গল্প বলেছিল তাকে বাদ দিয়ে এই উপনগরের উপকথা জমে না। আমাদের অতি শৈশবে, চেতনার

অতি প্রত্যুষে বকুলবালা নবগঞ্জের লীলাখেলা শেষ করে চলে গেছে ; চলে গেছে বকুলবালার বাবু কচিবাবু। শুধু মতিচাঁদের মতো কেউ কেউ ধরে রেখেছে তার স্মৃতিকে। পাটনগরীর পরতে পরতে যে বিষদহন তার জ্বালায় বকুলবালারাও যেমন পুড়েছে, তেমনি পুড়িয়েছে। যে কাহিনী আগের পরিচ্ছেদে বললাম এর অনেক পরের ইতিহাস বকুলবালার। বকুলবালার নামে একদিন নবগঞ্জের সমস্ত মৌমাছি-মন গুন গুন করে উঠত। বিহ্বল হত বিভ্রান্ত যৌবন। অথচ বকুলবালা নবগঞ্জের কেউ নয়। দেহজীবিনীর সাধারণ ভূমিকা নিয়ে একদিন এই উপনগরের ইতিহাসে সে নায়িকা হয়েছিল। এখনো নবগঞ্জের বুড়োদের মজলিস সে কথা ভোলেনি। এখনো বহু অশীতিপরের যৌবনস্বপ্নে বকুলবালার মুখ ফুলের মতো ফুটে ওঠে—নিশি শেষে ফুলের মতো ঝরে যায়। সে বকুলবালা এখন আর এ শহরে কোথাও নেই। এখন শুধু সত্য বিন্দির গলির দেহের হাটের বীভৎসতা।

বকুলবালার কথা মনে হলেই মতিচাঁদ গাড়োয়ানের পৃথুল দেহখানা আমার মনে না পড়ে যায় না। মতিচাঁদ গাড়োয়ানই বলেছিল আমায় বকুল-বালার বিচিত্র সৌরভের ইতিকথা। বিশাল-কলেবর কিন্তু বাতে পঙ্গু মতিচাঁদ—সে যখন সেই গল্প আমায় বলেছিল সেদিন বলতে বলতে তার যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখের চৌকো বড়ো কাঠামোয় আমি কী দেখেছিলাম তা কথায় বোঝানো যায় না। সে বলেছিল, বাবু দুটো জিনিসের টান মানুষ কাটাতে পারে না। এক হল যমের টান, এক হল মেয়েমানুষের টান। এ কথা শোনা কথাই ছিল বাবু, বকুলবালাকে দেখে আমার দুয়েরই পেত্যয় হয়েছে। কোমর ছাড়িয়ে অনেক নিচেয় পড়ত তার এলো চুল, তেল চকচকে মাজা রঙে মাছি পিছলে যেত, হাতের মুঠোয় ধরা যেত তার কোমর, আর বলব কি তার হাসির কথা—সে হাসি দেখলে কলজে নড়ে যেত নবগঞ্জের ছোকরাদের। সে যখন চান করে গঙ্গা থেকে উঠে যেত গোলমাল করে ফেলত দোকানীরা বেচাকেনায়—কিপটে রাখু বুড়ো পর্যন্ত ফাউ দিয়ে ফেলত সারাদিনের মতো। আমার জোয়ান বয়সে আমি বকুলবালাকে দেখেছিলাম। তিনি ছিলেন কচিবাবুর মেয়েমানুষ। বিন্দির গলিতে কত মেয়েই দেখলাম সারা জীবন—টেঁসো মেয়েগুলোও ইদানীং কলকাতা ছটকানো দু একটা এসে জুটেছে বিন্দির গলিতে কিন্তু সে বলে না কিসে আর কিসে। গঞ্জের চ্যাংড়া বাবুরা একবার সরস্বতী পূজা করেছিল—কুমোরকে বলে দিয়েছিল মুখ করবি

বকুলের মতো। এমন ছিল একদিন তার দাপট। কত বাবুদের. ছেলে, কত বাবুরা নিজেরাই বকুলবালার পায়ে দাসখত লিখে দিতে চেয়েছিল। আর সেইসব দাসখতের উপর বকুলবালা সারা জীবন শুধু নেচেই গেল। কচিবাবু ছাড়া কোনোদিকে ফিরে তাকাল না। কথায় কথায় মতিচাঁদ বলেছিল, আমি তখন কচিবাবুর খাস নফর—বকুল ছিল কচিবাবুর বাঁধা মেয়েমানুষ। নবদ্বীপে বুড়ো মাকে তিথি করাতে গিয়ে বকুলকে নিয়ে এসেছিলেন ঐ বাঁড়ুজ্যেদেরই ছোট ছেলে কচি বাঁড়ুজ্যে। মদ থেকে শুরু করে গোটাকতক নেশায় ষোলো বছর থেকে তিনি পেকে উঠেছিলেন। কচিবাবুর টাকায় এই বিন্দির গলিতে এই অশথতলার সামনে বকুলবালার বাড়ি হল, গাড়ি হল, জমকালো শাড়ি হল, গয়না হল। কী নাচ নাচত বকুল। কচি বাঁড়ুজ্যে বোতলের পর বোতল সাফ করতেন—আর সারারাত ধরে পাঁয়জোর বেজে যেত ঝুমঝুম—পেশোয়াজ আর ওড়না মেঘের মতো ফুলে উঠত, ঘাগরা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘরময় সে দাপাদাপি করে বেড়াত। ঘরের ঝাড়বাতি সারারাত জ্বলত—কচিবাবু সারারাতের নেশায় বিভোর হয়ে শেষরাতে লুটিয়ে পড়তেন—সঙ্গে সঙ্গে বকুলও। এক একদিন কচিবাবুকে গাড়িতে তুলে নেবার জন্যে ঘরের মধ্যে গিয়েই দেখি বকুলবালা পড়ে আছে অসাড়—গায়ের কাপড় গায়ে নেই—আমাদের এমনিই মাথা ঘুরে যেত মদের দরকার আর হত না।

বাঁড়ুজ্যে বাড়িতে তখন তোলপাড়। দেবোত্তরের মোকদ্দমায় জিত হওয়ার পর থেকেই সায়েবদের সঙ্গে বাবুদের পিরিত বেড়ে গেছে—গঙ্গার ধারে আজ এ জমি বেচছেন কাল ও জমি বেচছেন—কচুবাগানে সায়েবরা কুলি-লাইন বসাচ্ছে, বাঁড়ুজ্যেরাই তার ঠিকে নিয়েছেন—কচিবাবুর ভাই ধীরুবাবু হয়েছেন মিলের কুলি যোগানোর ঠিকাদার। তখন সারাদিনে বারকতক খোলা হচ্ছে সিন্দুকের ডালা—টাকা আসছেই আসছেই। কচি বাঁড়ুজ্যের মাইফেলী দেখার মতো নজর তখন আর কারুর নেই। তাঁর মা শুধু বিয়ে দেওয়ার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন, ছেলে বয়ে যাচ্ছে বাঁধা দরকার। ঘটকীরা মেয়ে দেখে দেখে সম্বন্ধ আনতে লাগল। আনলে কী হবে কচিবাবুর কাউকে মনে ধরে না, কাউকে পছন্দ হয় না। বকুলবালার কাছে কেউ লাগে না।

কচিবাবু মাথায় করে রেখেছিলেন বকুলবালাকে। তার দৌলতেই আমরা নবগঞ্জে সাহেব ডাক্তার দেখেছিলাম—বাবু আনিয়েছিলেন ওর অসুখ করেছিল

বলে। মাথা ধরলে মাথায় বরফ দিত বকুল তাই চটকলের সাহেবদের সঙ্গে ব্যবস্থা করে রোজ বরফ আনাতেন কচিবাবু। তানার মা বলতেন মাগী সাক্ষাৎ ডাইনী। ওর সঙ্গে রাত জেগে জেগে বাছা আমার আধখানা হয়ে গেল কিন্তু মাগীর জুলুম এক তিলও কমেনি। বাড়ির ঝিয়েরা বলত, ও নিশ্চয় গুণ করেছে বাবুকে। শুধু কিছু বলতেন না ওনার দাদা ধীরুবাবু। কচিবাবুরা দুই ভাই—ধীরুবাবু আর কচিবাবু। ধীরুবাবুর বেথা হয়েছিল—ছেলেপুলেও ছিল। লোকে বলত, ধীরুবাবুই নাকি সমস্ত সম্পত্তি হাতাবার মতলবে কচিবাবুকে বকুলবালার খপ্পরে ফেলেছিলেন। লোকে আরো বলত, বকুলের আঁচলের তলায় কচিবাবু যত হারিয়ে যাচ্ছেন ধীরুবাবুর নাকি তত পোয়াবারো। কচিবাবুর তো বিয়েথাও হল না কাজেই সম্পত্তির আর ওয়ারিশানও রইল না। নেশায় মেয়েমানুষে ঝাঁঝরা হয়ে উনি শিঙে ফুঁকলে ধীরুবাবুর ছেলেরাই সব পাবে। তবে সে কথা শোনা কথা, বাবু। কিন্তু কচিবাবু সে বকুলবালার অথৈ জলে ডুব দিয়েছিলেন এতে কোনো ভুল নেই। তাঁর আর উঠবার ক্ষ্যামতাও ছিল না সাধও ছিল না। বাবু বলতেন—ওরে আমার শিরে শিরে বইছে মদ, মাথার চুলে গাঁজার জট আর কলজেটা কেবল বলছে বকুল, বকুল, বকুল।

তিন বছরের মধ্যে বকুলবালার তিন সেট গয়না পাঁচ সেট হল। দুটো সোনার ঘুঙুর গলায় কাবলী বেড়াল—তিনটে রূপার শেকল পরানো হীরামন আর টিয়ে, আর দুয়োরে দরোয়ান নিয়ে বকুলবালা মাত করে দিল নবগঞ্জের আসর। গেরোনে চানের দিন গঙ্গার ধারে চুল এলিয়ে গরদ পরে চাল পয়সা বিলোত ভিখিরিদের—দেখতে দেখতে তার নাম হয়ে গেল বাঈজীরানী। কচিবাবু বাঈজীরানীর নাচ দেখতে লাগলেন আর মদ টানতে লাগলেন। তার নাচের সুখ্যাত করে কচিবাবুরা বলতেন ঘাগরা উঠিয়ে হাঁটু গেড়ে যখন যে পায়ে ঘুঙুর বাঁধত সকলের সামনে সেই তখন থেকেই হাঁ করে দেখতে হবে এমনি ছিল তার শরীরের গড়ন পেটন। এই চলল পাঁচ বছর—পাঁচ বছরে নদীতে অনেকখানি চর পড়ে, গাছ অনেক পাতা ঝরিয়ে দেয়। কিন্তু পাঁচ বছরে কোনো ভাঁটা পড়ল না কচিবাবুর টানে, ভাঁটা পড়ল না বকুলের রূপে। গরমকালে টানা পাখা টানতাম বারান্দায় বসে বসে। দড়ি টানতে টানতে শুনতাম কচিবাবু বলতেন—বকুল, এখনো তোমার মুখের দিকে তাকালে আমার বুক ধড়াস করে ওঠে। বকুল শুধু বলত 'ইস্' আর বলে

একবার হাসত কচিবাবুর চোখের তারার সঙ্গে নিজের চোখের তারা মিলিয়ে, আর হাত কেঁপে কচিবাবুর গেলাস থেকে অনেকখানি মদ মাটিতে পড়ে যেত বকুলবালার পায়ের কাছে। আমারও হাতের দড়ির টান থেমে যেত পলকের জন্য।

সে বছর নবগঞ্জে দুটো ব্যাপার হল। ঐ যে সব্‌জির বাজার নবগঞ্জের—এ বাজার বাঁড়ুজ্যেদেরই বাজার—বকুলবালার ঐ যে পোড়া দালান তার সদর দরজার মুখ বড়ো রাস্তার দিকে, কিন্তু বাড়ির খিড়কি নেই, বাড়ির পেছনের দেয়াল থেকে শুরু হয়েছে বাজারের পেছন দিক। বাজারে খড়ের চাল আর বকুলবালার পাকা বাড়ির গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে। বোশেখ মাসের প্রথমেই কচিবাবু নবগঞ্জের বাজারের মালিকানা লেখাপড়া করে দিলেন বকুলবালাকে। বললেন—বকুল, কবে আছি কবে নেই, চির জীবন তোমার নাচ দেখে প্যালা দোব এ সুযোগ নাও হতে পারে—রইল তোমার ব্যবস্থা। ইদানীং খানিকক্ষণ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতেন না কচিবাবু, হাত কাঁপত ঠক ঠক করে—প্রায়ই ঘুরে বসে পড়তেন। বছরের শেষে চত্তির মাসের মাঝামাঝি এক সন্ধ্যেবেলায় বকুলবালার সঙ্গে বসেছিলেন বারান্দায়—বেলফুলের মালা ছিল পিরিচের ওপর, ওর সঙ্গে হাসি মস্করা করছিলেন বাবু। মদের গেলাস হাতে করে কি একটা কথায় কেয়াবাৎ বলে জোরে হেসে উঠতে গিয়ে মাথার শির ছিঁড়ে ফট করে মরে গেলেন কচিবাবু। একটা ইন্দ্রপাত হয়ে গেল।

হপ্তাবারের রাতও তখন অনেক। দু-একটা মাতালের বেলেল্লা হাসির শব্দ মদের গেলাস ভাঙার মতো মাঝে মাঝে ভেসে আসছে। দরজার সামনে একা একা দাঁড়িয়ে থেকে আধবুড়ো পদ্মরানীর কাজল কুটিল চোখের তারা ঘুমে ছোট হয়ে বুজে আসতে চাইছে—নিভু নিভু হয়ে এসেছে তার লণ্ঠন—লণ্ঠনটাও অনেক পুরনো—পদ্মরানী লণ্ঠনটা ঝাঁকি দিয়ে নিভিয়ে ফেলল। বুড়ো অশথ গাছটা মাথা দুলিয়ে উঠল আর একবার—না, সায় নেই। আমার চোখে তখন ভাসছে বকুলবালার উদ্দাম নৃত্যের লাস্য আর পটভূমিতে আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে কচিবাবুর বিবর্ণ মুখ।

তারপর বড়ো কেলেংকারি হয়ে গেল। কেলেংকারিটা হল ঐ বাজার নিয়ে। কচিবাবুর দাদা ধীরুবাবু বড়ো সুবিধের লোক ছিল না। কচিবাবুর ছেরাদ্দশান্তি মিটতে না মিটতেই বাজার নিয়ে বকুলবালার সঙ্গে বেধে গেল তুলকালাম। বকুলবালার লোকেরাই বাজারের তোলা আদায় করত, করত পাওনা থোওনার বিলি ব্যবস্থা। কিন্তু পেছনে লাগলেন ধীরুবাবু। তিনি কি এক আইনের ফ্যাঁকড়া বার করলেন—বাজারের একটি আধলাতে হক্ নেই বকুলবালার। বকুলবালার লোকেরা যখন রোজমাফিক বাজারে গেছে তোলা আদায় করতে তখন ধীরুবাবুর দরোয়ানেরা তাদের কান ধরে বাজার থেকে বার করে দিল। খবর শুনে গুম হয়ে খানিকক্ষণ বসে রইল বকুলবালা, তারপর ডাকল—হরিপদ, গাড়ি বার করো।

নবগঞ্জের সব থেকে বড়ো উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করল সে। কাঁচা টাকা হাতে বেশি ছিল না। একসেট গয়না বাঁধা দিল নীলু স্যাকরার কাছে। বাজারের ফড়েদের সাক্ষী মানল। মহকুমার কাছারিতে মোকদ্দমা শুরু হল—বাদী বকুলবালা আর ধীরু বাঁড়ুজ্যে প্রতিবাদী।

নবগঞ্জের মানুষের অনেক মোকদ্দমার কথা শোনা আছে, কিন্তু এই মোকদ্দমার মতন কোনোটাই নবগঞ্জের মানুষকে নাড়া দিতে পারেনি। সাধুচরণ খাঁয়ের পিসি খুনের মামলা কিংবা নিকিরিপাড়ার দেওর ভাজের মামলাতে লোকের মনে সাড়া পড়েছিল বটে কিন্তু এর সঙ্গে তার তুলনাই হয় না। এখন যেমন ফুটবল খেলা নিয়ে চায়ের দোকানে দুটো পার্টি হয়ে যায়—হাতাহাতি হয় দু-তরফে, কাপডিশ ভাঙাভাঙি শুরু হয়ে যায়, নবগঞ্জেও তেমনি ব্যাপার দাঁড়াল বকুলবালা আর ধীরু বাঁড়ুজ্যেকে নিয়ে। যারা ভাবল বকুলবালা আমাদের হবে তারা হল বকুলবালার দিকে—আর যত রাজ্যের ফোঁটা-কাটা ঝুনো ত্যাঁদোড়—বকুলবালার বাঁ পায়ের ধুলো গায়ে মেখে যারা ফিরে গেল, গিয়ে রাতের ঘুম নষ্ট করল তারা হল ধীরু বাঁড়ুজ্যের দিকে।

ফড়েরা সাক্ষী দিল—হ্যাঁ, বকুলবালাকেই তারা বাজারের খাজনা দিয়েছেন এক বছর ধরে—কচিবাবুর হুকুম ছিল তাই। উকিলেরা বললেন, এজমালি সম্পত্তি এ ভাবে লিখে দেওয়ার ক্ষমতা কচিবাবুর কস্মিনকালেও নেই। মস্করা করে উকিল বকুলবালাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—আপনার পেশা কী? রেগে সিঁদুর হয়ে জবাব দিয়েছিল বুকুলবালা—আপনারই মতন, ছাঁদন

দড়ি তুমি কার, যখন যার হাতে থাকি তার। ছাঁদন দড়ির পেশা আমার।

ধীরুবাবু যোগাড় করলেন দুজন ডাক্তার। কসম খেয়ে হলপ করে তারা বলে এল কোর্টে যে শেষ দিকে কচিবাবুর মাথার ঠিক ছিল না। পাগলের উইল টেঁকে কী করে, জিজ্ঞাসা করলেন উকিলেরা। বকুলবালার উকিল দেখালেন—উইল করা হয়েছে এক বছর। এক বছর ধরে বকুলবালা স্বত্বভোগ করেছেন বাজারের, কোথায় ছিলেন ধীরুবাবু?

বিন্দির গলির বিমলির মা সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ডাহা বলে দিল—মানুষ বশ করার শেকড় চেয়েছিল তার কাছে বকুলবালা।

তুমি দিয়েছিলে?

না।

কেন?

ধম্মে বেধেছিল।

মিথ্যে সাক্ষী দিতে ধম্মে বাধল না?

জজ সায়েব থামিয়ে দিলেন উকিলকে। নামিয়ে দিলেন সাক্ষীকে সোয়ামীর নাম জিগ্যেস করার পর।

দিনের পর দিন গালের টোল, বুকের ডৌল সব হারাতে লাগল বকুলবালা। নবগঞ্জের যত বাউণ্ডুলে নিকম্মা মহকুমার কাছারি বাড়ির উঠোনে, কাছারি ঘরে ভিড় জমাত রোজ। যে বকুলবালাকে কচিবাবু পাখার আড়াল করে আগলে আগলে বেড়াতেন, গঙ্গাচানেও যদি পাঠাতেন সঙ্গে দিতেন দরোয়ান, সেই বকুলবালা কোর্ট ঘরে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ফিসফাস হুসহাসের ঝড় বয়ে যেত। জজ সায়েব ধমকাতেন, একটু ঠাণ্ডা হত, আবার যেই বকুলবালা মুখের বাক্য খসাত অমনি সব চন্‌মন্‌ করে উঠত—ভ্যানভ্যানে মাছির মতন।

সকালে বিকালে নবগঞ্জের রাস্তায় চটকলের বাবুদের পথ চলার একটা যেন খোরাক হয়ে গেল ব্যাপারটা। শুধু এক একদিন দেখা যেত মোকদ্দমার দিন সকালবেলা গঙ্গার চান সেরে অশথতলার পাথর শিবের সামনে মাথা ঠুকছে বকুলবালা—জল ঢালছে অশথতলায়। সেই সকাল বেলার ঝিকিমিকি রোদে তসর পরা বকুলবালার রূপের দিকে তাকিয়ে চটকলমুখো বাবুর দল চুপ মেরে যেত খানিকক্ষণের জন্য। বকুলবালা কারুর দিকে

ফিরেও তাকাত না। কেবল অশথতলার সামনে গঙ্গার ঘাটের পুরে
মন্দিরে ধীরুবাবুর বাড়ির মেয়েরা যেদিন যেদিন মোকদ্দমা জিতের মান
জানিয়ে সকাল বেলায় পেন্নাম করে ফিরতেন তাদের দিকে তাকি
ভুরু কুঁচকে থাকত সে—তারপর নিজের মনে মাথা উঁচু করে চ
যেত। যেদিন মোকদ্দমার দিন, বাড়ি থেকে যেত পদা স্যাকরা
বাড়ি—সেখান থেকে উকিল বাড়ি। মানত করেছিল—ঠাকুর, মোকদ্দমার
দিন, সেদিন সারাদিন উপোস করব। সারাদিন উপোস করে মামলা
সেরে সন্ধ্যের পর শুকিয়ে আমসি হয়ে বাড়ি ফিরত—না, আর আশা
নেই।

নবগঞ্জের এক একদল লোক মোকদ্দমাটাকে এক একচোখে দেখেছিল। ফড়েরা
ভাবত ঠিক আছে, চলুক মোকদ্দমা যতদিন পারে, কোনো ব্যাটাবেটিকেই
তোলা দেব না, খাজনা দেব না এখন। মোকদ্দমা চললে আমাদেরই
সুবিধে। জামতলির ভদ্দরলোকেরা ভাবত—ধীরুবাবুরই জয় হোক, বেবুশ্যের
বাজার থেকে সওদা করে খেতে হবে—থুঃ। কেউ ভাবত মাগীর বড়ো
আস্পদ্দা, বড়ো বাড়, এইবার মজাটা বুঝবেন মানিক। ভটচাজ্যিরা ভাবত
—যায় যদি নষ্ট মেয়েমানুষটার হাতে বাঁড়ুজ্যের দর্পটা ধূলো হয়ে……হে ভগবান
এ যে ঘোর কলি তা কি হবে?

চটকলের বড়ো সায়েব অ্যাস্টন ভাবত ফাঁকতাল্লায় যায় যদি বাজারটা উঠে
তো বড়ো সুবিধে হয়। বাজারটা উঠে গেলেই মিল গেটের সামনের বাজারটা
জাঁকিয়ে উঠবে। তাহলে আর বাজার করার নাম করে বাবুরা সকালের
দিকে সটকাতে পারবে না। ধীরুবাবুর সঙ্গে সায়েবের খাতির অবশ্যই ছিল—
কেননা তিনি ছিলেন মিলের কুলিদের ঠিকাদার। কাজেই সায়েব সামনাসামনি
ধীরুবাবুর কোলেই ঝোল টানতেন।

কিন্তু মোকদ্দমার চেয়েও ব্যাপারটা জমে উঠল সেদিন যেদিন বিন্দির গলির
ছড়াদার লালমোহনেরা চড়কের দিন বকুলবালা আর ধীরুবাবুকে নিয়ে সঙ বার
করল। মুখে মুখে ছড়িয়ে গেল, এ পাড়া থেকে ও পাড়ায়, নবগঞ্জ-জামতলির
সব জায়গায় কাঁচা খেউড়ের মজাদার গান—'বিয়ে না হয় নাই হয়েছে ভাদ্দর বউ
তো বটে।' যে বাজার নিয়ে এত গোলমাল, হাঙ্গামা, ফইজৎ সেই বাজারে
ঢোকাই দায় হয়ে উঠল ধীরু বাঁড়ুজ্যের। আলু, পটোল, বেগুন বেচতে
বেচতে টাটে বসে থাকা ফড়ের দল দাঁড়িপাল্লা নামিয়ে তাঁকে যখন নমস্কার

ঠুকছে—পিছনে তখন যত ফক্কড়, বকাটে ছেলেরা বিড়ির দোকান থেকে খেমটা ধরনে গেয়ে উঠছে ঐ গান। আর সে কী সুর! শুনলেই কোমর দুলে ওঠে এমন তার ঢঙ। 'কে বিদেশী বাজায় বাঁশি' গানখানার হাওয়া উঠেছিল যখন তখনও এমন সাড়া জাগেনি নবগঞ্জে। মাতালে মদের ঝোঁকে এই গান গাইত, নবগঞ্জের গাড়োয়ান গাড়ি চালাতে চালাতে ঐ গান ধরত। এখানকার বাজারের ফাঁকা আটচালায় রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভিখিরিরা ঐ গান গুন গুন করত—'বিয়ে না হয় নাই হয়েছে ভাদ্দর বউ তো বটে।'
ধীরুবাবু কিন্তু ছেড়ে কথা কইলেন না। তিনি ভাবলেন এটাও বুঝি বকুলবালার আর এক চাল! ভাবলেন তাঁর ইজ্জতের মাথায় ঝাঁটা মারার জন্যই বকুলবালা যড় করেছে এইসব রামফক্কড়দের নিয়ে। ধীরু-বাবুর টাকার জোরের সঙ্গে এবার লড়াই বাধল বকুলবালার জেদের। মোকদ্দমা যা হচ্ছে হোক—বকুলবালার শহরে বাস করাই দুর্ঘট করে তুলবো এই হল ধীরুবাবুর পণ। সন্ধ্যে থেকে রাত দুপুর পর্যন্ত যত মাতাল গুণ্ডা ঘা দিতে লাগল বকুলবালার দরজায়। কচিবাবু মারা যাওয়ার পর থেকেই দরোয়ান রাখার সামর্থ্য তার আর ছিল না। বিন্দির গলির মোড়ের মাথায় জমায়েত লোচ্চার দল এতদিন বকুলবালার মুখের দিকে তাকাতে সাহস পায়নি—কথাই ছিল, ও দেবভোগ্য জিনিস, হাত দিতে যাসনি, ঠুঁটো করে ছেড়ে দেবে কচি বাঁড়ুজ্যে। এখন আর কচি বাঁড়ুজ্যে নেই। উস্‌কিয়ে দিলেন ধীরুবাবু; টাকা দিয়ে মদ খাওয়াতে লাগলেন তাদের। মোড়ের গুল্‌তানি ছেড়ে সাহস পেয়ে এগিয়ে এল তারা। বকুলবালার বন্ধ দরজার সামনে খিস্তি আর খেউড়ের ঝড় বয়ে যেতে লাগল—মাতালদের লোভাত্তি ডাক আর লাথি দুয়োরে পড়তে লাগল যখন তখন। গঙ্গা কি বাজার কি উকিল বাড়ি যাওয়ার পথে শিস দিয়ে আর তালি বাজিয়ে, পোড়া বিড়ির টুকরো ছুঁড়ে দিয়ে ওরা বকুলবালার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলল। বিন্দির গলির মরখুটে মেয়েগুলো পর্যন্ত বকুলবালাকে দেখলে হেসে রসে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ত—মিশি কালো দাঁত ছরকুটে জিব ভেংচে চেঁচাত—মরা গোরু আর ঘাস খাবে না। আবার কেউ বলত—ওলো আয়। লণ্ঠন নিয়ে বসে পড়। কিন্তু বকুলবালার কিছুতে কিছু যায় আসে না। তখন আর সারা নবগঞ্জে তার কোনো বন্ধু ছিল না। যারা বন্ধু সেজে আসতো তাদের ছিল বকুলবালার সঙ্গে রাত কাটাবার লোভ—বকুলবালা বলতো তা কেমন করে হবে? এই

বাড়িতে কতদিন তার নিশ্বাস পড়েছে, কত রাত একসঙ্গে কাটালাম দুজনে, কি করে তার নেমকহারামী আমি করি, অধম্ম হবে না? বকুলবালার হাতে ধরে খোসামোদ করেছিলেন মোটা গজেনবাবু—ধানচালের কারবার ছিল যাঁর, বুড়ো সিধু মিত্তির যিনি পেনসন পেয়ে বসেছিলেন—বকুল, তোমার আবার ধম্ম অধম্ম কী! বকুল কঠিন হয়ে বসে থাকতো—হাঁ না কিছুই বলত না। যারা হালে পানি পেত না তারাই ঠোকা খেয়ে ফিরে গিয়ে বকুলবালার নামে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠত—মাগীর সবটাই বজ্জাতি।

এদিকে মামলার খরচ পোষাতে গিয়ে এক এক করে গায়ের গয়না গা থেকে খসে যাচ্ছে বকুলবালার। কলকাতার ব্যারিস্টারের হাতি পোষা খরচ নইলে সামলাবে কী করে। মাথার হীরে বসানো টায়রা—যেটা সে বছর দোলের দিন পরিয়ে দিয়েছিলেন কচি বাঁড়ুজ্যে সেটা গেল। হাতের বাজুবন্ধ—একদিন নাচছিল বকুলবালা, নাচ থামিয়ে তার হাতে ধরে পরিয়ে দিয়েছিলেন বাবু। গেল নীলু স্যাকরার পেটে। তার চেহারা হয়ে গেল দড়ির মতো, মুখের জেল্লা মরে গেল, গায়ের রঙ জ্বলে গেল। মাঝে মাঝে লোকের উপদ্রব যখন আর সহ্য হত না তখন জানলার গরাদে মাথা রেখে দু-এক ঢোঁক মদ খেয়ে চুপ করে পড়ে থাকত। কিন্তু আশ্চর্য তার চোখে এক ফোঁটা জল কোনোদিন কেউ দেখেনি।

মামলার অবস্থা দেখে আশা করার কিছু ছিল না। নাচের প্যাঁচ বকুলবালার মাথায় যতই থাক মামলার প্যাঁচ সে কিছু জানত না। মহকুমা কোর্ট থেকে জেলা কোর্ট সেখান থেকে কলকাতা শুধু ঘুরে ঘুরেই সারা হল, উকিল ব্যারিস্টার সাক্ষী সাবুদেরা যে যেমন পারল তাকে চুষেই নিল শুধু—আর রোগী মরবে জেনেও যেমন ডাক্তারেরা ভরসা দেয় তেমনি করে উকিলেরা তাকে ভরসা দিতেন—এই সামনের দিন দেখো না চাকা ঘুরবে। মুখ্যু মেয়েমানুষ সে, মামলার দিন এলেই ভাবত এইবার, এইবার সত্যিই বুঝি চাকা ঘুরবে। দিন চলে গেলে মুখখানা আঁধার করে আঁধার ঘরে ফিরে আসত। টিয়া আর কাকাতুয়া বিলিয়ে দিয়েছিল সে। ছিল কেবল সেই কাবলী বেড়াল দুটো, গলায় সোনার ঘুঙুর তাদের আর তখন ছিল না, ছিল না সেই পুরনো দিনের জলুস। তবু তারাই ছিল বকুলবালার সঙ্গী, পায়ে পায়ে ঘুরত, গা ঘষত গায়ে, কোলের কাছে এসে চুপ করে শুয়ে থাকতো। আর যে চোখের সঙ্গে চোখ মিলিয়ে কচিবাবুর মাথা ঘুরে যেত সেই চোখ তখন ঘোলাটে, তাতে কোনো চন্‌মনানি তখন ছিল না।

কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে অন্ধকার সন্ধ্যেবেলা ভূতের মতো কাটিয়ে দিত বকুলবালা।

শেষ শোধ নিলেন ধীরুবাবু সেবার ভাদ্দর মাসে যেদিন কলকাতা থেকে খবর এল যে জজ সায়েব বাজারে বকুলবালার স্বত্ব মানেননি। ধীরুবাবুর কর্মচারীর দল মোসায়েব আর খয়ের খাঁদের নিয়ে লোকজন জুটিয়ে ঢাকঢোল বাজিয়ে, ক্যানেস্তারা পিটিয়ে ভেঁপু ফুঁকে বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত বকুলবালার বাড়ির সামনে হুল্লোড়ের নদী নালা বইয়ে দিলেন। তাদের নেত্য দেখে খিস্তি শুনে সেদিন শহরের পাঁড় মাতালেরাও ভেবেছিল আজ আমাদের নেশা হয়নি। একজন আবার একটা কোদাল নিয়ে বকুলবালার দোরের সামনের মাটি কোপাতে শুরু করল। বললে—বাবুদের বাড়ির দুর্গাপূজার জন্যে এ বাড়ির দোরের মাটি লাগবে যে।

একবারও জানলা খুলল না বকুলবালা। বাড়ি ছিল কি ছিল না বোঝা গেল না। সমস্ত ভূতের নেত্য বোবা বাড়িটার সামনে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত হৈ হৈ করে নিজে নিজেই জুড়িয়ে গেল।

কিন্তু ভালো করে জুড়িয়ে যেতে না যেতেই শেষরাত্রে নবগঞ্জ-জামতলির লোক এক দারুণ সোরগোল শুনে যে যার ঘুম ছেড়ে উঠে পড়ল। বকুলবালার বাড়িতে আগুন লেগেছে। আর সেই হু-হু দাউ দাউ আগুন গিয়ে পড়েছে বাজারের খড়ের চালায়। চারদিক থেকে লোকজন ছুটে এল। বিন্দির গলির গোলপাতার চালের বাসিন্দারা তোরঙ্গ বাক্স বিছানা বেড়াল নিয়ে ঘরের বাইরে এসে কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়াল। ফড়েরা যারা শহরেই থাকে কেউ থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, কেউ বুক চাপড়াতে লাগল। বকুলবালাকে কেউ বলল, খুন করো—কেউ অভিসম্পাত দিল প্রাণপণে। খড়ের চালের আগুন এক চাল থেকে লাফিয়ে ধরল গিয়ে অন্য চালে, এদিকে বকুলবালার বাড়ি সমানে জ্বলতে লাগল দারুণ আক্রোশে। আগুন ছিটোতে লাগল এদিকে ওদিকে। ভয়ে পাঙাশ হয়ে বিন্দির গলির মেয়েগুলো যে যার মালপত্র মাথায় করে পাশের সেনপাড়ার দিকে চলল আশ্রয়ের খোঁজে। সেনপাড়ার মাতব্বরেরা পাড়ার মোড়ে দাঁড়িয়ে আগুনের আতসবাজি দেখছিলেন, দূর দূর করে কুকুর খেদানো করে তাড়িয়ে দিলেন জঞ্জালগুলোকে। ভয়ে মুখে যা আসে তাই বলে চেঁচাতে লাগল মেয়েগুলো। চেঁচাতে চেঁচাতে ঘুরে এসে মেথরপাড়ায় ঢুকল। ওপাড়ার জোয়ান ছোঁড়াগুলো আশ্রয় দিল যে যাকে পারলো রাতের মতো।

দু-ঘণ্টার মধ্যে পুড়ে খাক হয়ে গেল বাজার। মড়াপোড়ানো ডোমের মতো দাঁড়িয়ে রইল বকুলবালার বাড়ির চারটে দেওয়াল—কালো ভূত। কখন মিলের ভোঁ বেজে গেল কেউ খেয়াল করেনি, কখন রোদ উঠেছে কেউ টের পায়নি। অনেক পরে খোঁজ নিয়ে দেখল সবাই—না, ও বাড়িতে বকুলবালার চিহ্ন কোথাও নেই। নবগঞ্জের কেউ বকুলবালাকে আর দেখেনি। কখনও না। কোনো দিন না।

এতক্ষণ বাদে একেবারে ঝিমিয়ে গেছে হপ্তাবারের হুল্লোড়।

শুধু রাস্তার ধারে মিউনিসিপ্যালিটির আলোর তলায় উড়ন্ত পোকার ঝাঁক এখনও প্রমত্ত—কিন্তু ক্লান্ত, যেন বলছে আর কত মাথা ঠুকব, আর কত। মতিচাঁদ আমাকে বলল, চলে চলুন, বাবুজী পুলিসের গাড়ি ঢুকছে পাড়ায় লাইসিন চেক করতে এসেছে বিন্দির গলির মেয়েদের।

কড়া আলোয় রাস্তা ধাঁধিয়ে পুলিসের গাড়ি বিন্দির গলির মোড়ে থামল। অশথগাছ আর একবার দমকা নিশ্বাস ফেলল।

আমি মতিচাঁদের সঙ্গে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলাম বিন্দির গলির বাইরে। গল্পের নেশার ঘোর তখনো রয়েছে মতিচাঁদের চোখে। মতিচাঁদ বলল—কচিবাবু মারা যাওয়ার পর দিনকতক বকুলবালার চাকর হয়েই ছিলাম। বকুলবালার গাড়ি চালাতে চালাতেই ঘোড়ার গাড়ির কাজে রপ্ত হয়েছিলাম। সে চলে যাওয়ার পর আমি আর কোনোদিক তাকালাম না। মাধো সাহুর কাছে টাকা কর্জ করে গাড়ি আর ঘোড়া কিনে ফেললাম। কী আর করি বলুন!

নবগঞ্জে তখন ঘোড়ার গাড়ির কদর খুব। বাবুদের এমন-কি যে সব সাহেবদের মোটর গাড়ি ছিল না সকলেরই তখন দু-পা এগুতেই ঘোড়ার গাড়ি লাগত। দুটো তেজী ঘোড়া, ঝকঝকে তকতকে একখানা বড়ো গাড়ি নিয়ে ইস্টিশনে একদিন সকালে গিয়ে দাঁড়ালাম। গাড়ির আমার খুব নাম ডাক হল। মতিচাঁদ গাড়োয়ানের গাড়ি ভদ্দরলোকের বাড়ির মেয়েরাও দলবেঁধে চলে যেতে পারে পুরুষমানুষ কী হবে, মতিচাঁদ তো বাড়িরই লোক।

বকুলবালার বাড়ি পুড়ে যাওয়ার পর আমার মাথা গোঁজারও একটা জায়গা খুঁজতে লাগলাম। তাও আর বেশি খোঁজার দরকার হল না। বিন্দির গলিরই এক পাশে তখন কায়েম হয়েছে গাড়োয়ান পটি। ঐখানেই একখানা ঘর পেয়ে

গেলাম। আস্তে আস্তে নামও দাঁড়িয়ে গেল সারা নবগঞ্জে মতিচাঁদ গাড়োয়ান। ঐ ঘরের দালান থেকে বকুলবালার পোড়া দালানটা দেখা যায়। মাঝে মধ্যে চোখ পড়লে এখনও একটু থমকে যাই। কচিবাবুর কথা, বকুলবালার কথা সব মনে পড়ে, এখনও মাঝে মাঝে ভাবি বাবু, কোথায় গেল মেয়েলোকটা? ধীরুবাবু বারকতক চেষ্টা করেছিলেন বকুলবালার বাড়িটাও বেচে দেবার জন্য। পোড়া বাড়ি অভিশাপের বাড়ি, কেউ কিনতে চায় না।

তিন

গোত্র তব নাহি জানি, তাত

কিন্তু বিন্দির গলির কাহিনী বলতে গিয়ে শুধু বকুলবালার কাহিনীতেই ইতি করে দিলে চলবে না। বিন্দির গলি নবগঞ্জের অন্তরের ক্ষত—সে ক্ষতচিহ্নের কাছে বকুলবালার রোমান্টিক বেদনা কিছু না। এই এক বর্গমাইল দেহের হাটের প্রতিদিনকার রোজনামচার শত অধ্যায়ে বকুলবালার গল্প একটু বেশি রঙিন এইমাত্র। সেক্ষেত্রে বিন্দির গলির ইতিকথা নবগঞ্জের ইতিকথার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আষ্টেপৃষ্ঠে। কোকেনের লুকোনো ঘাঁটি, চোরা ভাঁটিখানা অথবা তাড়ির আড্ডা, গুলি গাঁজা, কিংবা চরস, গুণ্ডা, বেটো বদমাস, বাড়িউলি বাটপাড় এবং যোগানদার সব মিলিয়ে বিন্দির গলি এক অভিনব তালছুট ঐকতান। মাতালের হাতে তানপুরা তুলে দিলে সে যেমন বহু বিচিত্র শব্দের সমাবেশ ঘটাবে—বিন্দির গলিও তাই। পাটনগরীর জটিলতার আর এক গিঁট—নবগঞ্জের পরিভাষায় ও এক মরা গেরো, শত চেষ্টাতেও তাকে আর নবগঞ্জের থেকে আলাদা করা যাবে না।

পৌর পরিষদের দাক্ষিণ্য এখানে কোনোদিন পড়ে না। ইঁটের দস্তুর রাস্তায় খোঁদলে খোঁদলে কাদা জমে—কাঁচা নর্দমায় যাবতীয় মল ময়লার অনৈসর্গিক পঙ্কপুরীতে শুয়োরের দল গা ডুবিয়ে ঘোঁত ঘোঁত করে। পৌর প্রতিষ্ঠানের লাইটপোস্টগুলো বোকার মতো খাড়া থাকে এক রাশ অন্ধকার ছড়িয়ে—বাল্‌বগুলো ভেঙে দেয় কারা যেন। গোলপাতা অথবা খড়ের যত চালাবাড়ি অতি অশোভন ভাবে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে থাকে। কোনোদিন কখনও দেখিনি পৌরপতিদের কেউ ভুলে একদিনও পদার্পণ করেছেন এ অঞ্চলে। শুধু পাঁচ বছর অন্তর একবার করে নাকে রুমাল দিয়ে কোঁচা গুটিয়ে দিনের বেলায় সঙ্গে লোকজন তথা চরিত্ররক্ষার সাক্ষী-সাবুদ নিয়ে তাঁরা আসতেন এ অঞ্চলে। বাড়িউলিরা ট্যাক্স দেয় সুতরাং ভোটার। পাঁচ বছরের জন্য আর একবার তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিতেন—রাস্তা পাকা হবে, আলো হবে, মেথরের সুবন্দোবস্ত হবে, হেন হবে তেন হবে। ভোটের দিন বারম্বার গাড়ি ঢুকত বিন্দির গলিতে। গাড়ি করে ভদ্রলোক ভলান্টিয়ারদের সঙ্গে

বিন্দির গলির বাসিন্দারা ভোট দিতে যেত। সেদিন তাদের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য ডাব খাওয়ানো হত। ক্ষুধা নিবারণের জন্য খাবার। তারপর ভোট মিটে গেলে সবই মিটে যেত। এর মধ্যে ভালো কথা মাত্র এই যে, বিন্দির গলির মেয়েদেরও এই নিয়ে কোনো ক্ষোভ ছিল না, তারা জানত এই হয়—এই নিয়ম।

কতদিন ছোটবেলায় ইস্কুল থেকে ফেরবার পথে দেখেছি দিন দুপুরে নিঝুম পাড়া পড়ে আছে মায়াপুরীর মতো। সন্ধ্যের হাওয়ার প্রথম ছোঁয়ায় এ আবার জেগে উঠবে। বিন্দির গলি ভরে উঠবে বহু কলরবমুখর গাছের মতো। 'দিবসে ঘুমানো রাতজাগা পাখি সারা রাজ্যের যত' বিন্দির গলিতে ভিড় করেছে। হাওয়া এখানে ভারী—দেশী মদের গন্ধে, মদ না থাকলে মেথিলেটেড স্পিরিটেও এখানে কাজ চলে—রোদ এখানে বিবর্ণ হলুদ—কারণ যে চোখ রোদ দেখবে দিনে সে চোখের ওপর রাতের ক্লান্তির কালো পর্দাখানা অনড় হয়ে পড়ে রয়েছে আর মাটি এখানে নিষ্ঠুর—বিন্দির গলির মাতালেরা তার সাক্ষী—মমতাহীন মাটির দস্তুর পাঁজরে মাথা ঠোকেনি রক্ত দেয়নি এমন মাতালকে বিন্দির গলি পোষে না।

বকুলবালার পোড়া দালান পেরিয়ে হাত তিনেক প্রশস্ত বিন্দির গলিতে ঢোকবার পর বাঁ হাতি পুকুর। পুকুরটা একদিন হয়তো বড়োই ছিল, পুকুর বলতে যা বোঝায় তাই ছিল। বাঁধানো ঘাট ছিল ওদিকটায়; কিন্তু এখন এ পুকুরটা এখানকার মেয়েদের মতোই। তার সব জল, সব শোভা, সব শুশ্রূষা চাপা পড়ে গেছে কচুরিপানায়। পুকুরের নামও বিন্দির পুকুর। নবগঞ্জের পুলিস বিন্দির পুকুরের নাম চিনত এক ডাকে। মাঝে মাঝে খবর পেতেন বড়োবাবু বিন্দির পুকুরে আবার একটা ছেলে ভেসে উঠেছে। দু-দিন কি তিন দিনের সদ্যোজাত শিশু তার বিধি-বিগর্হিত জন্মের জরিমানা দিয়েছে নিজের জীবন দিয়ে এই পুকুরে। মতিচাঁদ আমাকে বলেছিল যে পুলিসের লোকেরা এসে মরা ছেলের লাস তুলে ফেলে প্রায়ই টানা-হেঁচড়া করত এই গলির মেয়েদের। বাচ্চা যদি ব্যাটাছেলে হত তাহলে অবশ্য ওটা এ গলির ব্যাপার কখনো সখনো হলেও হতে পারত—কিন্তু মেয়ে হলে বুঝতেই হবে ও এ গলির ব্যাপার নয়। বুঝতে হবে ওটা ভদ্রলোকের পাড়ার কোনো বেধে যাওয়া ব্যাপার —ফয়সালা করতে না পেরে শেষটা ম্যাও সামলাবার জন্য বিন্দির গলির বাড়িউলির শরণ নিয়েছেন তাঁরা। পুলিস এত বুঝত না, যাকে সামনে পেত

থানায় নিয়ে গিয়ে—'কিধরসে আয়া কিধর গয়া সব কোইকো ফাটকমে দেগা' করে শেষে সবাইকে ছেড়ে দিত। দু-আনা চার আনা পয়সার শুধু হাত ফের হত। তাড়িখানার সামনের জমিতে দিনের বেলায় ভন্‌ভন্‌ করে মাছি, দু-পাশে পচা নর্দমায় পন পন করে মশা, রাত্রে দোরে দোরে গিজগিজ করে লোক, এই এদের কথা শোনবার জন্যই আমি একা গিয়ে জমতাম মতিচাঁদের ঘরে। আমার সদাই মনে হত অস্তিত্বের এই অন্ধকার গহ্বরে—যেখানে জীবনের খর সূর্যালোক কখনো প্রবেশ করে না সেখানকার মানুষের মনেও কি কোনো স্বপ্নের ছায়াপাত ঘটে—যদি ঘটে তবে তা কী? নবগঞ্জের মানুষের কাছে বিন্দির গলি চোখ সওয়া আর মন সওয়া হয়ে গিয়েছিল। তারা জানত চটকল বাজারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এই বিন্দির গলি—কেবল আমারই চোখে ছিল বিন্দির গলি চির-বিস্ময়। নবগঞ্জের সমস্ত প্রতারণার, সমস্ত ভেল্কিবাজীর দিকে অমোঘ অঙ্গুলীসংকেত করে বিন্দির গলি আমাকে চিরদিনই বলতে চেয়েছে তার যা কিছু বিফল স্বপ্নের কথা।

সেদিনও বেকার দুপুর আর কাটে না দেখে চপ্পলটা পায়ে গলিয়ে চলে গেলাম পোস্ট আপিসে। কলেজের পাট চুকিয়ে রোজ রোজ পোস্ট আপিসে যাওয়াই এখন ভরসা। যদি শিকে ছিঁড়ে দরখাস্তের জবাব আসে—মনে এই একান্ত আশা নিয়ে পোস্ট আপিসে যেতাম। রোজ একই জবাব পেতাম —না, ব্যানার্জীবাবু, আপনার কিছু নেই। তারপর হতাশা কাটাবার জন্য গিয়ে জুটতাম মতিচাঁদের হত কুচ্ছিত আস্তানায়। খাটিয়ায় শুয়ে বাতগ্রস্ত মতিচাঁদ হাঁপাত। তার ইয়া লম্বা আর অ্যাই চওড়া শরীরের প্রতি রেখায় তখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ব্যাধি-বিজীর্ণ ক্লান্তিরেখা। কিন্তু আমাকে দেখলেই সে একটু চন্‌মন করে উঠত, হয়ে উঠত একটু উজ্জ্বল।

মতিচাঁদের ঘরে একটা ভাঙা মোড়ায় বসে কপালের ঘামটা মুছে ফেললাম। তার আস্তানার পাশে কোচয়ান পটি—সেখানকার ঘোড়ার আস্তাবল থেকে কদর্য গন্ধ গরমকে করে তুলেছে অশ্লীল। মতিচাঁদ আমার দিকে তাকিয়ে হেসে জিজ্ঞাসা করল—কী বাবু আজও জবাব মিলল না। অপরাধটা যেন আমারই এমন ধারা মন নিয়ে মাথা নাড়লুম—নাঃ। একটুখানি চুপ করে থেকে মতিচাঁদ বলল—যাক মিছে ভাববেন না, হয়ে একটা কিছু যাবেই। একটা কথা গরিবের মনে রাখবেন, জিন্দিগী ভোর কেউ বেকার বসে থাকে না। কিছু একটা হয়ে যাবেই। বাবু, আপনাদের দুখ্-তকলিফের তো একরকম কিনারা

হয়, কিন্তু এমন জট-পাকানো ব্যাপারও আছে সমসারে যার দিকে তাকালেই মাথা ঘুরে যাবে আপনাদের, কিনারা করা তো দূরের কথা।

বুঝলাম মতিচাঁদ একটা গল্পের দিকে যাচ্ছে। হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, একটা গল্প বলবে মনে হচ্ছে। এবার কার গল্প?

একটুও অপ্রতিভ না হয়ে মতিচাঁদ বলল—এবার তারপরের কেচ্ছা শুনুন। এ কেচ্ছা বিন্দির গলির খাস নিজের গল্প। বিন্দির গলির পাশের কচুয়ান পটিতেই তখন আমি থাকি। আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে খাতিরটুকু আমায় সব জায়গায় লোকে করে। আমি বলি মতিচাঁদ, ভগমান তোকে ট্যাকাকড়ি দেয়নি, জমিজিরেত দিয়ে আকাশে তোলেনি, কি চটকলের হাজারে বাবুও করেনি বটে, তবে এইটুকু তোর মুখ রেখেছে যে খাতির কদর লোকে তোকে করে—হ্যাঁ, সেটুকুতে ফাঁকি নেই। বিন্দির গলির সবাই আমাকে বেশ খাতির করতো তখন। কেউ দাদা বলত, কেউ ভাই। ডেকে চা খাওয়াত দোকানে সবাই—পয়সা লাগত না। কাজেই বকুলবালার ব্যাপার চুকে যাওয়ার পর ওখানেই রয়ে গেলাম। সারাদিন গাড়ি নিয়ে ঘুরি, প্যাসেঞ্জার ধরি। রাত এগারোটা-বারোটার সময় ঘরে ফিরি। খাই হোটেলে, কোনোদিন দোস্ত লালমোহনের ওখানে। দিন কেটে যায়। উপায় তখন ভালোই। ঝক্‌ঝক তক্‌তক করছে গাড়ি আমার। টাটকা তেজিয়ান ঘোড়া। পা ঠুকলে চেয়ে দেখতে হবে একবার। বাবুদের নজর এ গাড়ি ছাড়া আর অন্য গাড়ির দিকে পড়েই না। বিয়ে করতে যাবে বর, আনো মতিচাঁদের গাড়ি। জোড়ে ফিরবে বর-কনে, ডাক্‌ মতিচাঁদকে। ভুলুবাবু আসবেন রাতের বেলা বিমলির কাছে বিন্দির গলিতে—মতিচাঁদ ছাড়া বিশ্বাসী লোক নেই। মাতাল সাতুবাবুকে রাত দুপুরে বাড়ি দিয়ে আসতে হবে, কেউ যেন টের না পায়—মতিচাঁদকে বল্‌। সব প্যাসেঞ্জারের কথাই অল্পবেস্তর মনে আছে। ভুলিনি কাউকে। কিন্তু এক আজব প্যাসেঞ্জারের কথা কখনো ভুলিনি—যার কথা বলব মনে করছিলাম—আপনাদের দুলালচাঁদ।

দুলালচাঁদ। নবগঞ্জের বহু গল্পের মধ্যে দুলালচাঁদের গল্পও একটা। কিন্তু এ গল্পের ষোলোআনা উত্তমর্ণ মতিচাঁদ নয়। কথায় কথায় সে একদিন বলেছিল আমায়—দুলালচাঁদের গল্প আমার চেয়ে আপনিই ভালো জানেন। এর হেতু এ নয় যে, দুলালচাঁদকে স্কুলেই আমি চিনতাম। এর হেতু এই যে, দুলালচাঁদের

কথা বলতে গেলে তার মুখের বিশেষণগুলো আরো সবিশেষ হয়ে উঠত। বুদ্ধু তার মধ্যে সব থেকে নরম বিশেষণ। মতিচাঁদ সমালোচনাতত্ত্ব জানত না—কিন্তু তার সহজাত গল্প-বলিয়ের ক্ষমতায় এই কথাটা মানত যাকে গালাগালি দিই তাকে নিয়ে গল্প বলা যায় না।

দুলালচাঁদ যখন ইস্কুলের মগ্‌ডালে—আমরা তখন সবে ইস্কুলবৃক্ষের গুঁড়ির গাঁট পেরিয়ে গিয়েছি। নিচু ক্লাসের ছেলেদের সঙ্গেই তার ভাব ছিল বেশি। এটা প্রথমে ভাবতাম তার মিশুক স্বভাবের চিহ্ন। পরে বুঝেছিলাম এটা শুধু তাই নয়—আরো একটু কিছু। বুঝেছিলাম যে তার নিজের ক্লাসের ছেলেরা তাকে পাত্তা দিত না। আর তাই পাওয়ার জন্য সে এসে মিশত আমাদের সঙ্গে। কিন্তু কেন পাত্তা দিত না সেকথা সেদিন বুঝিনি—বুঝেছিলাম পরে—হঠাৎ একদিন।

চেহারা ছিল দুলালচাঁদের সুন্দর। সুন্দর নাক, সুন্দর চোখ, ফরসা রঙ ছেলে। এক কথায় যাকে বলে সুকুমার বালক। কিন্তু পরে যখন আমার সত্যিকারের চোখ ফুটেছিল তখন বুঝেছিলাম তার চেহারায় একটা কিসের অভাব ছিল যার জন্য তার সুদর্শন আকৃতি ম্লান হয়ে থাকত সর্বদা। এটা কী সেদিন বলতে পারতাম না। কিন্তু আজ পারি। দুলালচাঁদের চেহারায় প্রত্যয়ের অভাব ছিল। আত্মপ্রত্যয়ের।

এখন বুঝতে পারি আত্মপ্রত্যয় দুলালচাঁদ কোথা থেকে পাবে? যে তরুণ বলিষ্ঠতা আমাদের দাদাদের মুখে-চোখে ছিল সহজাত দুলালচাঁদের অনন্যসাধারণ রূপের মধ্যে সেইটারই ছিল ঘাটতি। আমার সহপাঠী মুকুল বলতো—কেমন যেন আলুনি আলুনি দেখতে। তবু হয়তো বরাবর একটু এঁচোড়ে পাকা বলেই দুলালচাঁদ সম্বন্ধে আমার কৌতূহল ছিল অসীম। আমি ভেবে পেতাম না কেন অত বড়ো শরীর নিয়ে ঐ রকম একটা ধেড়ে ছেলে ঐ রকমভাবে সদাই সংকুচিত হয়ে থাকবে। যদিও সে তার থেকে নিচু ক্লাসের ছেলেদের সঙ্গে মিশত তবুও এ অবস্থায় অন্য ছেলেরা যা করে থাকে—ছোট ছেলেদের ওপর মাতব্বরী—সে তা মোটেই করত না—করবার চেষ্টাও করত না। বরং আমরাই তার ওপর সর্দারী করতাম। আমরা ছোটরাও যদি দুলালদা এটা করো, কি ওটা করো বলে ধমক দিতাম দুলালদা সেটা সত্বর করে ফেলত। তখন জানতাম না যে ইংরেজি কথাটা—সেটা এখন বলে রাখি—দুলালদার ছিল ইন্‌ফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স।

মাখন একদিন বলল, তুলালদা, তোমার এ জুতো জোড়া বিচ্ছিরি, ভদ্রলোকে পরে না। তুলালদা ক-দিন খালি পায়ে ইস্কুল এল তবু ও জুতো জোড়া আর পায়ে দিলে না। বারীন যেদিন ফ ব্যাকব্রাশ করে চুল আঁচড়ে ইস্কুল আসতে শুরু করলে, তার পরের দিন থেকেই তার পয়লা নম্বরের শিষ্য হল তুলালচাঁদ। আমরা সবাই লুকিয়ে লুকিয়ে শরৎচন্দ্র পড়া ধরলাম—তুলালচাঁদও। তখন সবে ছ-আনা দামের জাপানী ফাউণ্টেন পেনের চলন হয়েছে। দিদির ঘাড় ভেঙে আমি একটা কিনে নিয়ে গেলাম। তু-দিন যেতে না যেতে অনেকেই কিনল একটা করে—তাদের মধ্যে সবচেয়ে আগে কিনল তুলালচাঁদ। বারীন ছিল বেশ রীতিমতো বড়োলোকের ছেলে, সব কিছুকেই ঠাট্টা করত, বলত তুলালদা সম্বন্ধে—আমরা যদি একটা করে গাধার টুপি মাথায় দিয়ে আসি বোধহয় তুলালদাও তাই আসবে পরের দিন থেকে। কেবল আমরা সকলে যখন যে যার বাড়ির গল্প করতাম মাত্র তখন তার কোনো সাড়াশব্দ পেতাম না। আমি কখনও মনে করতে পারি না যে তুলালদা আমাদের কাছে বসে কোনোদিন তার বাড়ির কথা, তার মায়ের কথা কি দিদি বা বোনের কথা বলেছে। এ ব্যাপারে সে ছিল একেবারে নীরব।

রোজই ইস্কুলের ছুটির পর যে যার বাড়ি থেকে এক চক্কর ঘুরে এসে আমরা আবার জমতাম ইস্কুলের মাঠে। ওদিকে বড়ো ছেলেরা খেলত ফুটবল আর এদিকের ছোট মাঠে আমরা ছোটরা খেলতাম ধাপসা বা কপাটি। বিকেলের আলো মেটে মেটে হয়ে কালো হতে থাকলে—আকাশ জোড়া পাখিরা গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে পরিশেষে ক্লান্ত হয়ে ফিরে যেত বাসায়—আর আমরা মাঠভরা ছেলেরা খেলা সারা করে মাঠের একপাশে জড়ো হয়ে বসতাম। আকাশে একটি তুটি নক্ষত্র ফুটত, নবগঞ্জের রাস্তায় চটকল ফেরত মানুষের হাক্লান্ত ভিড় কিছুক্ষণের জন্য ভাঁটা পড়ত। বেলফুলের মালা কাঠিতে জড়িয়ে বিন্দির গলির মোড়ে ফুলওয়ালা মালা বিক্রি শুরু করত আজব গলায়—বেইল ফুউউল। কুলপী বরফ এবং অবাক জলপান সুর করে ডাকতে আরম্ভ করত—সিদ্ধির বরফ, অবাআআক জলপান। আর আমরা মাঠের মধ্যে বসে গুলজার করতাম কটি কিশোর। গুলতানির মাঝখানে সবাই যখন আত্মহারা তখন হঠাৎ বলে উঠত তুলালচাঁদ, চল সব ফেরা যাক, রাস্তার আলো জ্বলে গেছে। সেই মুহূর্তে আমরা সবাই তুলালদার ওপর রেগে যেতাম—না হয় জ্বলেই গেছে রাস্তার আলো, আর একটু পরে বললে কী হত। আমরা তখন খেলে দৌড়ে বেশ

হাঁপিয়ে পড়েছি—বাড়ি ফেরার কথায় বিরক্ত হতাম। ভাবতাম দুলালদাকে তো আর খেলতে হয় না, বসে বসে মুরুব্বিয়ানা করে, কাজেই বাড়ির জন্য ব্যস্ত।

সেদিন কি যেন একটা কারণে ইস্কুলে হাফছুটি হয়ে গেছে। হাফছুটির পর আমরা আমাদের ক্লাসের ছেলেরা ইস্কুলেই বইখাতা রেখে চিলকো ঢিলো খেলব ঠিক করলাম। এ সেকসন আর বি সেকসনের ছেলেরা দু-ভাগ হয়ে দু-দলে খেলা শুরু হল। এ খেলা ভারী মজার। নবগঞ্জের গলিঘুঁজিবহুল রাস্তায় এ খেলা জমেও ভালো। অর্ধেক শহর এ খেলার ক্ষেত্র, এর সময়কাল আধবেলার কম নয়। একদল ছেলে একজোট বেঁধে গলিঘুঁজির মধ্যে আঁদাড়ে, পাঁচিলে, গোয়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে পালাবে, এবং বাকি দলটা তাদের খুঁজে ফিরবে। মাঝে মাঝে প্রথম দল তাদের অস্তিত্ব ও দিশা জানানোর জন্য একযোগে চেঁচিয়ে উঠবে—চিল্‌কো ঢিলো—যে পক্ষ খুঁজছে সে পক্ষও সাড়া দেবে—চিল্‌কো ঢিলো-ও-ও। কখনো কখনো সারা শহর জুড়ে এই খেলা চলে—সারাদিন ধরে। দূর আকাশের চিলের কম্পমান তীক্ষ্মস্বরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমাদের চিল্‌কো ঢিলোর স্বর নবগঞ্জের আকাশে কেঁপে কেঁপে বেড়াত। যে পক্ষ খোঁজে আর যে পক্ষ পালিয়ে বেড়ায় দু-পক্ষের উত্তেজনায় এ খেলা আমাদের কাছে চিরকালই খুব চিত্তাকর্ষক। পালাতে পালাতে বারীনদের বাড়ির লনে দাঁড়িয়ে কেক আর চা খেয়ে নিয়ে এ ধারের কুলিব্যারাকের মধ্যে দিয়ে জামতলির গিন্নীদের দুপুরের ঘুম চিল্‌কো ঢিলো বলে ভাঙিয়ে দিয়ে আমরা পালিয়ে বেড়াতে লাগলাম আর বি সেকসনের বোকা ছেলেগুলো আমাদের খুঁজে বেড়িয়ে চিল্‌কো ঢিলো বলে গলা চিরে ফেলল। কিন্তু আমাদের খুঁজে পেল না।

লুকিয়ে পালানোর নেশায় কখন যে বাড়ি থেকে শতবার বারণ করে দেওয়া বিন্দির গলির মধ্যে ঢুকে পড়েছি তার আর খেয়াল নেই। বিন্দির গলি তখন থমথমে নিশ্চুপ। দু-একটা মেয়ে রোদে পিঠ দিয়ে বসে চুল শুকোচ্ছিল, কোথাও দু-একটা বিড়াল ছানাকে নিয়ে ঘুর ঘুর করছিল—কুকুরগুলো কাঁকড়ার খোলা ঘাঁটছিল। এ পাড়ায় ঢোকা অন্যায় তা আমরা জানতাম, কিন্তু কেন অন্যায় তা জানতাম না। যাই হোক খেলার সময় সে কথা আর খেয়ালও ছিল না। গুঁড়ি মেরে একটা বেড়ার পাশ দিয়ে আমরা পার হচ্ছি এমন সময় আমাদের মধ্যে সব থেকে লম্বা বারীন বলল—হল্ট! ও আবার পরে পাইলট হবে বলে বরাবর মিলিটারি পরিভাষায় কথা বলত—অবশ্য এখন ও চাকরি করে রেলের ওয়াচ

অ্যাণ্ড ওয়ার্ডে। দাঁড়িয়ে গেলাম সবাই। বারীন বলল—দুলালদা! রুদ্ধশ্বাসে আমরা বললাম—কই। গম্ভীরভাবে বারীন বলল—খারাপ জায়গায়। অধৈর্য হয়ে আমরা বললাম—কই বল্ না। বারীন আঙুল দেখালে বেড়ার ওধারে! পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে আমরা দেখলাম—হ্যাঁ ঠিকই, একটা "খারাপ বাড়ি" আর তার মাঝখানে দুলালদা। ভয়ে, ঘৃণায় আমরা যে যেখানে ছিলাম থ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। এর মধ্যে বারীন ডেকে বসেছে—দুলালদা! বেড়ার ওপাশে যদি বাঘ ডাকত তাহলেও দুলালদা অত চমকাত না। আমার তখন ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। মনে হচ্ছিল দুলালদার মতো ভালো ছেলে খারাপ বাড়িতে আর আমরা দেখে ফেললাম—হা কপাল। বেড়ার পাশে আমাদের কাছ ঘেঁষে এল দুলালদা—তার ফরসা মুখ তখন সাদা হয়ে গেছে। বারীন বলল—তুমি এখানে কেন? দুলালদা একটু দাঁত বার করার চেষ্টা করে জবাব দিল—এটা যে আমার বাড়ি। বাড়ি? বলে কি দুলালচাঁদ। কে থাকে বাড়িতে? দুলালদা বলল—কেন আমার মা, ঐ যে। পেছনে দু-চারজন মেয়ে জটলা করছিল—একজনের দিকে আঙুল দেখিয়ে দিল সে। আমার দু-চোখ ফেটে কান্না আসছিল—হায় ভগবান ঐ দুলালচাঁদের মা। আমার মন তখন অস্ফুটে যে কথা বলতে চাইছিল তাকে ভাষা দিলে এই দাঁড়াত—ও রকম মা কেন? ও তো আমাদের কারুর মায়ের মতোই দেখতে নয়। ও কেমন মা? কখন যে বি সেকসনের ছেলেরা বার কতক চিলকো ঢিলো হেঁকেছে খেয়াল করিনি—গলির মোড়ে চেয়ে দেখি তারা আমাদের ধরে ফেলেছে। বারীন বলল, বোকার মতো ধরা দিলাম রে।

যারা আমাদের ধরে ফেলল তারাও থতিয়ে গেল ব্যাপার দেখে আর তাদের পাওনা পাট ফিরে চাইল না। খেলা ভেঙে গেল। একা একা বিকেলের উদাস রাস্তা ধরে বাড়ি ফিরলাম। আর আজ দুলালচাঁদেয় কথা লিখতে বসে এতদিন বাদে আমার কাছে একটা ঘটনা পরিষ্কার হল। সে এর আগের আরেকদিনের কথা! ইস্কুলের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের আগের ব্যাপার, মাঠে বসে ছুটির পর গল্প করছি সবাই, দুলালচাঁদও আছে। মুকুল প্রাইজের দিন আবৃত্তি করবে রবীন্দ্রনাথের ব্রাহ্মণ। ওর দিদির কাছে ও শিখেছে, আমাদের একদিনও শোনায়নি—প্রাইজের দিন তাক লাগিয়ে দেবে বলে। সবাই মিলে ধরে বসলাম মুকুলকে—শোনাতে হবে। খানিক তানা তানা করে, খানিক সুখ্যাতির লোভে মুকুল শুরু করল আবৃত্তি। মুকুল খুব ভালো আবৃত্তি করত।

(এখন কোথায় জানি না)। আবৃত্তির প্রথম দু-এক লাইনেই এমন এক আবহাওয়া সৃষ্টি করে ফেলল তার কিশোর কণ্ঠ যে আমরা সব নিশ্চল হয়ে বসে শুনতে লাগলাম। অবমানিত সত্যকাম ফিরে এল জননীর কাছে, গোত্র জিজ্ঞাসান্তে সে আবার ফিরে আসবে গুরুগৃহে। কিন্তু বিব্রতা জননীর অভিশপ্ত অতীত সন্তানের গোত্রচিহ্ন তো ধরে রাখেনি—কী উত্তর দেবে জননী? মুকুল পৌঁছে গেল সেই বিখ্যাত অংশে। তার নরম গলায় বিধুর জননীর স্নেহে আকুল এবং শঙ্কায় ত্রস্ত মাতৃত্ব যেন কথা কয়ে উঠল।—

যৌবনে দারিদ্র্যদুখে
বহু পরিচর্যা করি পেয়েছিনু তোরে
জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে—
গোত্র তব নাহি জানি, তাত।

আবৃত্তি শেষ হয়ে গেলে আমরা সকলে উল্লাসে উচ্ছ্বাসে মুকুলকে জড়িয়ে ধরলাম—চমৎকার, এক্সেলেণ্ট, ব্র্যাভো, গ্র্যাণ্ড—যে যে-কটা ইংরেজি জানতাম সবই মুকুলের ওপর ঝেড়ে দিলাম। শুধু নিঃশব্দে বসেছিল দুলালদা। কেমন যেন লাজুক কেমন যেন অপ্রতিভ, কেমন যেন সমস্ত ব্যাপারটার সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়াতে পারলে বাঁচে। সেদিন ভেবেছিলাম দুলালদা বেরসিক। আজ বুঝলাম, ব্যাপারটা কি।

তারপর সবই শুনলাম বড়োদের কাছে। দেখলাম আমরাই জানতাম না। ছোট বলে। বড়োরা সবাই জানত। ওর মা খারাপ। যারা পাতা কেটে চুল বাঁধে আর সন্ধ্যে হলে বিন্দির গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে লোক দেখলে হাসে, বিড়ি খায়, ওর মা সেইখানে থাকে। আরো শুনলাম কেন খারাপ—মধ্য কৈশোরের আলো-আঁধারির মাঝে দুলালচাঁদের নিষিদ্ধ জন্মবৃত্তান্ত আমাদের পেকে ঝুনো দাদাদের কাছ থেকে শুনতে শুনতে আমরা হঠাৎ দেখলাম আমরাও সব জানি। আমরাও বড়ো হয়ে গেছি। এইভাবে দুলালচাঁদ মিশে রইল আমার বয়ঃসন্ধির স্মৃতির সঙ্গে।

আরো বুঝলাম কেন দুলালচাঁদ তার ক্লাসের ছেলেদের সঙ্গে মিশত না। বুঝলাম এক একদল ছেলের সঙ্গে ও ভাব জমায়, পরিচয় গড়ে তোলে আর কোথা থেকে সব জানাজানি হয়ে যায়—সেই দল ছেড়ে ও আবার ভিন্ন দল খোঁজে, দু-দিন পরে ও সেখানেও ধরা পড়ে, আবার হয়ে পড়ে দলছাড়া। মতিচাঁদ সেদিন বলেছিল, গিধধড়টা যদি ওর পাড়ার আর পাঁচটার মতো হত তাহলে মদ খেয়ে লপেটা

মার্কা হয়ে ফেরতা মেরে কাপড় পরে আর সিটি বাজিয়ে মেয়েমানুষ ঘেঁটে দিব্যি চালিয়ে যেতে পারত। কিন্তু মুশ্‌কিল বাধিয়েছিল ওর মা—ওর মা বেটিই ওর মাথায় ঢুকিয়েছিল—তুই ভদ্রলোকের ছেলে, তোর গায়ে ভদ্রলোকের রক্ত আছে, তোকে ভদ্রলোক হতে হবে। বলব কি বাবু সে মাগীও ঐ ছোঁড়াকে জন্ম দেওয়ার পর থেকেই রীত চরিত্তির পাল্টে ফেলল। কে তোকে মা বানিয়ে গেছে—পাড়ার খিস্তিবাজ মাগীগুলো যখন জিজ্ঞাসা করেছিল ওকে, ও বেটি চুপ মেরেছিল যেন কাট বোবা। বাস এপাড়া থেকে ওঠাতে পারলে না, কেননা কেউ ওকে ভিন পাড়ায় বাসা ভাড়া দেবে না, কিন্তু এপাড়ার ব্যবসা ছেড়ে দিল দুলালের মা। লক্ষ্মী ছিল ওর নাম—আস্তে আস্তে সে কথা সবাই ভুলে গেল—ওর নাম দাঁড়িয়ে গেল দুলালের মা। ব্যবসা ছাড়ার সময় ওর বাড়িউলি ওকে শাসিয়েছিল—তোর যৌবনের তেজ পুড়ে যাবে লো—শুকিয়ে মরবি—ভদ্দরলোকের ছেলের মা হাওয়ার অংথার ছাই হয়ে যাবে, তখন কেউ বাঁ পা দিয়েও ছোঁবে না। দুলালের মা না রাম না গঙ্গা—কিছুই সাড়া শব্দ দিল না। ও চটকলের বাবুদের মেসবাড়িতে বাসন মাজার কাজ নিল।

কাশতে কাশতে হাঁপাতে হাঁপাতে মতিচাঁদ বলল—এঁটো পাতা কখনও স্বগ্‌গে যায় না, মানে কি, না এঁটো পাতাকে কখনও স্বগ্‌গে যেতে দেওয়া হয় না। দুলালচাঁদ ভদ্দরলোকের ছেলে হব বললেই তো আর সে ভদ্দরলোকের ছেলে হয়ে যাবে না, তার মা বায়না ধরলেও নয়। ভদ্দরলোকেরা দুলালচাঁদকে দেখলেই মুখ ফিরিয়ে নিত। বরঞ্চ তারা বিন্দির গলির অন্য ছেলেদের দেখলে—কীরে ব্যাটা বলে দু-কথা কইবে, তারা আপনি এজ্ঞে করে কথা কইলে দু-দণ্ড শুনবে কিন্তু দুলালচাঁদের ছায়া বাবুরা এড়িয়ে যাবে সাপকে যেমন করে এড়িয়ে যায় লোকে তেমন করে। এ পাড়ার ছোটলোকদের ছেলেদের সঙ্গে বাবুদের ছেলেরা যদি ভুলে কথা বলে ফেলত তাহলে কিছু যেতো আসতো না—কিন্তু দুলালচাঁদের সঙ্গে যেন বাবুদের ছেলেরা কিছুতেই না মিশতে পায় সেদিকে তাদের নজর ছিল খুবই টনকো। তাই হয় বাবু, নকলওয়ালার ওপর আসলিওয়ালার রাগ থাকে বেশি—মুশ্‌কিল এই যে নকলওয়ালা তা বুঝতে পারে না। অমন দশটা দুলালচাঁদ এই বিন্দির গলিতে ছিল, কিন্তু তাদের মায়েরা কেউ ছেলে আমার ভদ্দরলোক হবে বলে আদিখ্যেতা করেনি—তাদের দুলালচাঁদেরাও ফরসা জামা পরে, চুল ফিরিয়ে বই হাতে করে ভদ্দরলোক হতে যায়নি। কাজেই ভদ্দরলোকের কাছে ঠোকাও খায়নি।

ফি বছরই নবগঞ্জে চড়কের সময় সঙ বেরোয়। বিন্দির গলির ছেলেরাই সঙ সাজে। রঙবেরঙের সাজ পোশাক পরে ঢাক কাঁসি নিয়ে সঙ বেরোয় পাড়া বেড়াতে—পেছু পেছু রসের গান গেয়ে এ পাড়ার ছেলেরা যায়। সঙের যত গান সব খোঁটা দেওয়া গান। কখনও কোনো বড়ো লোককে, কখনও দারোগা পুলিসকে, কখনও জমিদারকে, কখনোও সায়েবদের—যখন যেমন হুজুগ পড়তো তখন তেমন গান বাঁধতো লালমোহন, সে আমলের সেরা ছড়াদার। বিন্দির গলির সব ছেলেরাই এতে ভিড়ে যায়—এই সিদিনও এই সঙের কীর্তন বেরিয়েছে। বিন্দির গলিতে কথাই চালু আছে যে বাবুদের বেরোয় সংকীর্তন আর আমাদের বেলায় সঙের কেত্তন। তা বলবো কি আপনাকে সবাই বেরতো সঙে, খালি ঐ দুলালচাঁদ ছাড়া। ওর মা ওকে শিখিয়েছিল ও কাজ ভদ্দরলোকের নয়। ছুঁচিবেয়ে বুড়ীরা যেমন করে ভেবেচিন্তে বেছে বেছে পা ফেলে দুলালচাঁদের মাও তেমনি সব কাজেই বিচার করত কাজটা ভদ্দরলোকের না ছোটলোকের।

কিন্তু ঘুঁটে-কুড়ুনির ছেলে রাজপুত্তুর হবে এ গল্প ঠাকুমার গল্পেই শোনা যায়—সমসারে কে কবে দেখেছে। যার মা আগে ছিল খারাপ মেয়েমানুষ এখন হয়েছে বাসনমাজা ঝি, নবগঞ্জের মানুষ যত অসম্ভব কাজই করুক না কেন তাকে ভদ্দরলোকের ছেলে কখনই বলবে না।

কাট-মুখ্যু—পেটে বোমা মারলে আঁক্ করবে না রাধু সা পাছে ক বেরিয়ে পড়ে—গুড় আর তামাকের কারবার করে সে নবগঞ্জের বাজার পাড়ায় তিনতলা বাড়ি হাঁকালে, কাজেই রাধানাথবাবু ছাড়া জামতলির ভটচাজ্যিরাও আর রাধু নাম মুখে আনবে না—তা সে থাক্ না কেন তার দু-দুটো মেয়েমানুষ। এ হয়, এ হতে পারে। তা বলে দুলালচাঁদ পাবে ভদ্দরলোক হবার লাইসিন? তার মা ভেবেছিল যে, লাইসিন থানায় গিয়ে ফেরত দিয়ে আসলেই বুঝি অদৃষ্টটাকেও ফিরিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু তাই কি যায়, বাবু।

মতিচাঁদের বক্তৃতার তোড়ে বাধা দিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা, দুলালের বাবার কথা দুলাল জানলো কেমন করে? কে ওকে বলেছিল ওর বাবার কথা এটি আমার বড়ো জানতে ইচ্ছে। প্রশ্নটাকে পাশ কাটিয়ে মতিচাঁদ জিজ্ঞেস করেছিল—দুলাল যে জানতো দুলালের বাবার কথা এটা আপনি জানেন? জবাব দিলাম—হ্যাঁ, তা জানি। মতিচাঁদ জানতে চাইল—কে বলেছে আপনাকে? বললাম—কে বলেছে ঠিক মনে নেই, তবে লোক মুখেই শুনে থাকব আর কি, আর ভাবে গতিকে বুঝেছিলাম হয়তো।

মতিচাঁদ বলল—কেন, আপনি নেপাল রায়কে চেনেন না? মিনসিপ্যালটিতে অ্যাসটন সায়েবের ডানহাত ছিল—যার মুখের বাঁদিকটা ব্যাঁকা, বাঁ চোখের পাতা পড়ে না—পেল্লায় মোটাসোটা মানুষটা। ছোটবেলায় কোনোদিন লক্ষ্য করেননি যে কায়েতপাড়ার সেই নেপাল রায়ের বাগানের কাঁচামিঠে আম আর পেয়ারা চুরি করে খাবার জন্যে ইস্কুল সুদ্ধু সবাই কখনো না কখনো সে বাগানে গেছে, কেবল দুলালচাঁদ ছাড়া। দেখেননি কোনোদিন যে দুলালচাঁদ নবগঞ্জের আর সবখানেই যেত—যেত না কেবল কায়েতপাড়ায়, পাছে নেপাল রায়ের বাড়ির সামনে তাকে যেতে হয়, পাছে নেপাল রায়ের সঙ্গে তার মুখোমুখি দেখা হয়।……কে আবার বলবে—তার মা বলেছে তার বাবার কথা। নেপালবাবুকে দুলালের মায়ের কাছে গাড়ি করে কে পৌঁছে দিত? ঐ হাসেম শেখ। তখন দুলালের মায়ের নাম ছিল লক্ষ্মী। আমার কাছে কে লুকুবে বাবু, নেপালবাবু আর সকলকে বোকা বুঝিয়ে ছিলেন, বোঝান গে যান আমাকে পারেননি। হাসেম শেখই আমাদের কাছে একদিন গল্প করেছিল, বলেছিল নেপাল রায় আর লক্ষ্মীর বিত্তান্ত। বিন্দির গলির পেছনের ধাঙড় বস্তিটা ছিল নেপাল রায়ের। সেখানেও বাবুর যাওয়া আসা যে ছিল না তা নয়। কী নিয়ে একবার—বোধহয় বস্তির খানিকটা বিন্দির গলির খেঁদি বাড়িউলিকে বেচবার মতলব করেছিলেন বলে—বস্তি সুদ্ধু মানুষ ক্ষেপে গেল নেপাল রায়ের ওপরে। দুলালচাঁদ তখন ছোট, বাচ্চা ছেলে। ডাংগুলি পিটতে পিটতে দুলালচাঁদ হাজির হয়েছে বস্তির মধ্যে—তখন নেপালবাবু স্বয়ং হাজির সেখানে, দরোয়ান, লোকজন নিয়ে তকরার করছেন ধাঙড়দের সঙ্গে। সঙ্গে দু-একজন লালপাগড়িও আছে। দুলালচাঁদকে দেখেই ওপাড়ার সব থেকে ফক্কড় ছেলে রামসুখ নেপালবাবুর সামনেই নকশা করে দুলালচাঁদকে ডেকে বসল—কীরে শুয়ার কি বাচ্চা, খুব যে ডাংগুলি খেলছিস। আর নেপালবাবু রেগে কাঁই হয়ে রামসুখকে ঠাস করে এক চড়। জমায়েত যত লোক হাসতে লাগল—দুলালচাঁদ ক্যাবলার মতো তাকাতে লাগল চারিদিকে। কিন্তু নেপালবাবুর কিছু বলবার মুখ ছিল না। দুলালচাঁদের সামনে দাঁড়ালে নেপালবাবুও মাথার ঠিক রাখতে পারতেন না।

হ্যাঁ। ঠিকই বলেছে মতিচাঁদ। এই ঘটনারই আর একপিট আছে যেটা মতিচাঁদ জানতো না আমি জানতাম। একদিন স্কুল-আওয়ারে অঙ্কের ক্লাস

পালিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছি—উদ্দেশ্য আমতলায় গিয়ে জমব। সেদিন সিঁড়ির নিচেয় এক লহমার জন্য এক নাটক দেখেছিলাম—যা জীবনে কোনোদিন ভুলব না। আমতলার উদ্দেশেই দুলালচাঁদও বোধহয় তার ক্লাস থেকে বেরিয়ে আমার আগে আগে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছিল। নামতে নামতে সিঁড়ির মুখে গিয়ে আটকে গেছে দুলালচাঁদ, যেন ইলেকট্রিকে শক্ খেয়েছে। সিঁড়ির মুখে একটু জমির পরেই স্কুল গেট—গেটের এপারে এক ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। গাড়িতে বিপুলকায় নেপালবাবু, সঙ্গে একটি ছোট ছেলে, ফরসা রঙ, সুন্দর দেখতে। নেপালবাবুও চিত্রার্পিতের মতো দু-সেকেণ্ড থমকে গেলেন—কে যেন তাঁকে স্ট্যাচু বলে দিয়েছে। তারপর ঘন ঘন রুমাল দিয়ে মুখ মুছলেন, গাড়োয়ানের ভাড়া মেটালেন। ফেসিয়াল প্যারালিসিস ছিল বাঁ দিকের মুখে—ফলে সারা মুখখানাই ছিল বীভৎস। ঐ মুখখানা দুবার ঘুরে গেল দুলালচাঁদের দিকে। সেই তখন ছোটবেলাতেই আমার মনে হয়েছিল—নেপালবাবু নিজের পাপের ফল নিজে দেখছেন—এখন কি তাঁর মনে হচ্ছে না দু-চোখের পাতাই বুঁজে ফেলি। কিন্তু বাঁ চোখের পাতা কিছুতেই পড়বে না—তাঁর নিজের পাপের ছবি তাঁকে দেখতেই হবে। সেই দিন মনে হয়েছিল নেপালবাবুও এক অভিশপ্ত ভদ্রলোক। আশ্চর্য হয়ে আমি দেখেছিলাম ঐ ছোট ছেলেটা আর দুলালচাঁদের চেহারার মিল—সেই রঙ, সেই নাক, সেই চোখ—আর দুলালচাঁদ? সেই কয়েক মুহূর্তে তার ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল কয়েক বছরের ঝড়। তার মুখের দিকে যখন তাকালাম সে মুখ তখন আমের কুশির মতো সাদা।

মতিচাঁদ বলল—ভদ্দরলোক হবার নেশায় দুলালচাঁদ আপনাদের এতই বিভোর হয়ে গিয়েছিল যে তার আর কাঁক কাঁকুড় জ্ঞান ছিল না। ভদ্দরলোকের ছেলেরা জুতো না পায়ে দিয়েও রাস্তা হাঁটতে পারে, কিন্তু দুলালচাঁদ পারে না। আপনাদের ছেলেদের মাথার চুল উস্কোখুস্কো থাকতে পারে—দুলালচাঁদ মোড়ের মাথায় যেতে হলেও চুল আঁচড়ে নিয়ে তবে যাবে। জামা করাতে হলে তার বিন্দির গলির কানা দর্জিকে দিয়ে কাজ চলবে না—নবগঞ্জের সব থেকে সেরা দর্জিকে হায়রান করে মারতো সে বায়নাক্কায়। এটা ওটা সেটা—নানান ফইজৎ। মনে মনে নিশ্চয় গাল পাড়তো মডার্ন টেলারিং-এর মালিক মাধব—কিন্তু দুলালচাঁদকে ভদ্দরলোক

হতেই হবে। রোববার সকালভোর সে জুতা পালিশ করত—দোকান থেকে অ্যারারুট কিনে নিয়ে গিয়ে জামা ইস্তিরি করত। দামী সাবান গায়ে ঘষে ঘষে চামড়া তুলে ফেলতো গায়ের। বিন্দির পুকুরে এ গলির সব ছে চান করে, সাঁতার কাটে। দুলালচাঁদ বাদ। ছোটলোকের সঙ্গে এক পুকুরে সে চান করতে পারে? ভোর রাত্তিরে তার মা পুকুর থেকে জল তুলে রেখে যেত। সেই জলে বাবু চান করতেন। সকালবেলা সেজেগুজে জুতো পায়ে চুল ফিরিয়ে সে যখন রাস্তায় বেরুত তখন বিন্দির গলির অন্য ছেলেরা সামনাসামনি ফিরেও তাকাত না—আর যেই সে পিছু ফিরত হেসে রোসে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ত—ভদ্দরলোকের উল্টোপিঠ! দুলাল-চাঁদ শুনবো না শুনবো না করেও শুনে ফেলত—শেষে কান লাল করে রুমাল বার করে ঘাড় মুছতে মুছতে তাড়াতাড়ি পেরিয়ে যেতে চাইতো বিন্দির গলির মোড়।

কিন্তু গিধবড় বলব না তো কি বলব বলুন। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে গেলেই বিন্দির গলির হাত ছাড়িয়ে তুই বেরিয়ে যেতে পারবি? বিকেল বেলাতেই তো তোকে আবার ফিরে আসতে হবে। বিকেলের হাওয়ায় বিন্দির গলির ঠাট ঠমক সারাদিনের মতো জিইয়ে উঠত—বিকেল গড়িয়ে যেত সন্ধ্যের দিকে—এ গলির হুল্লোড়ের হাটও আস্তে আস্তে জমে উঠত। মাতালের বেলেল্লা হাসি, বাড়িউলি মাসিদের ভাঙা কাঁসরের মতো গলা আর মেয়েগুলোর হারমোনিয়াম বাজিয়ে বেদরদ গান—বাসী ফুলে কি মধু থাকে। এরি মাঝখানে জানলা বন্ধ করে—হ্যারিকেনের সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে দুলালচাঁদ বই খুলে চ্যাচাত কি সব ইণ্ডিল সিণ্ডিল করে—সারা সন্ধ্যেভর। এক একটা মাতাল প্রাণভরে বক্‌বক্‌ করতে করতে আর বেদম হাসির গররা তুলে যেতে যেতে দুলালচাঁদের ঘরের সামনে এসে কানে হাত দিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ত—কী বলে রে ছোঁড়া—তারপর 'ধ্যুৎ' বলে মাছি তাড়ানোর মতন করে হাতখানা মুখের সামনে নেড়ে এগিয়ে যেতো সামনের দিকে, বোঝাই যেত বিরক্ত হয়েছে তাল কেটে যাওয়ায়। লোকে হাসত মাতালটাকে দেখে—আর বাবু, আমার হাসি পেত দুলালচাঁদকে দেখে—ভ্যালা কারবার জমিয়েছিস বাপ্‌।

কত রাত্তিরে বেহেড মাতালের দল ভুল করে—কিংবা ইচ্ছে করেই দুলালের মায়ের ঘরের দরজায় এসে ঘা দিয়ে গেছে। ওর পড়শী বিনির মুখে শুনেছি

খিল এঁটে ঘরে দাঁতে দাঁত চেপে রাত কাটিয়েছে ওরা মা বেটায়। বেটা কেঁদে ফেলেছে শেষ অবধি, মা গাল পেড়েছে সারারাত। মায়ের গাল শুনে বেটা কান্না থামিয়ে মাকে খিঁচিয়ে উঠেছে—কী ছোটলোকের মতো মুখ খারাপ করছিস তুই। তুই বলাতেই ব্রোঝা যেত শেষটা ছুলালচাঁদ কোথাকার ছেলে—তারপর সে সামলে নিয়ে গলা নামিয়ে বলত—চ্যাচাচ্ছ কেন, আস্তে কথা বলতে পারো না?

ইদানীং সবাই হামেশা শুনতে পেতো ছুলালের মায়ের সঙ্গে ছুলালের বচসা বেধেছে। একটু বড়ো হতে না হতেই সে বুঝেছিল এই সত্যি কথাটা যে তার ভদ্রলোক হওয়ার পথে সব থেকে বড়ো কাঁটা তার মা। কাজেই কোনোদিন মাকে খুব সুনজরে সে দেখত না—মা তার ফাইফরমাস খাটত ঝিয়ের মতো, তার বাবুয়ানার খেসারত মেটাত কর্মচারীর মতো। ছুলাল হয়তো ইস্কুলে যাচ্ছে, ছুলালের মা ফিরছে লোকের বাড়ি থেকে দাসীবিত্তি করে—ছুলালের মা হাসতে চাইবে ছেলেকে দেখে—ছুলাল হাসবে না,—মুখ ফিরিয়ে নেবে—পাছে আপনারা দেখে ফেলেন। ছুলালের মা সাত কথা বললে তবে ছুলাল একটা জবাব দিত। মা মাঝে মাঝে জ্বলে উঠত—আবার খানিকক্ষণ বাদে নিজেই নিভে যেত। বুঝতো যে ছুলালের এ মতি-গতি তার নিজের হাতেই গড়া। এখন আর ছুখ্যু করে লাভ নেই।

তবু এততেও তার কিছু হয়নি। আমি জানি কোনোদিকেই সুবিধে হয়নি তার ইস্কুলে। খেলাধুলোর ভেতর সে কস্মিনকালেও ছিল না। দিবারাত্র পড়ত প্রাণপণে মাথা ছুলিয়ে ছুলিয়ে। ঘষটে ঘষটে কোনোরকমে ক্লাস প্রমোশনের বেড়াগুলো ডিঙিয়ে যেত মাত্র—তাও কোনোবার অঙ্কে ঘাটতি, কোনোবার ইংরেজিতে, কোনোবারে ছুটোতেই। ক্লাসে মাস্টার মশাইরাও তার দিকে বেশি নজর দিতেন না—লাস্ট বেঞ্চিতে বসে বসে শুধু পাস করার স্বপ্ন দেখে দেখে সে কোনোরকমে পৌঁছল ফার্স্ট ক্লাসে।

সে বুঝেছিল একটা সত্য—কোনোরকমে এই ইস্কুলের পাঁচিল ডিঙিয়ে চলে যেতে হবে তাকে। নবগঞ্জের যা কিছু তার কাছে সবই বিষাক্ত হয়ে গিয়েছিল। বুঝেছিল নবগঞ্জে যেখানেই সে থাক না কেন—বিন্দির গলি তার পিছু পিছু ছায়া ফেলবেই—যদি সে কোনোক্রমে পাস করে বেরিয়ে কলেজে যেতে পারে কলকাতায় সেখানে সে মুক্তি পাবে এই নাগপাশ থেকে।

এই জট মনের মধ্যে যত জটিল হয়ে উঠছিল ততই সে হয়ে উঠছিল আরো গম্ভীর। সকল দিকে ঘা খেয়ে খেয়ে খরগোশ যেমন চোখ বুঁজে ফেলে ভাবে বিপদ মুক্তি, সেও তেমনি পড়ার বইয়ে মাথা গুঁজে দিত। আরো প্রাণপণে আঁকড়ে ধরত পাস করার সংকল্পকে—কিন্তু যে প্রহেলিকা তার জন্মমুহূর্তে সেই প্রহেলিকাই যে তার মস্তিষ্কে—জ্যামিতি, অঙ্ক, ইংরেজি প্রিপজিসন অথবা সংস্কৃত বিভক্তি সবাই যেন নবগঞ্জের ভদ্রলোক বনে গেছে—কেউ তার কাছে দোর খুলবে না। দিনকে দিন সে শুকিয়ে ভাঁটা হয়ে গেল—রাত জাগার ফলে, অতি পরিশ্রমে সে হাঁপাত। খেলা নেই, ধুলো নেই—কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই, কোনো বিশ্রাম নেই, বিরতি নেই, দাঁতে দাঁত চেপে দুলালচাঁদ পড়ে যেতে লাগল—বিন্দির গলির গোলকধাঁধা তাকে ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতেই হবে।

তবু টেস্টের বেড়া টপকাতেই তার দু'বার লেগে গেল। তৃতীয় বছরে অবশেষে আমাদের দাদাদের সঙ্গে অ্যাপিয়ার হল ম্যাট্রিকুলেশনে। কপালে দইয়ের ফোঁটা কেটে পকেটে ফুল বেলপাতার আশীর্বাদী নিয়ে আমাদের দাদারা সব পরীক্ষার হলে জড়ো হত—দুলালচাঁদও শুকনো মুখে বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে কাঁপতে বিরস মুখে হাজির হত। প্রতিদিনই পরীক্ষার পর সবাই জড়ো হত হলের বাইরে—আলোচনা করত কে কী লিখল—কার কী লেখা হল না। সে কোনোদিন এ আলোচনায় যোগ দিত না। ক্লান্ত দেহ টানতে টানতে চলে যেত ঘরমুখো।

টিফিনের সময় আমি যেতাম দাদার জন্যে খাবার নিয়ে। বারীনের দাদার জন্যে সোফার আসতো গাড়ি নিয়ে, ওর মা আসতেন বাবা আসতেন। আসতো ফ্লাস্ক আর টিফিন ক্যারিয়ার বোঝাই খাবার। বারীন প্রায়ই কাউকে না কাউকে ডেকে নিত। সকলেরই কেউ না কেউ আসতো। কেবল দুলাল থাকতো একা। খাবারের কৌটো থেকে খাবার খেয়ে—বাঁধানো নিমগাছ তলায় বসে চারিদিক একবার নিঃসঙ্গ দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিয়ে ও পরের হাফের সাবজেক্ট পড়তে শুরু করত। তার ডুবুডুবু দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে আমরা বুঝতে পারতাম সহজেই—সে কেমন করছে পরীক্ষায়।

ভূগোল পরীক্ষার দিন নকল করতে গিয়ে ধরা পড়ল দুলালচাঁদ। কালীবাবু ছিলেন গেম টিচার—পরীক্ষার সময় নকল করা ধরতে তিনি ছিলেন সবচেয়ে ওস্তাদ। নকল ধরে-ফেলাকে তিনি বলতেন ক্রিকেটের পরিভাষায়

কট আউট করা। ভূগোল পরীক্ষার দিন সকলেই যখন আফ্রিকার ম্যাপ আঁকতে ব্যস্ত, দুলালচাঁদ তখনই ঠিক কট আউট হল—ওকে বেরিয়ে যেতে হল পরীক্ষার হল থেকে। মুখ চুন করে, মাথা নিচু করে সে চলে গেল। বারীনের দাদা বলেছিল যে, মনে হচ্ছিল ধরা পড়ার জন্যে ততটা লজ্জিত নয় সে, যতটা দুঃখিত এবারেও পাস করা হল না বলে।

আর নবগঞ্জ এমন জায়গা যে দুলালচাঁদ ম্যাট্রিকুলেশন দিচ্ছিল এ খবরটা কেউ জানত কিনা একেবারেই বোঝা যায়নি—কিন্তু নকল করতে গিয়ে শেষে ধরা পড়েছে এ খবরটা ছড়িয়ে গেল চারিদিকে, ঢি ঢি পড়ে গেল সারা শহরে এক লহমার মধ্যে।

হ্যাঁ, আমার মনে পড়েছে ব্যাপারটা—মতিচাঁদ বলল। সেদিন বিকেল বেলা দুলালচাঁদের ঘরের সামনে ভিড় জমে গিয়েছিল খুব। দুলালের মা শাপান্ত বাপান্ত করছিল দুলালের। আর দুলালচাঁদও কিছু চুপ করে সব শুনে যাচ্ছিল না। দুলালের মা ব্যাপারটা বুঝেছে এই যে, চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে দুলাল—মাস্টাররা ধরে ফেলেছে। ওর মায়ের বুকেই যেন অপমানের শেলটা বেজেছিল বেশি করে। সেদিনই কথাটা ওর মা বলেছিল—এঁটো পাতা কখনো স্বগ্‌গে যায় না, তোর ঠাঁইও আস্তাকুড় ছাড়া হবে না। তুই চুরি করতে গেলি কি বলে। দুলালচাঁদ হ্যাঁ নয়, হুঁ নয় চুপ করে বসেছিল। শেষটা আর সহ্য না করতে পেরে বলেছিল—তা এঁটো পাতাকে তোর স্বগ্‌গে তোলার সখ কেন, আমি এঁটো পাতা আমাকে এঁটো পাতার মতো থাকতে দিলেই তো হত। দুলালের মা জবাব দিল—ঠিক বলছিস তুই, আমারই ভুল—তোকে আমি ভদ্দরলোক বানাতে চাইলে কী হবে, তোর গায়ে রয়েছে জাত ছোটলোকের রক্ত। আর কিছু বলতে হয়নি তার আগেই দুলালচাঁদ ছুঁড়ে বসেছে একটা ভাঙা পেতলের থালা—তারপর বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে। ঘর থেকে বেরিয়েই হাঁটা দিল গঙ্গামুখো।

পাড়ার লোকেরা দুলালকে গাল দিতে লাগল—বিন্দির গলির মেয়েরা কেউ দুলালের মায়ের কাটা কপালে ন্যাকড়া পুড়িয়ে টিপে দিতে লাগল। কেউবা বলল, কাকের বাসায় কোকিল ডিম পাড়লে এই হয়। কোকিলের গলা ফুটলে সে আর কাকের কেউ নয়। ঘরের খুঁটি ধরে বিন্দির পুকুরের দিকে তাকিয়েছিল

দুলালের মা। যারা ন্যাকড়া পুড়িয়ে কপালের ঘায়ে টিপে দিচ্ছিল তাদের বলল—থাক ভাই আমার কপালটাই কাটা, ও আর বাইরে থেকে জোড়া লাগালে কী হবে।

ভিড় আস্তে আস্তে কেটে গেল—কেননা দিন আস্তে আস্তে শেষ হয়ে গেল। বিন্দির গলির মেয়েদের সাজবার সময় উৎরে যাচ্ছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল শুধু দুলালের মা। ও বাড়ির অন্য মেয়েদের কাছে পরে শুনেছিলাম সেদিন সারা সন্ধ্যে সে অমনি দাঁড়িয়েছিল—রাস্তার দিকে মুখ করে--কখন দুলালচাঁদ ফিরে আসবে তারই পথ চেয়ে।

সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত হল। বিন্দির গলির বিকিকিনি রোজকার মতো রাত নটা নাগাদ জমে উঠল। হয়তো একটা মাথা ফাটল, হয়তো কেউ কাঁদল, হয়তো কেউ ভাবল ও কান্না নয় মাতলামো। তারপর রোজকার মতোই বেলেল্লার হাট ঝিমিয়ে গেল। সেই কাটা কপালটা নিয়ে ফাঁকা রাস্তাটার মুখোমুখি বসে রইল দুলালের মা। কোথায় দুলাল! সারা রাত্তির ধরে নবগঞ্জের জেটিতে মাল খালাস মাল বোঝাইয়ের শব্দ আকাশে ভেসে গেল। অন্ধকারে বাতিভাঙা লাইট-পোস্টগুলো ভূতের মতো দাঁড়িয়ে রইল ঠায়। বিন্দির গলির তাড়িখোড় মাতালগুলো মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে জেগে ওঠে –আবার ঘুমিয়ে পড়ে। খুঁটির গায়ে হেলান দিয়ে শেষটা ঘুমিয়ে পড়ল দুলালের মা। ওর পড়শী বিনি এসে ওকে একবার দেখে গেল—ঘুমোচ্ছে দেখে আর ডাকল না।

মতিচাঁদ বলল—ভোরবেলায় আমি তখন গাড়ি নিয়ে ইস্টিশনের দিকে যাব। ঢাকা মেলের প্যাসেঞ্জার ধরব। ঘোড়াগুলোকে দানাপানি দিয়ে মোড়ের মাথার দোকানে চা আর মুড়ি খাচ্ছি বসে বসে—এমন সময় বিনি চেঁচাচ্ছে শুনতে পেলাম। কী সর্বনাশ হল গো। কে একজন ছুটে এদিকে আসছিল বলল—মতিদা শিগ্‌গির চলো দুলাল গলায় দড়ি দিয়েছে। কোথায়? না গঙ্গার ধারে গঙ্গাযাত্রীদের ভাঙা ঘরে। খাওয়া তো উঠল মাথায়, তাড়াতাড়ি কি করি গাড়ি নিয়েই ছুটলাম। রানী ভবানীর তৈরি করা গঙ্গাযাত্রীদের ঘর। আগে বুড়োদের অন্তর্জলি করার সময় কাজে লাগত। এখন তো ভেঙেই গেছে, তখন অমনিই পড়ে থাকত। সেই ঘরের কড়িকাঠে ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়েছেন আপনাদের দুলালবাবু। ঘাট-মাঝিদের ছেলে কোন্ একটা মেয়ের সঙ্গে আসনাই করতে গিয়েছিল ঐ ঘরে—ওটা ঐ কাজেই লাগত তখন। সে-ই সবার আগে দেখেছে কে যেন ঝুলছে। মেয়েটাকে পাচার করে দিয়ে ছেলেটা

তখন চেঁচিয়ে লোক জড়ো করেছে, আপনাদের সঙ্গেই পড়ত কে এক ছোঁড়া ওকে সনাক্ত করেছে।

আমি বললাম—মাখন, মুকুন্দ পোদ্দারের ছেলে। তারপর আর কী? মতিচাঁদ বলল—চেঁচামেচি, হৈ হুল্লোড় আর রাজ্যের লোকের মেলা লেগে গেল। দুলালের মা খবর পেয়ে ছুটল—ছুটল বিন্দির গলির অন্য মেয়েরা, ছুটে গেল যাদের সঙ্গে দুলালচাঁদ কস্মিনকালেও কথা কইত না সেই বখাটে ছেলেগুলো। পুলিস এল। এল বাঁড়ুজ্যে বাড়ির নায়েব। হরেক কিসিমের লোক হরেক রকমের কথা আরম্ভ করল। কেউ বলল—এ গঙ্গাযাত্তিরদের ঘরখানা মিউনিসিপ্যালিটি ভেঙে দেয় না কেন? সেবারও হরিসাধনের বাবা গলায় ক্ষুর বসালো এই ঘরটায় ঢুকে। আর একজন বলল—ও ঘরটা এবার ভূতের ঘর হয়ে যাবে মাইরি। বাঁড়ুজ্যে বাড়ির নায়েব বলল দুলালচাঁদের মাকে—হতেই যদি ছোঁড়াকে বিন্দির পুকুরে ডুবিয়ে মারতিস············দেখ সেই মোলো, মাঝখানে তুই হ্যাপা পুইয়ে মলি। কে একজন বলল—যাক্ আজ নেপাল রায় হাঁপ ছাড়বে একটা।

দুলালচাঁদের মা কোনো কথা বলছিল না। শুধু যে যখন যা বলছিল বোকার মতন তার দিকে তাকিয়ে তার কথা বড়ো বড়ো চোখ বার করে শুনছিল। কিন্তু কিছু বুঝতে পারছিল না।

দারোগা পুলিসের ফইজৎ নায়েব মশাই সামলে দিতে গেলেন কিন্তু পারলেন না। বিন্দির গলির ছেলেরা এই প্রথম দুলালচাঁদকে তাদের ভাইয়ের মতো কাঁধে তুলে নিল, তুলে নিয়ে দারোগাবাবুর হুকুমে আমার গাড়িতেই তুলে দিল লাস, থানায় নিয়ে যেতে হবে। বাবু আগেই বলেছি, অনেক প্যাসেঞ্জার টেনেছি জীবনে কিন্তু সেদিনের মতন গাড়ি চালাতে গিয়ে চোখে জল কোনোদিন আসেনি। দুলালচাঁদের মা বিনিকে জিজ্ঞাসা করল শুধু—নিয়ে যাচ্ছে না? তারপর তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে—যেদিকটায় নবগঞ্জের ভদ্দরলোকেরা জোট পাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, দেখছিলেন ব্যাপারটা—সেদিকটায়। বাবু, এটা যদি কলিযুগ না হয়ে সত্যযুগ হত তাহলে দুলালের মায়ের চোখের আগুনে নবগঞ্জের ভদ্দরলোকেরা সব পুড়ে ছাই হয়ে যেত সেদিন। আমি কোনো মানুষের চোখে অমন আগুন কোনোদিন দেখিনি।

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। নবগঞ্জের আকাশের রঙে চটকলের চিমনি যত পেরেছে ঢেলে দিয়েছে সারাদিনের ধোঁয়া। সেই ধোঁয়াটে আকাশের দুর্বোধ্য ধাঁধার

দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলাম খানিকক্ষণ। দুলালচাঁদের বিফল স্বপ্নের মতো আকাশের রঙও কি এখানে ব্যর্থ? উঠে পড়লাম সেদিনের মতো। জিজ্ঞাসা করলাম মতিচাঁদকে—দুলালের মায়ের কি হল শেষটা?

কাশতে কাশতে মতিচাঁদ জবাব দিল—দিনকতক পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল, তারপর সয়ে গেল আস্তে আস্তে—আর কী? তবে একটা কথা এর মধ্যে না বলে রাখলে অধর্ম হবে। নেপালবাবুকে আর এর পরে নবগঞ্জের রাস্তায় কি মিটিন-ফিটিনে খুব কম দেখা যেত—দেখা যেতো না বললেই হয়। অন্তত বিন্দির গলির এদিকে তাঁকে আর একদম দেখা যেত না।

আমি জানি দুলালচাঁদের গল্পে কারো মন ভরবে না। জানি সবাই বলবেন, বকুলবালা এবং দুলালচাঁদ দুটোই তো বিকিকিনির হাটের দুটো দেউলে লোকের কাহিনী। তাই, ঠিকই। কিন্তু নবগঞ্জের বিকিকিনির বাজারে এ দুটো দেউলে লোকের কথা তো আমি বাদ দিয়ে যেতে পারি না—এ নাটমঞ্চের সহস্র রজনীর অভিনয়ে অনেক কুশীলবের মধ্যে এরাও দুজন। যার যেমন ভূমিকা সে তো তেমনি অভিনয় করবে, একে কেউ কি ইচ্ছে করলেই পাল্টাতে পারে?

এ বিকিকিনির হাটের জন্মলগ্নে যে নক্ষত্রের দৃষ্টিচিহ্ন লেগে রয়েছে তাকে এড়িয়ে যাবে কে? বকুলবালা বেচতে এসেছিল রূপ যৌবন—কিন্তু নবগঞ্জের বাজারের তেজী-মন্দার মাঝখানে কখন যে তার হৃদয় নিয়ে বেচাকেনা সেরে ফেলেছিল তা কী সে জানত? সে তো তবু তার পাট গুটিয়ে ফেলার সময় ছড়িয়ে গিয়েছিল এক মুঠো ফুলকি—কিন্তু দুলালচাঁদ? জমার অঙ্কে শূন্য বসিয়ে খরচের অঙ্কে লিখে রেখে সারা জীবন, দুলালচাঁদ নবগঞ্জের সকল ধাপ্পাবাজির, সকল চালিয়াতির —ছুঁচোর কেত্তন আর কোঁচার পত্তনের—নিদর্শন হয়ে রইল চিরকাল।

কিন্তু বিকিকিনির হাটের এই খেলা থেকে বাদ যাবে কে? অ্যাসটন সায়েব, ম্যাকফারসন, শ্যামধারী, পারবতীয়া, কিংবা মতিচাঁদ অথবা আমি—কেউ কি বাদ যাব—হে নবগঞ্জ তার জবাব কি তুমি জানো?

নবগঞ্জের আত্মা বলে—'না।' সে বলে তোমাদের এই শ্রীক্ষেত্রে আমি এক অভিনব জগন্নাথ, হাত নেই, কিছু করতে পারি না, পা নেই কোথাও যেতে পারি না, কান নেই, কিছু শুনতে পাই না। চোখ আছে, হে যুবক, শুধু দেখে যেতে পারি।

চার

> **হে নগরী তব ফেনিল মত্ত**
> **উছসি উলসি উঠিছে সত্ত...**

ভোর হয়েছে অনেকক্ষণ। গরমকালের রোদ নবগঞ্জের এবড়ো খেবড়ো রাস্তায় অনেকক্ষণ নেমে পড়েছে। ময়লা ফেলা গাড়িগুলো ঘং ঘং করে আওয়াজ করতে করতে দু-পাশের লোকের শাপমন্যি কুড়িয়ে গেছে। রামছাগলের দল নিয়ে ছাগল দুধওয়ালা ঘন্টি বাজাতে বাজাতে চলে গেছে—এক পয়সার ডালপুরি আব এক পয়সার হালুয়ার থালা শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। এখন যদি কেউ কিছু খায় তবে থাক সে পেঁয়াজের বড়া আর ফিরিওয়ালার চা।

নবগঞ্জের ঘুমভাঙা রাস্তায় চটকলিয়ার দল ধুলো ওড়াবে এবার। মিলগেটমুখো একটানা জনস্রোত চলতেই থাকবে এখন যতক্ষণ না মিল-চালু বাঁশি বাজছে। খাকি হাফশার্ট ময়লা ধুতি পরা রাজা-উজির-মারা বাঙালী, উড়রু বুড়রু মাদ্রাজী, অকারান্ত ওড়িয়া যুবক, এলোমেলো বিলাসপুরী মেয়ে, ছাপরা-দ্বারভাঙ্গার লোহাপেটা দোসাদ আর নূরওয়ালা তাঁতী এখন সবাই একমুখো।

চলল সাজনদার, তোলনদার, স্যাংরা। চলল সেলাই ঘর, তাঁতঘর, ইস্প্রিং। ছুরি হাতে কাটাইওয়ালী মেয়ে, হাতি কলের চামচিকের মতো মজুর আর রিপুঘরের ছুঁচ হাতে মেয়ে। স্রোত যেমন করে সবগুলোকেই একমুখো ভাসিয়ে নিয়ে যায়—এই বিপুল জনযূথকে তেমনি করে কিছুতে যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ঘুমভাঙা ফোলা চোখ—আর নিঃশব্দ পথচলায় কেবল পশ্চিমা নাগরা জুতোর ভারী শব্দ—সাইকেলের টিং টিং—রিক্শার ভেঁপু বাজতে থাকে—কিন্তু কথাবার্তা বাতচিত—খামোশ, চুপ যা, ওসব সামকো বখত হবে ছুটির সময়।

পুরনো বস্তি জামতলির গঙ্গার ধারে। দেখতে দেখতে ফাঁকা হয়ে গেল। রইল শুধু মুরগীর ছানাপোনা আর তাদের মা। রইল বাচ্চা ছেলেগুলো প্রায় নিভরসায়। নতুন বস্তি—মিল এলাকার মধ্যে—ফাঁকা হয়ে গেল। মায়ের বুক ছাড়ানো ছেলেপিলেগুলো একটু কাঁদল। খকখকে বুড়ো হাবড়ার দল খাটিয়া নিয়ে চিত হয়ে শুয়ে থাকুক সেই বেলা সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত। থুথু ফেলুক আর গয়ের ছিটোক। এখন কারুর সময় নেই। উত্তরের রাস্তায়

দক্ষিণের রাস্তায় অলিতে গলিতে এখন শুধু তাড়াতাড়ি করে মিলগেটের ওধারে চলার পালা। এখন কারুর সময় নেই।

নামাবলি কাঁধে জামতলির প্রবীণেরা আঁকশি হাতে করে ফুল তুলতে যাচ্ছে—তাদের ছেলেরা ক্যাম্বিসের জুতো পরে খাবারের কৌটা হাতে করে হাঁটা দিল মিলগেট পানে। কচর মচর করে পান চিবোতে চিবোতে পরিতৃপ্তির মেদ· শরীরে মিলের বড়োবাবু চলে গেলেন ধীর মন্থর পদে। উনি রিকশা করেই যেতে পারেন, ডাক্তারে হাঁটতে বলেছে তাই হাঁটেন। চলে গেলেন একদল উমেদার পিছনে হাজরেবাবু, সব কথায় ঘাড় নাড়তে নাড়তে। চলে গেল হাতে ফ্যাটা-বাঁধা ভিখু সর্দার। কাল রাত্রে বস্তিতে পঞ্চায়েত বসিয়েছিল সর্দার। রামচরিতের ছেলে গঙ্গা জানকির বেটির হাত ধরে টেনেছিল তাই নিয়ে পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েতের রায় মানতে চায়নি গঙ্গা তাই সর্দার হাত চালিয়েছিল। গঙ্গার যত না লেগেছে তার চেয়ে ঢের বেশি লেগেছে সর্দারের হাতে। চলে গেল গাড়ি হাঁকিয়ে মিলের ডাক্তার সায়েব হর্ন বাজাতে বাজাতে। গেল লতিফ মিয়া—নতুন বস্তির সব লোক যার কথায় ওঠে বসে, মোতাহের, সিধু, ফুজন, সরস্বতী, পারবতীয়া, বালেশ্বর, শিউকুমার, ভোলা ......আরো অনেকে।

এখনই কয়েক মিনিট পরে নবগঞ্জ-জামতলির রাস্তা আবার ফাঁকা হয়ে যাবে। মেয়েরা চান করতে যাবে গঙ্গায়, ছেলেরা মর্নিং স্কুলে যাবে বই বগলে। করবীর ডালে শিস্ দেবে টুনটুনি আর সবে-ছাড়া-পাওয়া বাছুর লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াবে এখানে ওখানে। মনে হবে নবগঞ্জ-জামতলির মতো নিরুদ্বেগ জীবন বুঝি আর কোথাও নেই—মেয়েরা গঙ্গার ধারে অশথতলায় জল ঢালছে, মন্ত্র পড়ছে বুড়ীরা। উড়ে বামুন সাজিতে ফুল-চন্দন নিয়ে দোকানে দোকানে গণেশ পুজো করে যাচ্ছে। এখন আর কারুর কোনো তাড়া নেই। সব দ্রুততা, সব ব্যস্ততা নবগঞ্জের এখন জমা হয়ে গেল মিল গেটের ওধারে—বিপুল শব্দ করে সাড়ে ছ-টার ভোঁ বেজে গেল টানা একমিনিট ধরে। মিল চালু হো গিয়া।

হাঁ করা মিলগেট গ্রাস করে নিল মানুষগুলোকে একগ্রাসে—তারপর ভোজনক্লান্ত ময়ালের মতোই হাঁ করে পড়ে রইল—বুথ অ্যাণ্ড হেণ্ডারসনের বিরাট লোহা ফটক বন্ধ করার হুকুম নেই—মন্দির রয়েছে ভেতরে, বাঁড়ুজ্যে বংশের কবল ছিনিয়ে বুথ অ্যাণ্ড হেণ্ডারসনের মিল জমিতে কায়েম হয়েছে বটে, কিন্তু রয়ে গেছে বাঁড়ুজ্যে বংশের শেষ থাবার চিহ্ন—মন্দিরখানা।

দুটো তাগড়া জোয়ান সেপাই মিলের তকমা এঁটে বুকে, বন্দুক কাঁধে চড়িয়ে, কার্তুজের বেল্ট ঝুলিয়ে এদিক ওদিক পায়চারি করছে গেটের সামনে। বুথ অ্যাণ্ড হেণ্ডারসনের সমস্ত দম্ভের, সমস্ত শাসনের প্রতীক এরা। এখন আর কারুর বেওজর বেরিয়ে যাওয়া চলবে না, ঢোকাও চলবে না। খানিক বাদে যখন ম্যানেজারের সুদৃশ্য গাড়িখানা প্রায় নিঃশব্দে গেটের মুখে আসবে—তখন ওরা দুজনে দু-দিকে সরে গোড়ালি ঠুকে একসঙ্গে একখানা করে দেড়গজী মিলিটারি সেলাম ঠুকবে—সায়েব ভেতরে চলে গেলে একটু নিশ্চিন্তি—এখন দু-এক হাত খৈনি খাওয়া চলবে—এ রামখেলন আচ্ছাসে খৈনি বানাও তো।—

আসসি টিপ্‌পি নব্বে তাল
তব দেখো খৈনি কি হাল।

আই-সি-এস কুলতিলকের মধ্যেই কখনো সখনো মেলে গ্রীয়ারসন্ টড। চটকলের সায়েব সে বস্তু নয়। ব্রিটিশ আইলসের বেনেতি স্বার্থের পয়লা নম্বরের প্রহরী হলেন এঁরা। কালচার? না। এঁরা বোঝেন কেবল এগ্রিকালচার—এঁরা বোঝেন কেবল কেমন করে পাটের স্বর্ণাভ তন্তুর টানা-পোড়েনে বিলিতি ব্যাঙ্কের স্বর্ণকুবেরের সিংহাসনে আস্তরণ রচনা হবে। গঙ্গার ধারে ধারে প্রাসাদপুরীর ঐশ্বর্যবিলাসে পূর্ণ হয়ে আছে চটকল ম্যানেজারদের ফ্যামিলি কোয়ার্টার্স—সাহেব কোঠি! গঙ্গার জলে চিমনির ছায়া, পাটকলের গাদ, জেটির আলোকমালার প্রতিবিম্ব—আর ঢেউয়ে সায়েব কোয়ার্টার্সের পিয়ানো প্রগলভ কাকলি। তখনকার এক একটা চটকল ম্যানেজারের রক্তে ছিল শুধু ধূর্ততার আবর্ত আর দম্ভের ফেনিলতা।

নবগঞ্জের চটকলে সবসুদ্ধু বোধ হয় গণ্ডা দুয়েক সায়েব দেখেছি—মতিচাঁদ বলে-ছিল, কিন্তু অ্যাসটন সায়েবের মতো জাঁহাবাজ সায়েব আর একটি তো দূরের কথা আধখানিও ছিল না। যদি জিগ্যেস করেন যে, অ্যাসটন সায়েবের মতো সায়েব-সুবোর ব্যাপারেও আমি সব খবর যোগাড় করলাম কী করে, সায়েবরা তো আর মোটর ছাড়া ঘোড়ার গাড়ি চাপে না যে তাদের সঙ্গে আমার জান্ পহচান্ হবে—বলতে পারেন এ কথা আপনি। ঠিক কথা। কিন্তু সায়েব ঘোড়ার গাড়ি না চাপুক সায়েবের আর্দালি তো চাপে। বাজার করতে গেছে নবগঞ্জের হাটে, ঝুড়ি বোঝাই মুরগী কিনবে কুড়ি দরে আর আণ্ডা কিনবে

শয়ের দরে, সে কি বাবু কুলির মাথায় যায়? যেতে কি পারে না সত্যি, তা পারে, কিন্তু তাহলে বড়ো সায়েবের আর্দালির ইজ্জত থাকে না। বাজারে, জানেনই তো বড়ো সায়েবের আর্দালির খাতির বড়ো সায়েরের থেকে বেশি।

অ্যাসটন সায়েবের আর্দালি কাদের আলির সঙ্গে আমার খাতির ছিল খুব। আমার গাড়ি ছাড়া আর কারুর গাড়ি তার মনে ধরত না। তা ছাড়া পয়সা কড়িরও একটা বোঝাপড়া তার সঙ্গে আমার হয়ে গিয়েছিল।

এ সময়টা বাবু আমার কেটেছে খুব ভালো। বাস্ বা রিকশার কথা তখন দুঃস্বপ্নেও ভাবি না। বুকে তখন অঢেল সাহস। ভাবছি দিন ঠিক কেটে যাবে এমনি করে। পয়সা তখন নবগঞ্জের বাজারে উড়ে বেড়াচ্ছে—ধরে নেবার ওয়াস্তা শুধু। ইস্টিশনের সামনে যত ঘোড়ার গাড়িওয়ালা সবাই তখন আমীর বাদশার মতন মেজাজ নিয়ে গাড়ি চালায়। অবসর সময়ে গুলতুনি করে মোড়ের মাথায়, কি মিনসিপ্যালটির রোয়াকে। যত রাজ্যের কেচ্ছা আর যত রাজ্যের গল্প তখন হেঁটে এসে কানে ঢুকতো। কাদের আলি এসে দিয়ে যেত তার সায়েবের খবর, মাথার দিব্যি দিয়ে যেত যেন পাঁচকান না হয়। সে পেছু ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে দেখতে পঞ্চাশ কান হয়ে যেত সে কেচ্ছা। বেশ কেটেছে সে সময়টা বাবু, সেদিন আর ফিরবে না আমার।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম, অ্যাসটন সায়েব। বললাম যে নবগঞ্জে অনেক সায়েব ছিল, কিন্তু সব থেকে দাপটের সায়েব ছিল তাদের মধ্যে অ্যাসটন সায়েব। সায়েবের যেমন ছিল দানোয় পাওয়া মড়ার মতো চেহারা আর তেমন ছিল তিরিক্ষি স্বভাব। লম্বায় পাকা বোধ হয় ছ-হাত আর চওড়ায় পৌনে এক হাতও হবে না এমনি তার চেহারা। থানার দারোগা থেকে শুরু করে মহকুমার ডেপুটি সায়েব পর্যন্ত সবাইকেই আঙুলের ডগায় বেঁধে রেখেছিল অ্যাসটন সায়েব। অ্যাসটন সায়েবের নামে নাক সিঁটকোত না এমন লোক আমি দেখিনি নবগঞ্জে। একদিকে সে ছিল মিলের ম্যানেজার, মিনসিপ্যালটির চেয়ারম্যান, ইস্কুলের কর্তা, ফুটবল কেলাবের মোড়ল—নবগঞ্জের কেষ্ট বিষ্টু নয়, একসঙ্গে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ছিল সে।

গঙ্গার ধার থেকে যে লম্বা রাস্তাটা সোজা চলে গেছে জামতলি ছাড়িয়ে ঐ ওধারে চাটুজ্যে পাড়া পর্যন্ত সেই রাস্তার নাম অ্যাসটন রোড। ঐ অ্যাসটন সায়েবই চেয়ারম্যান থাকা কালে নিজে রেখেছেন। দেমাকে দাপটে হম্বিতম্বিতে সারা নবগঞ্জের জমিদারীটাই যেন কিনে নিয়েছিল সায়েব—

বাঁড়ুজ্যেদের জমিদারীর দাপট তখন হয়ে গিয়েছে ঢোঁড়া সাপ—ফণাও নেই, বিষ তো কবে ঘুচে গেছে। রোববার দিন সকালে মেমসায়েবের হাত ধরে অ্যাসটন সায়েব বেড়াতে বেরুতো নবগঞ্জের রাস্তায়। অ্যাসটন রোড ধরে দু-ধারী সেলাম কুড়ুতে কুড়ুতে সায়েব মেম দুজনে চলে যেত হাঁস যেমন করে চলে যায় জল চিরে ঠিক তেমন ধারা। সামনাসামনি অবিশ্যি সবাই সেলাম ঠুকতো—আর যেই ওরা পিছু ফিরতো কেউ বলতো থুঃ, কেউ বলতো ওয়াক, আবার কেউ বলতো গলা নামিয়ে হারামী কা বাচ্চা। ভাগ্যিস একটা গুণ ছিল সায়েবের, পিছু ফিরতো না কখনো—শুয়োরের মতো এক বগ্‌গা চলেই যেত মেমকে নিয়ে তা নইলে আর রক্ষে ছিল না। যদি কেউ সেলাম করতে ভুলে যেত আর তারপর কখনো কোনোদিন সায়েবের কাছে কোনো ব্যাপারে গিয়ে দাঁড়াত, সায়েব বলত—উরোজ তুম হামকো দেখা নেই উ পেড়কা নজদিক—বললেন হয়তো, না সায়েব। —কাহে? সুজতা নেই আঁখমে? হাঁ সায়েব সুজতা হায়। —তব? বলে তাকিয়ে থাকবে আর শিস্ দেবে একটানা—তারও পর খানিক বাদে জিজ্ঞাসা করবে—তব? দেখা নেই কাহে? আপনি তখন ঘেমে নেয়ে গেছেন ভেতরে ভেতরে।

কাজ থেকে উঠে পেচ্ছাপ করতে গিয়েছিল পিষাই কলের হরিয়া—একটু বুঝি দেরি হয়েছিল আসতে—এসে দেখে তার জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শিস্ দিচ্ছে ছড়ি হাতে অ্যাসটন। হরিয়াকে দেখেই আস্তে আস্তে বলল—একদম বাহার চলা যাও, গেট কা বাহার, তারপর হাঁকলেন—বড়াবাবো, উসকো হাত হপ্তা দে দিজিয়ে। হরিয়ার দিকে ফিরে আরো জোরে হাঁকবেন—চলা যাও, ডবল মার্চ। তখন বাবু, সবে পয়লা যুদ্ধ শেষ হয়েছে, এখনকার মতো হুট করতেই ফ্যাক্টরি কারখানায় লোকে যেমন লাল ঝাণ্ডা ডেকে বসে তখন্ তেমন নয়। চাকরির বাজারেও তখন হা চাকরি জো চাকরি। একজনকে তাড়িয়ে দিয়ে গেটের কাছে এসে সায়েবই ডেকে নেবে কাউকে—মেলা লোক বসে আছে সেখানে তীর্থের কাকের মতো—অ্যাই বলে শিস্ দিয়ে ডাকবে—কাম অন—ব্যাস লোক ছাঁটাই, লোক ভর্তি দুইই হয়ে গেল দু-মিনিটের মধ্যে, এই ছিল অ্যাসটন সায়েব। সকাল বেলায় জলখাবারের ছুটি চাইতে গিয়েছিল সিলাই ঘরের দেওকী, তাজ্জব হয়ে গিয়ে ম্যানেজারের কাছে ব্যাপারটা পেশ করলে সর্দার—বেটি বলে, কি জল খাবার ছুটি। অ্যাসটন বলল—নো, জল খানেকো ছুটি নেহি মিলেগা, পানি খানেকো মিলনে সেকতা।

কোনো ম্যানেজার এমনধারা শুনিনি যে সারাদিন শুধু মিলের মধ্যে টো টো করে ঘুরছে আর এর পেছনে, ওর পেছনে কাঠি দিচ্ছে। মিলের সবাই দেখতে পেত দূর থেকে লম্বা গলাখানা শকুনের মতো সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে ঝুঁকিয়ে অ্যাসটন সায়েব আসছে। সাড়া লেগে যেত ব্যাচিং ঘরে—সিঁটিয়ে উঠত পাঁজা ধোওয়ারা (জুট ক্যারিং কুলি) তড়িঘড়ি করত গুদামঘরের সর্দারেরা, কেঁপে উঠত মাগীকলের (ওয়ার্প ওয়াইনডিং) সামনে মেয়েগুলো। ঠিক জায়গায় গিয়ে, ঠিক তাল বুঝে দাঁড়িয়ে যাবে অ্যাসটন—কোম্পানি তোমকো দিল্লাগি করনেকো লিয়ে রুপেয়া দেতা—ইউ ব্লাডি সুখলাল। সঙ্গে সঙ্গে তিনগুণ চেঁচিয়ে উঠবে কালো চামড়ার ওভারসিয়ার সায়েবেরা।

তখনকার আমলে কোম্পানিতে ঠিকাদারেরা অর্ধেক লোক দিত। ঠিকাদারের লোকেরা যদি জখম হত, যদি কারুর হাত ছুটে যেত কি পা চলে যেত তার জন্যে কোম্পানি কোনো খেসারত দিত না। কোম্পানি শুধু নিজের ঘরের লোকদের জখমি খেসারত দেবে। কোম্পানির নিজের ঘরের লোক আর কজন বাবু—কাজেই খেসারতি খরচা বেঁচেই যেত। অ্যাসটন সায়েব কিবা ঠিকাদার কিবা ঠিকে কুলি ও দুয়ের ওপর ছিল একটু সদয়—কেননা এদের যে কাউকেই হুট বলতে তাড়ানো চলে—অতটা সোজায় তো পাকা চাকরেদের ভাগানো চলে না।

কিন্তু জোঁকের যেমন নুন, ওলের যেমন তেঁতুল, অ্যাসটন সায়েবের তেমনি জুটলো বুধো।

তা হলে গোড়া থেকে বলি শুনুন। অ্যাসটন ছিল ইদিকে যেমন মিলের ম্যানেজার উদিকে তেমনি মিন্‌সিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। এই ইদানীংই দেখছি যে ইদিশী বাবুরা চেয়ারম্যান হচ্ছেন। এখন আবার শুনছি কংগ্রেস কমিউনিস্ট কতরকম ঝঞ্ঝাট মিন্‌সিপ্যালটিতে। আমাদের সময় এসব হাঙ্গামা কিছুই ছিল না। ভোট হত বটে, তবে সে বাঙালী বাবুদের মধ্যে, পাড়া হিসেবে। বাবুদের মধ্যে আবার দল ছিল দুটো—'মুখুজ্যেদের দল' আর 'ভট্টচায্যিদের দল'। সে আপনার ভীষণ রেষারেষি ছিল। কাজের বেলায় যেমন তেমন কিন্তু বচনে সবাই ছিল সমান দড়। খিস্তি খেউড়, দলাদলি, মারামারির আর অন্ত ছিল না ঐ মিন্‌সিপ্যালটিকে নিয়ে। বাবুদের ভেতর থেকে হত ভাইস চেয়ারম্যান। যেবার মুখুজ্যের দলবল বেশি হত সেবার মুখুজ্যেরা কেউ ভাইস চেয়ারম্যান হতেন। আর যেবার ভট্টচায্যিদের দলবল বেশি হত সেবার

ভট্টচাযি্যরা। প্রায় পালা হিসেবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ব্যাপারটা—একবার এরা তো ফিরেবার ওরা।

আর সায়েবেরা সবসময় চেয়ারম্যান। সায়েবদের কিন্তু ভোট হত না। রাজার জাত তো, মিন্‌সিপ্যালটির ভোট নিয়ে এর বাড়ি ওর বাড়ি সাধাসাধি করছেন ভালো দেখায় না। তাই সরকারের ব্যবস্থা ছিল ছুটো মিলের পাঁচজন সায়েব থাকবে মিন্‌সিপ্যালটিতে সরকারের তরফ থেকে। এদের ভেতর থেকে সায়েবরাই একজনকে ঠিক করে দিতেন—তিনি হতেন চেয়ারম্যান। অ্যাসটন ছিলেন এমনি এক চেয়ারম্যান। কিন্তু সায়েব হলে কী হবে মানুষ তো বটে। সায়েবদের মধ্যেও দলাদলি ছিল। অ্যাসটন সায়েবের সঙ্গে রেষারেষি ছিল ম্যাকফারসন সায়েবের। ম্যাকফারসন মহাবীরপ্রসাদ মিলের বড়ো সায়েব। ম্যাকফারসনের বয়স ছিল জোয়ান। চেহারা ছিল রাজপুত্তুরের মতন আর খেলাধুলোয় ছিল পয়লা নম্বরের ওস্তাদ। অ্যাসটনের বাবুর্চি কাদের আলির কাছে শুনেছিলাম যে ম্যাকফারসনের নাচের পা নাকি এত সাধা পা ছিল যে সব সায়েবের বিবিরাই তার সঙ্গে নাচবার নামে হেদিয়ে মরত। আর কী গানের গলা ছিল ম্যাক সায়েবের—কাদের আলি বলত, শুনলে পিলে চমকে যাবে তোদের।

এই ম্যাকফারসনের সঙ্গেই আড়াআড়ি ছিল অ্যাসটনের। মুখুজ্যেদের সঙ্গে ভট্টচাযি্যদের আড়াআড়ি ছিল মিন্‌সিপ্যালটি নিয়ে। বাজে লোকেরা বলত ওখানকার টাকা কে কত মারবে তাই নিয়ে। আর এই ছুই সায়েবের আড়াআড়ির শেকড় ছিল অন্য জায়গায়। ভেতরের কথাটা হল এই—অ্যাসটন সায়েবের মেম আসলে অ্যাসটনের দ্বিতীয় পক্ষ। অ্যাসটন সায়েবের যেমন দানোয় পাওয়া মড়াখেগো চেহারা, অ্যাসটন সায়েবের দ্বিতীয় পক্ষের তেমন ডানাকাটা পরীর মতন সুরত। মেমেদের বয়স আমরা আঁচ করতে পারি না তবে এটা ঠিক অ্যাসটনের অর্ধেক বয়স তার। আড়াআড়ি এই মেমকে নিয়ে। 'মেম নাকি' কাদের আলি বলত 'অ্যাসটনের সঙ্গে নাচতে হলে এক পাকেই হাঁপিয়ে পড়ত, আর ম্যাকফারসনের সঙ্গে হলে রাত নিশুতি হয়ে যায় তবু ওদের আশ মেটে না।' কাদের আলির ধারণা ছিল যে সায়েবের যে নেমোবাই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এর জন্যে দায়ী মেমসায়েব। কথাটা নেহাত মিথ্যে নাও হতে পারে, অমন খুবসুরত মেয়ে, নতুন বয়স, ওর ঝোঁক ম্যাকফারসনের মতো ছোকরা সায়েবের ওপরই পড়বে এ তো জানা

কথাই। আর যদিস্যাৎ পড়েই তাহলে সোয়ামী যে সে তো আর বোকার মতন চুপচাপ বসে দেখে যেতে পারে না শুধু, রাগারাগি
মজলিসে, মিন্‌সিপ্যালটিতে, খানাপিনায় খেলার সব জায়গাতেই ম্যাকফারসন অ্যাসটন সায়েবকে ফাঁসাবার জন্যে উঠে পড়ে লাগল—কাদের আলি বলত অ্যাসটনের দ্বিতীয় পক্ষের উস্কানি ছিল এতে। কাজেই ম্যাকফারসনের সঙ্গে সায়েবের সব জায়গাতেই টক্কর লাগতে শুরু করল। ওদের সেই টিনিস খেলার মাঠে ম্যাকফারসন আর অ্যাসটন সায়েবের দ্বিতীয় পক্ষ একজোট হত আর অ্যাসটন খেলত এলিস সায়েবের মোটা মেমটাকে নিয়ে। হারিয়ে ভূত করে দিত ওদের ম্যাকফারসনেরা। মোটা মেম কুমড়ো গড়াগড়ি খেয়ে যেত—আর অ্যাসটন সায়েব যত রাগের ঝাল ঝাড়ত কুলিদের ছোঁড়াগুলোর ওপর—এই শুয়ার কি বাচ্চা, খেলা মিলা হায়, জলদি করো। তারা বল কুড়িয়ে আনার জন্যে মাঠের ঘেরাটোপের বাইরে খাবি খাওয়ার মতো হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটোছুটি করত। আমরা সব অনেকেই তখন তারের বেড়ার ফাঁক দিয়ে খেলা দেখতাম। খেলা ছাই বুঝতাম—দেখতাম অ্যাসটন সায়েবের নাকানি চোবানি। ভারী খুশি হতাম সবাই—ম্যাকফারসন সায়েবকে মনে করতাম আমাদের আপনার লোক—শুধু খাটো জামা পরা মেমসায়েবের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মেমসায়েব দরোয়ান পাঠিয়ে দিত—ভাগা দেও সবকোইকো।
কাদের আলি বলত—অ্যাসটন সায়েব রাতের বেলা কোয়ার্টারে গিয়ে মদ গিলে কাঁদতে বসত—কী সব বলত—মেমসায়েব ভুরু কুঁচকে চোখ দুটোকে পাথরপানা করে তাকিয়ে থাকত—আর মাঝে মাঝে শুধু দু-একটা কথা বলত—কিন্তু সে কথা আর যাই হোক সোহাগের কথা নয়।
লাগবি লাগ ম্যাকফারসনের সঙ্গে মিন্‌সিপ্যালটিতে বেধে গেল অ্যাসটন সায়েবের একহাত। আর তারি মূলে ছিল আমাদের বুধো। সেবার নিয়ে অ্যাসটন সায়েবের দশ বছর চেয়ারম্যানী—ভরা ভর্তি দশ বছর, তাই মিন্‌সিপ্যালটিকে দিয়ে একটা রাস্তায় নিজের নাম লিখিয়ে নিল সায়েব—ঐ হল অ্যাসটন রোড। লোক মুখে শুনেছি ম্যাকফারসন নাকি ব্যাপারটা খুব সুনজরে দেখেনি। ফলে কেলে (ক্লে) সায়েবের সঙ্গে তার দু-বাত হয়ে গেল মিন্‌সিপ্যালটির মিটিনে—কেলে সায়েব ছিল অ্যাসটন সায়েবের দলে। যাক ও পর্ব তো কোনো রকমে চুকল। দু-নম্বর পর্ব—অ্যাসটন

সায়েবের ইসট্যাচু মিন্‌সিপ্যালটির দালানে বসানো হবে। ইসট্যাচু কী? না পুতুল। তা নিয়ে আবার একপ্রস্থ। ম্যাকফারসন বাঘের মতো চেঁচাল মিটিনে। ইসট্যাচু কেন? না, দশ বছর ধরে মিন্‌সিপ্যালটির সেবা করেছেন সায়েব, তার জন্যে রাতের ঘুম দিনের বিরাম বন্ধ রেখেছিলেন সেই সায়েবের কথা সায়েব দেশে গেলে যদি নবগঞ্জের লোক ভুলে যায় তাই ইসট্যাচু—মিছে কথা, ও সায়েবের কথা কেউ ভুলতো না কখনো। ম্যাকফারসন বললে, তা ইসট্যাচু কেন? সবার বেলায় যেমন ছবি টাঙানো আছে দেয়ালে অ্যাসটনেরও তাই থাকবে। আছে তো মেলাই সায়েবের ছবি, হিল সায়েব, পেগি সায়েব, ওয়াটসন সায়েব—অ্যাসটনেরও তাই থাক। অবশ্যি বুঝতেই পারছেন যে ম্যাকফারসনের মতলব অ্যাসটনের দ্বিতীয় পক্ষের কাছে অ্যাসটনকে খেলো করা—তা সেবার ভট্টচায্যিদের দল মিটিনে জোরালো তারা অ্যাসটনকেই মদৎ দিল। ইসট্যাচু বসল। ইদিক দিয়ে সময়টা ভালোই যাচ্ছিল অ্যাসটনের—কিন্তু মুশ্‌কিল করল বুধো।

মতিচাঁদ বলে চলল, লোকে যাই বলুক বুধো কিন্তু আসল নাটের গুরু নয়—সে হল সতু বোস। সতু বোস মিন্‌সিপ্যালটির কে? কেউ না। তিনি তখন আপনাদের মতন এক চ্যাংড়া ছোঁড়া, সবে কলেজ থেকে বেরিয়েছেন। কলেজ থেকে বেরুলেই যা হয় সতুবাবুর মাথায় তখন নিত্য নতুন মতলব। এই আজ কুলি-খালাসীদের ছেলেদের জন্য ইস্কুল খোলো, কাল কোথায় বন্যে হয়েছে দাও চাঁদা, পরশু কার মা মরেছে শ্রাদ্ধ করিয়ে দাও, এই সব নানান হুজ্জুতে সতুবাবু তখন ছটফটিয়ে বেড়াচ্ছেন কিন্তু সেবার গরমের সময় মামার বাড়ি থেকে ঘুরে এসে সব থেকে বঢ়িয়া খেলা আরম্ভ করলেন সতুবাবু। একদিন ইস্টিশনের ছামুতে দেখি খুব ভিড়, গাড়োয়ান, পানওয়ালা, বিড়িওয়ালা, ইস্কুলের ছেলে সব ভিড় করে শুনছে, আমিও গিয়ে জমলাম। দেখি সতুবাবু হাঁসিয়া চটের মতো মোটা জামা গায়ে, সেরকমই একটা খাটো ধুতি, খালি পা আর কদমছাঁট চুল। সতুবাবু গান্ধী মহারাজের কথা শোনাচ্ছেন সবাইকে। খানিক কি সব ভালো ভালো কথা বললেন—যার মোদ্দা কথা হল সায়েবদের তাড়াতে হবে—তারপর পকেট থেকে খানিকটা পাঁজ আর একটা তকলি বার করলেন। ইস্টিশনের ছামুতে পাথুরে জমিতে বাঁই বাঁই করে সতুবাবু তকলি ঘোরাতে লাগলেন—সে এক তামাশা মন্দ নয়। সকলে ভিড় করে ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল লম্বা খানিকটা সুতো বেরিয়েছে—সুতোটা ধরে উনি

বললেন—দেখুন সব, এখানে এক এক পাক তকলি ঘুরছে আর বিলেতে সায়েবদের কাপড়ের কলের এক একটা মাকু পট পট করে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। 'হাঁ', 'অ্যায়সা', 'তাজ্জব কি বাত', 'বলে কীরে', বলে সবাই ঠেলাঠেলি করে দেখতে লাগল। বিলেতে মাকু বন্ধ হচ্ছে কিনা দেখা গেল না, তবে সতুবাবুর তকলি ঘুরছে দেখা গেল। সতুবাবু বললেন—আপনারা সব কংগ্রেসে নাম লেখান। ভালো কথা। কিন্তু আর সবাই যেমন তেমন, বুধোর মাথায় সেই যে সেঁধুলো কংগ্রেস সে একেবারে পেরেক পুঁতে বসে গেল। বুধো ছিল মিন্‌সিপ্যালটির পিওন। জামতলির পুবে তুলেপাড়ায় থাকত। সাজোয়ান চেহারা, তামাটে রং, কুলোর মতো হাতের পাঞ্জা। গরমকালে গঙ্গা এপার ওপার হওয়া তার খেলা। বুধো মিন্‌সিপ্যালটিতে চাকরি করত। চিঠিপত্তর এখান থেকে ওখানে নিয়ে গেল, মেম্বারদের বাড়ি বাড়ি মিটিনের খাতা সই করালো, আবার ঢেঁড়াদার সঙ্গে করে নবগঞ্জের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরলো—বাকি টেক্‌সো অমুক তারিখের মধ্যে না দিলে অস্থাবর কোড়ক হবে—ডুম ডুম ডুম। এই হল বুধো। তিনকুলে কেউ নেই। থাকবার মধ্যে আপনি আর কোপনি। মিন্‌সি-প্যালটির কেরানীবাবুরা ফাইফরমাস খাটাত, অ্যাসটন গাল দিত আর মেম্বর বাবুরা দাঁত খিঁচোত কারণে অকারণে। মাস গেলে মাইনেটাই যা ঠিক পেত। তা হলেও বুধোর দিন বেশ সুখেই কাটছিল। এই বুধোর মাথায় সাঁধ করালো গান্ধী মহারাজের মন্তর আপনাদের সতু বোস।

কেন জানি না সেবার রাজার জন্মদিনে খুব ঘটা হবে ঠিক হল। অ্যাসটন সায়েব, ম্যাকফারসন সায়েব, কেলে সায়েব সবাই এ ব্যাপারে একজোট হলেন। ভট্‌চাষ্যি আর মুখুজ্যেদের দলাদলিও থেমে গেল তখনকার মতো। খয়ের খাঁ তো সবাই। দু-দলই তখন অ্যাসটনের মন যোগাবার জন্যে হুড়োহুড়ি শুরু করে দিল। ঠিক হল জেলা থেকে ম্যাজেস্টর আসবে। তিনি লেকচর দেবেন। শহরের সব তা-বড় তা-বড় গণ্যিমান্যিরা আসবেন। কাগজের শিকলি বানানো হল। কলাগাছ কেটে ডাঁই করা হল গেট হবে—আর নবগঞ্জের যত দেবদারু গাছ ছিল সব ন্যাড়া করে ফেলল বাবুরা। ঐ যে দেখেন মেজ মুখুজ্যে এখন কংগ্রেসের খুব বড়ো পাণ্ডা, উনি একেবারে মাটি চষে ফেলতে লাগলেন হাকিম সায়েবের গলায় মালাখানাকে মোটা করার জন্যে। হাকিম আসবেন, তানার পরিবার আসবেন। মিলের

জনা দশেক সায়েব তাঁদের মেমদের নিয়ে থাকবেন। ইস্কুলের হেড মাস্টার ইস্কুলের ছেলেদের নিয়ে ইংরেজি গান গাইবেন—ওঁর আবার সে সময় কিছু টাকার দরকার ইস্কুলটার জন্যে। অ্যাসটন কথা দিয়েছেন হাকিমকে বলে দেবেন। মিন্‌সিপ্যালটির সামনে ক-ঘর মেথর থাকত তাদের ক-দিনের জন্য উঠিয়ে দেওয়া হল · আর হাকিম সায়েবের গলায় মালা পরানো হবে তাই মেজ মুখুজ্যের ছোট্ট ফুটফুটে মেয়েকে মানায় এমন সাটিনের জামার জন্যে কলকাতায় চলে গেল মিন্‌সিপ্যালটির এক কেরানীবাবু। বুধোর ওপর তখন ঘড়ি ঘড়ি হুকুম চলছে। এটা কর, ওটা আন। ছুটু ভট্‌চাযকে চিঠি দিয়ে আয়। নিশান ওড়ানোর জন্যে দড়ি ঠিক করেছিস? ঐ চলছে রাতদিন। মিন্‌সিপ্যালটি সরগরম। অ্যাসটন সায়েবের নাওয়া-খাওয়ার ফুরসত নেই। দিনের দিন মিন্‌সিপ্যালটির রূপ যা খুলল সে আর কথায় কাজ নেই।

সেদিন আমরাও সব জমা হয়েছি তামাশা দেখবার জন্যে। অ্যাসটন সায়েবের দ্বিতীয় পক্ষ সেদিন খুব বাহার করে সেজে এসেছে—সবার থেকে আগে চোখে পড়েছিল তার চেহারা। ম্যাকফারসন সায়েবের পাশের চেয়ারে তিনি বসলেন। অ্যাসটন সায়েব সেদিকে একবার ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে বললেন—আপলোক সব চুপসে বসুন, হাকিম সায়েব তুরন্ত আসিয়ে পড়বেন। সবাই হাততালি দিল, আমরাও দিলাম। হাকিম সায়েব এলেন, মাচায় উঠে দাঁড়ালেন, তানার মেম দাঁড়ালেন—ফের সবাই হাততালি দিল। আমি খৈনি টিপছিলাম—এবারটা ফসকে গেল। মেজ মুখুজ্যের ছোট্ট মেয়েটা হাকিম আর হাকিম গিন্নীকে মালা পরালো, হাকিম একটু মেয়েটাকে আদর করল—আবার হাততালি। অ্যাসটন সায়েব বললেন, সায়েব এবার নিশেন তুলবেন। সবাই আবার হাততালি দিয়ে উঠে দাঁড়াল। হেড মাস্টার তাঁর ছাত্তরদের নিয়ে তৈরি হলেন। ইংরেজি গানখানা ছাড়বেন—এইবার হারমোনিয়ম ভ্যাঁ করে উঠল। আমরা সব পায়ে ডিঙি মেরে উঠে দেখছি কী হয়। হাকিম সায়েব দড়ি টানলেন। ওমা ও আবার কি—দড়ি ফস করে খুলে এল কেন? ব্যাপার কী দেখবার জন্যে ওনারা সবাই নেমে এলেন মাচা থেকে, সামিয়ানার বাইরে এসে দাঁড়ালেন। সবাই ঘাড় উঁচু করে তাকাল যেখানে ফি বারেই নিশেন তোলা হয় সেখানে কী ব্যাপারটা দেখবার জন্যে। বুধো নেমে আসছে সেখান থেকে—আর তাজ্জব ব্যাপার, সেখানে একটা নিশেন উড়ছে। পত পত করে উড়ছে ভোরের হাওয়া পেয়ে অষ্টঅঙ্গ মেলে দিয়ে। বলব কী সবায়ের চোখ ছানাবড়া

হয়ে উঠেছে তখন—সর্বনাশ সে নিশেন গান্ধী মহারাজের নিশেন। সতু বোস যে সবার পিছনে দাঁড়িয়েছিলেন কেউ দেখেনি। তিনি বলে উঠলেন—বন্দেমাতরম্। অর্ধেক ভিড় ফুঁড়ে মায় আমাদের গলা চিরে আওয়াজ বেরিয়ে গেল—বন্দেমাতরম্।

হৈ হৈ হুলুস্থুল গোলমাল বেধে গেল। আমাদের ঘোড়াগুলোর মতো মেমগুলো চিঁহি চিঁহি করে উঠল। হাকিম বাঘের মতো গলায় ডাকলেন দারোগাকে। দারোগা খিঁচিয়ে উঠলেন জমাদারকে—আবার জমাদার তাড়া করল সিপাই-দের। তক্ষুনি চারিদিকে সোরগোল পড়ে গেল। সেপাইরা ভিড় হটাতে লাগল—আর ভদ্দরলোকেরা সেই হুজ্জতের ফাঁকে হাকিমের সঙ্গে দু-কথা কয়ে নেবার জন্যে ঠেলাঠেলি শুরু করে দিল। তানাদের ছোট ছোট ছেলেরা মিটিন শেষ হয়ে গেছে মনে করে কাগজের শিকলি ছিঁড়তে লাগল। দেখতে দেখতে মিন্‌সিপ্যালটির ঘেরা জায়গার বাইরে নবগঞ্জের যত লোক এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। নবগঞ্জের মিন্‌সিপ্যালটিতে সায়েবদের নিশেন নয় গান্ধী মহারাজের নিশেন উড়ছে। নবগঞ্জ বাবাব জন্মে কখনও এ ব্যাপার দেখেনি।

অ্যাসটন সায়েব সাদা হয়ে গেছেন। ম্যাকফারসন লাল। আর হাকিম সায়েব কপালের ঘাম মুছতে লাগলেন। বড়োবাবু নন্দ মিত্তির ছুটে গিয়ে কী যেন বললে অ্যাসটন সায়েবকে, সায়েব হাঁকলেন—বুধো! সঙ্গে সঙ্গে মেম্বারবাবুরা হাঁকলেন—বুধো! বুধো এসে দাঁড়াল। 'হারামজাদ, তোম কিয়া হ্যায় এহি কাম'—কিন্তু তখন আর বচসার সময় নেই, সায়েব বললেন—'যাও কাপড়াটো উতার দাও হুঁয়াসে, জলদি করো।' সে যা উঁচু বুধো ছাড়া কেউ উঠতেও পারে না। কিন্তু বুধো কেন মরতে যাবে নিশেন নামাতে, সেই তো মিটিন নিয়ে সবাই যখন ব্যস্ত ওটিকে ওখানে তুলেছে, কেটে রেখেছে সায়েবদের নিশেনের দড়ি। সামিয়ানার বাইরে যারা ছিল বুধোকে দেখেছেও সবাই, কিন্তু বুধো কাদের নিশেন তুলছে এ নিয়ে কে আর মাথা ঘামাচ্ছে বলুন। আর ঘামালেও ভদ্দরলোকেরা সবাই সামিয়ানার মধ্যে, আমাদের মতো থাটকেলাস লোকেরাই বাইরে, আমাদের কথা কানেই বা নেবে কে?

বুধো বললে—নেহি শেকেগা হাম। পাঁচটা বাঘা সায়েব আর তিরিশটা বাঙালী বাবু বুধোকে পারে তো মাথায় নুন ছড়িয়েই চাট্ করে ফেলে। কিন্তু বুধো ডোণ্ট কেয়ার। নেহি শেকেগা। হাকিম জেলের ভয় দেখালেন

তারপর বকশিশের লোভ দেখালেন। ডাকাবুকোর মতো দাঁড়িয়ে রইল বুধো। সওয়াল জবাব করতে লাগল ওনাদের সঙ্গে। সতু বোস দূর থেকে বুধোর কিত্তি দেখছেন আর ফিক্‌ফিক করে হাসছেন আর মাঝে মাঝে রুমাল দিয়ে চোখ পুঁচছেন। খুশি আর ধরে না চেলার কেরামতি দেখে।

তখুনি মিনসিপ্যাল্‌টির হলঘরে বুধোকে নিয়ে যাওয়া হল। বুড়ো গাড়োয়ানের মতো অ্যাসটন গরজাতে লাগল আর গোঁয়ার মোষের মতো শিং বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল বুধো। যা যা ইংরেজি গালাগাল সায়েব জানতেন, যা যা চটকলিয়া খিস্তি সায়েব রপ্ত করেছিলেন সব একে একে ঝেড়ে দিলেন বুধোর ওপর। বুধো ইদানীং সতুবাবুর সঙ্গে মেশার পর থেকেই কেমন যেন ঠাণ্ডা মেরে গিয়েছিল। যে বুধোকে আগে শালা বললে সে শালার ব্যাটা ফিরিয়ে দিত, সে বুধো এখন গান্ধী মহারাজের শিষ্য হয়ে একেবারে পান্‌তা ভাতের মতো মিইয়েছিল। গালাগাল খেতে খেতে বুধো ভেতরে ভেতরে যত গরম হচ্ছে বাইরে ততই চেষ্টা করছে সতুবাবুর কথামতো ঠাণ্ডাঠুণ্ডি থাকতে। না, মেজাজ চড়ানো চলবে না, গান্ধীজীর মানা। কিন্তু যতই গান্ধী মহারাজের শিষ্য হোক না কেন, বুধো তো আমাদের সেই বুধোই, না কি বলুন? সায়েব যেই একটু বেতরো গোছের বেছুট কথা বলে ফেলেছে জন্ম তুলে—বুধো বেঁকে উঠলো বাঘের মতো—মুখ সামলে কথা বোলো সায়েব, বলেই একটা কাগজে লাইনকাটা রুলকাঠ পড়েছিল সেইখানা হাতে তুলে নিয়েছে। কে শোনে, অ্যাসটন ঝোঁকের মাথায় বলেই চলেছে, বলেই চলেছে। সামাল বলে চিল্লে উঠে বুধো সেই আখাম্বা রুলের বাড়ি এক ঘা হাঁকিয়ে দিল চো চাপটে।

গলাটা নামিয়ে মতিচাঁদ জিজ্ঞাসা করল, কোথায় বলুন দিকিনি?—না, য ভাবছেন তা নয়, অ্যাসটন সায়েবের মাথায় নয়। সেই যে অ্যাসটন সায়েবের ইস্‌ট্যাচু ছিল হলঘরের কোণে সেই ইস্‌ট্যাচুর নাকে। নাক উড়ে গিয়ে ইস্‌ট্যাচু বোঁচা হয়ে গেল। অ্যাসটন নাকে হাত দিয়ে দেখে নিল ইস্‌ট্যাচুর নাক যায় যাক্ নিজের নাক ঠিক আছে কিনা। বুধো তারপর রুলখানাকে ফেলে দিল, দিয়ে গট গট করে বেরিয়ে এল যেখানে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম সেখানে। সতু বোস জড়িয়ে ধরলেন বুধোকে। ধরেই ছেড়ে দিলেন, হাঁব ছাড়লেন, বুধো।

কী?

তুই মদ গিলেছিস সকালবেলায়, গান্ধীজী না বলে দিয়েছেন—
রাখুন। কার এমন বুকের পাটা আছে মশাই যে এক ঢোঁক না গিলে নিয়ে অ্যাসটনকে ডিঙিয়ে হাকিমকে কলা দেখিয়ে নিশেন উড়ুতে উঠবে? যে কাজের যে ধম্মো। ও দু-এক ঢোঁক খেতেই হয়। গঙ্গা পেরুনোর সময়ও আমি একটু গিলে নিই।
মিন্‌সিপ্যালটিতে জাঁকিয়ে মিটিন হল। ম্যাকফারসন এক ঘণ্টা ধরে লেকচার ঝাড়লে—সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিলে কত্তাদের কাঁধে। ভটচায্যির ভূষণবাবু আবার রায়বাহাদুর ছিলেন—হাকিমের কাছে আমাদের সবায়ের মুখ পুড়েছে বলে তিনিও এক লেক্‌চার ঝাড়লেন। অ্যাসটন সায়েব নিজে থেকে সব জিনিস কেন তত্ত্বতালাস করেননি আর বুধোর মতো তঁ্যাদোড়কে কেন নিশেনের জিম্মা দেওয়া হয়েছিল এই নিয়ে হাজার কৈফিয়তের মোকাবিলা করতে হল অ্যাসটনকে। ভূষণবাবুর সেবার ভাইস-চেয়ারম্যানী ঘুচে গিয়েছিল—চঁ্যাচামেচি করে দেখছিলেন যদি জল ঘোলা করে দিলে তাঁর খানিক স্থবিধে হয়। অ্যাসটন সায়েব কোনো কথারই ঠিক জবাব করতে পারলেন না। একথা তিনি বলতে পারলেন না, বুধো আমার লোক নয়। কেননা মিন্‌সিপ্যালটিকেও তিনি চটকলের কায়দাতেই চালাতেন। সমস্ত লোক নিজে দেখে, যাচাই করে, বাজিয়ে তবে তিনি রাখতেন। কী করে আর জানবেন বলুন যে নিজের সর্ষের মধ্যেই ভূত ঢুকে থাকবে।
গলাটা কেশে একটু পরিষ্কার করে নিয়ে মতিচাঁদ বলল—সেই যে অ্যাসটনের সময় খারাপ পড়ল আর তা ফিরল না। কাদের আলির কাছে শুনেছি যে সায়েবদের কেলাবে মদের আড্ডায় সব জায়গায় তখন অ্যাসটনের খোঁটা খেতে খেতে জান বেরিয়ে যাবার জোগাড়। অ্যাসটন কেন বুধোকে নজরে নজরে রাখেনি, অ্যাসটন কেন বুধোর মতো লোককে মিন্‌সিপ্যালটিতে রেখেছে। খোঁটায় খোঁটায় অ্যাসটনের নাকের পোঁটা বেরিয়ে যাচ্ছে তখন। ম্যাকফারসন সায়েব তো আদাজল খেয়ে লাগল অ্যাসটনের পেছনে। সে বছর সায়েবদের কেলাবে পিসিডেনগিরি আর অ্যাসটনের কপালে জুটল না। ম্যাকফারসন হল পিসিডেন।
ম্যাকফারসনকে দেখলেই সায়েব তখন তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে। আর জ্বলবে নাই বা কেন বলুন। অ্যাসটনকে যেন বেঁধে মার দিচ্ছে তখন ম্যাকফারসন সায়েব। কেলাবের মোড়লি গেল, মিন্‌সিপ্যালটিতে হাকিমের সামনে মুখে

চুনকালি পড়ল—তা ঘরে এসে মানুষ একটু শান্তি পাবে তো—সেখানেও ম্যাকফারসন। মেম কাঁপ-ছটকানো ঘুড়ির মতন অ্যাসটন সায়েবের লাটাই ছাড়িয়ে ম্যাকফারসনের দিকেই তখন গোঁৎ খাচ্ছে। বোকার মতো সায়েব ঘুড়ি গুটোতে চাচ্ছে—কিন্তু ও ঘুড়ি আর গুটোনো চলে না।

নাচের মজলিসে দেখা যেত অ্যাসটনের দ্বিতীয় পক্ষ—ম্যাকফারসন সায়েবের সঙ্গে আরো ঢলেছে। মেম ছুঁড়ী যত আস্কারা দেয় ম্যাক সায়েবকে ম্যাক সায়েবের মনে যেন তত জোয়ার লাগে—আর সে জোয়ারের ঢেউ ততই যেন এসে লাগে অ্যাসটনের ভিত-ধসা পাড়ে। অ্যাসটন সায়েব কুঠিতে নেই একদিন, কাদের আলি খবর পেল ম্যাকফারসন কুঠিতে এসেছে। বাগানময় ঘুরে ঘুরে কথা বলছে মেমের সঙ্গে। বাবুর্চিখানার পেছনে বাগানের ঝোপের আড়ালে ম্যাকফারসন সায়েবের বুকে মাথা রেখে অ্যাসটনের দ্বিতীয় পক্ষ সেদিন অনেকক্ষণ কেঁদেছিল। কাদের আলি সাক্ষী। বাগানের নিচেয় গঙ্গার জলের দিকে তাকিয়ে তখন ম্যাকফারসন হয়ে গিয়েছিল বোবা। অ্যাসটন কুঠিতে ফিরে এসে রোজই জিজ্ঞাসা করত নোকরদের—কেউ এসেছিল কিনা। সেদিনও করল। নোকররা সব মেমের দিকে,—বলত—না, কোই নেহি আয়া।

মিন্‌সিপ্যালটির মিটিনে ম্যাকফারসনের সঙ্গে অ্যাসটনের আবার একচোট হয়ে গেল। অ্যাসটন বলল—নাক ভাঙা ইস্‌ট্যাচুটা সারাতে হবে। ম্যাকফারসন বলল—মিন্‌সিপ্যালটির টাকা খোলামখুচি নয়। ও যেমন আছে তেমনিই থাকবে। তবে ওটা উঠিয়ে ফেলা হোক—অ্যাসটন বলল। ম্যাকফারসন বলল, সে দেখা যাবে এখন। ইতিমধ্যে ভাইস-চেয়ারম্যান বদল হয়ে গিয়েছিল। দু-নম্বর ওয়ার্ডের তাহেরুদ্দিন সায়েব মারা গেলেন। তিনি ছিলেন ভট্টচায্যিদের দলে। তাঁর জায়গায় জিতে এলেন মুখুজ্যেদের গনি মিয়া। ভাইস-চেয়ারম্যান পালটে গেল—কাজেই অ্যাসটনের কেরামতিও আর খাটল না। সেই নাকভাঙা ইসট্যাচুই পড়ে রইল সেখানে তখনকারমতো।

ফল হল এই কারণে অকারণে হুট বলতেই ছেলে ছোকরা, চ্যাংড়া, ফক্কড় কাজ নেই কম্ম নেই মিন্‌সিপ্যালটিতে ঢোকে—অ্যাসটনের বোঁচা পুতুলটা দেখে আসি চল্। চাকরি চলে যাওয়ার পর বুধো একদিন কোথা থেকে একটা ঢোল জোগাড় করে নবগঞ্জের বাজারে ঢেঁড়া পিটিয়ে দিল—আজ থেকে অ্যাসটন সায়েবের নাম হল নাককাটা সায়েব। ডুম্ ডুম্ ডুম্। শুনে রাস্তা সুদ্ধু লোক হেসে গড়াগড়ি—মুখে মুখে রটিয়ে দিল সবাই সারা নবগঞ্জে অ্যাসটন সায়েবের

নতুন নাম। ভারী পছন্দ হয়ে গেল নামটা—সবাই বকুলবালার ভাশুর বলত ধীরুবাবুকে—এ যেন তার চেয়েও যুতসই নাম।
ইস্কুলে গেছে সায়েব পেরাইজ দিতে—ছোট ছেলেরা নাকে হাত দিয়ে ফিস্ ফিস্ করে উঠল—নাককাটা নায়েব। সায়েবের পেছু ফেরার ওয়াস্তা শুধু—চ্যাংড়া ছেলেগুলো তারপরেই চেঁচাবে—

সায়েব নাককাটা
বুদ্ধি আককাটা

হেঁটে বেড়ানো সায়েব ছেড়ে দিল। রইলো শুধু মিল আর মিন্সিপ্যালটি। তাও সেখানেও বসে আছে সেই পুতুল—নাকটা বোঁচা করে অ্যাসটন সায়েবকে ভেংচিয়ে।

তবে তা বললে তো পুলিস শুনবে না। পুলিস পুলিসের কাজ যা তাই করল। বুধোকে ধরে নিয়ে গেল। সে মিন্সিপ্যালটির জিনিসপত্র তছরূপ করেছে, ভাঙচুর করেছে, হাকিম সায়েবের সামনে অ্যাসটন সায়েবকে খুন করতে গিয়েছিল। একদিন ভোরবেলা বুধো যখন দাঁতন করতে করতে ঘাটে যাচ্ছে চান করবে বলে, থানার জমাদার ছোটবাবু আর দুটো সেপাই এসে বুধোকে নিয়ে গেল—খানিক বাদে চালান করে দিল মহকুমায়। লোকে অবশ্য বলে যে তার আগে অ্যাসটন সায়েবের সঙ্গে বড়োবাবুর একটা গুজুগুজু ফুসফুস কী সব হয়েছিল। মিলের ঠিকেদার বাঁড়ুজ্যে বাড়ির বড়ো ছেলে ধীরুবাবু আর হাজরেবাবু কাটিকেষ্ট মিত্তির অ্যাসটনের বৈঠকখানার সেই সলা-পরামর্শের আড্ডায় হাজির ছিলেন—কাদের আলি দেখেছে। কাদের আলি বলে, অ্যাসটন সায়েব যত না চটছেন বুধোর নাম করে কাটিকেষ্টবাবু তার ত্যাড়াবাঁকা মুখখানা নিয়ে তার ডবল, আর ধীরুবাবু একমুখ পান নিয়ে তু-ডবল। কেননা অ্যাসটনের মন জোগাতে হবে না? অ্যাসটন যদি বলে জেলে দাও বুধোকে তো ধীরুবাবু বলে ফাঁসি দাও, কাটিকেষ্ট বলে—উঁহু শূলে দাও। আর দারোগা সায়েব চুপ করে সব শুনে বললেন—ঠিক আছে আমি দেখছি। ওদের দেখা মানে জানেন তো সেইবারের দেখা। বুধোকে যেতে হল দমদমার লাল দালানের ভাত খাওয়ার জন্যে। বুধোর ওস্তাদ সতু বোস তখন কলকাতায় —গান্ধী মহারাজের কি এক মিটিন হচ্ছে, সেখানে গেছেন ভল্যানটিয়ার বাবু হয়ে। কাজেই বুধো একটা ভালোমতো উকিলও দিতে পারল না, ওর

সাজা হয়ে গেল। সতুবাবু কিছুকালের জন্যে চেলা হারিয়ে রইলেন একা না ভ্যাকা।

নবগঞ্জের ভদ্দরলোকেরা এতে খুশি হয়েছেন কিনা বোঝা গেল না। কেননা ভদ্দরলোকদের সব নেকাপড়া করা মতিগতি তো বাইরে থেকে ঠাওর করা মুশ্‌কিল। ধরুন না কেন নেপাল রায়ের ব্যাপারটা। তুলালচাঁদের গলায় দড়ি দেওয়ার পর নেপাল রায়কে গাল দেয়নি এমন ভদ্দরলোক নবগঞ্জে খুব কম। কিন্তু সে ঘরের মধ্যে, জোর বৈঠকখানায়—বাইরের রাস্তায়, বাজারে নেপালবাবুকে দেখে গরুড় পাখির মতো হাত জোড় করে সবাই বলবে, হেঁ হেঁ নেপালবাবু, খবর সব ভালো তো? যে ফড়েরা বকুলবালার পক্ষে সাক্ষী ছিল তারা ধীরুবাবুকে দেখলেই মুখ ভ্যাংচায়—কিন্তু যে ভদ্দরলোকেরা ধীরুবাবুকে দেখলেই নমস্কার করেন, জানবেন তারাই আড়ালে ধীরুবাবুকে বলে—বেবুশ্যের সম্পত্তি মেরে বড়োলোক। কাজেই ও কিছু বোঝা গেল না বুধোর ব্যাপারে কে কতটা খুশি, কে কতটা অখুশি।

বোঝা গেল বটে বিন্দির গলিতে। তখন চড়ক এসে পড়েছে। নবগঞ্জ-জামতলির রাস্তা তখনো কাঁচা রাস্তা। এক হাঁটু করে ধুলো চত্তির মাসের রোদে তেতে উঠল তপ্ত খোলার বালির মতন আর বিন্দির গলির ছেলেগুলোর মেজাজ বুধোর ব্যাপারে চড়তে লাগল হু-হু করে। চত্তির মাসে ধুলো বিকেল বেলায় উথল পাথল হাওয়ায় ঘুরপাক খেয়ে আকাশে ওঠে আর চত্তিরের শেষে বিন্দির গলির ছেলেদের বুকে মাতন লাগে—চড়ক এসে পড়েছে।

চড়ক এসে পড়েছে। চড়কের সঙ বেরুবে, বিন্দির গলির ছেলেরা সাজবে সঙ। পাটের ফেঁসো জোগাড় করে দিয়েছে চটকলিয়ার দল, রঙ জোগাড় করা হয়েছে। পুরনো জামা, কাপড়, প্যাণ্টুল লোকের বাড়ি বাড়ি চেয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। জোগাড় করা হয়েছে খড়ির গুঁড়ো আর ইঁটের গুঁড়ো। আর লালমোহন বাঁধছে ছড়া। লালমোহন ল্যাকপেকে শরীর, মেয়ে-মেয়ে মুখ, যাকে বিন্দির গলির মেয়েরা বলত দেখনহাসিবাবু সেই লালমোহন ছিল ছড়াদার। লালমোহন যে ছড়া বাঁধল সে ছড়া প্রথম শোনাল তার মনের মানুষ বিনিকে। বিনি বলল ক্ষেন্তিকে, ক্ষেন্তি পাখিকে—রটে গেল সারা গলিময় এবার সঙ বেরুবে অ্যাসটন সায়েবের—ছড়া বেঁধেছে লালমোহন অ্যাসটনকে নিয়ে।

খুব ফুর্তি সবায়ের মনে। সেবার ধীরুবাবু আর বকুলবালাকে নিয়ে যখন সঙ বেরিয়েছিল তখন এই রকম সাড়া পড়ে গিয়েছিল নবগঞ্জে। ভদ্দরলোকেরা পাড়ায়

সঙের দলকে প্রচুর বখশিশ দিয়েছিলেন—মেয়েরা পর্যন্ত জানলার ফাঁক দিয়ে সঙ দেখেছিল। শুধু নেপাল রায়কে নিয়ে বিন্দির গলি কোনো সঙ বার করেনি।
চড়কের দিন বিকেলবেলায় অ্যাসটন সায়েব মিনসিপ্যালটির বারান্দায় দাঁড়িয়ে পাইপ খাচ্ছেন আর তাকিয়ে তাকিয়ে কী যেন ভাবছেন। উদিকে জামতলিতে তখন গাজুনে সন্নেসীদের চড়্কে পাক শুরু হয়েছে, চড়ক কাঠ ঘুরছে, কাঁটা ঝাঁপ, বঁটিঝাঁপ সব পুরোদমে চলছে। মিনসিপ্যালটির সামনের রাস্তায় মোড়ের ওধার থেকে এধার পর্যন্ত লোক দাঁড়িয়ে গেছে—সঙের কেত্তন দেখবে বলে—সঙের কেত্তন দেখে সবাই যাবে জামতলির চড়কের মেলায়। খোল, কত্তাল বাজিয়ে, ঢাক কাঁসি ক্যানকেনিয়ে, শিস দিতে দিতে তুমুল হুল্লোড় আর হৈ হৈ ছড়িয়ে সঙের দল এসে পড়ল। সঙ সেজেছে মুকুন্দ। মোড়ের ওধারে সঙের দল একটু দাঁড়িয়ে নেচে নেচে কেরামতি দেখাতে লাগল; নাচের চোটে ধুলো উড়ে গেল বড়ো রাস্তায়—ক্যানেস্তারা ফুলুট ডুগডুগি ঝুমঝুমি কিছু আর বাদ নেই। লালমোহন গাইছে আর দুটো ছোঁড়া দোয়ারকি করছে। দু-ধারী রাস্তার লোক ক্যাবাত ক্যাবাত, বলিহারি যাই ভাই বলছে। লালমোহন ঘুরে ঘুরে গাইছে। আজ সে নবগঞ্জের রাস্তায় অ্যাসটন সায়েবের নামে তাদের মনের সব বিষটুকু ঢেলে দেবে, নবগঞ্জের সমস্ত হক কথার, সমস্ত ইমানের জিম্মাদার আজ লালমোহনরা। বুধো নেই তো কী হয়েছে, লালমোহন তো আছে। আজ সে সঙ সাজিয়ে দেবে নবগঞ্জের ভদ্দরলোকদের কুলদেবতাকে। লালমোহন চিলের মতন গলায় রাস্তা ফাটিয়ে গাইতে গাইতে চলে এল—মোড় পেরিয়ে মিনসি-প্যালটির সামনে—

> দরবারে সে মুখ পায় না ঘরে এসে বউ ঠ্যাঙায়
> সায়েব এসে উল্টে দিল এই কথাটি হায়রে হায়
> মেমের কাছে মুখ মেলে না নগরবাসীর পরাণ যায়
> এ ঘোর কলি কাকে বলি নগরবাসী শুনুন হায়।

এদিকে অ্যাসটনের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেছে মুকুন্দ, পেছনে সঙের মিছিলের মেলা। পরনে প্যাণ্টুল, পায়ে ঢোল্লা ঢোল্লা জুতো, গলায় অ্যাসটন সায়েবের মতো লাল রুমাল, মাথায় সোলার টুপি, আর নাকটাকে সোলা জুড়ে গঁদ দিয়ে লম্বা করা হয়েছে—লম্বা করে একটু খানিক ভেঙে দেওয়াও হয়েছে আবার, হাতে একটা পাইপ, চোখে অ্যাসটন সায়েবের মতো কালো চশমা।
অ্যাসটন ঠায় তাকিয়ে রইলেন মুকুন্দর দিকে। মুকুন্দও ঠায় চোখাচোখি করে

দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হাঁকলেন সায়েব—দ্রোয়ান, জমাদার! কোথায় দরোয়ান, কোথায় জমাদার। তারা তখন সঙ দেখতে গেছে। আর সেই আকাশ-ফাটানো বাজনা বাদ্যির মাঝখানে শুনছেই বা কে। দু-বার চেঁচিয়ে সায়েব চুপ করেই দাঁড়িয়ে রইলেন তারপর বারান্দা ধরেই একটু এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে। যা হয়ে থাকে, এ তো আর হাল আমলের গল্প নয় যে সায়েব দেখেও সবাই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকবে, সায়েব এগুতেই ভিড় পাতলা। সুট সাট করে এইদিক দিয়ে ওদিক দিয়ে সরে পড়তে লাগল।

জানেন বাবু অ্যাসটন সায়েবের তিন রকম মুখ দেখেছি—কারণ নেই অকারণ নেই লাল, সেই নিশেন ওড়ানোর হাঙ্গামায় দেখেছি সাদা আর আজ দেখলাম কালো। কালো মুখখানা নিয়ে চুপ করে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন তিনি। বুঝতে পেরেছেন সবই। মুকুন্দ কাকে ভ্যাঙাচ্ছে তাও বুঝেছেন, আর মেমসাহেব কথাটাকে তো চেনেন কাজেই কী বলছে তাও বুঝতে পেরেছেন।

সন্ধ্যে ঘনিয়ে এল। জামতলির চড়ক সেকালের মতো তখন আর জমত না। দুটো বেলুন বাঁশি ফুঁকে, দুখানা পাঁপর ভেজে আর নীল লাল দু-জোড়া চুড়ি বেচে ফুরিয়ে গেল জামতলির চড়ক। দেশী সরাবের দোকানের সামনে সঙের যাত্রা ফেরতা মানুষগুলো খানিক ভিড় জমালো তারপর যে যার ঘরমুখো হাঁটা দিল। সায়েবও গাড়ি নিয়ে বাড়িমুখো রওনা হল।

সারাদিনের শেষে সায়েব বাড়ি ফিরলেন। তারপরের খবর কাদের আলির কাছে শোনা। ম্যাকফারসন মোটর নিয়ে হররোজ আসে বিকেলের দিকে। হররোজই অ্যাসটনের দ্বিতীয় পক্ষ আর ম্যাকফারসন বেরিয়ে যায়—ফেরে তারা অনেক রাতে। গাড়ি বারান্দার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে অ্যাসটন। ম্যাকফারসন হয়তো কথা বলে—অ্যাসটন ঘোঁত ঘোঁত করে জবাব না দেওয়ার মতন করে দুটো একটা জবাব দেয়। ম্যাকফারসন চলে যায়। তারপর শুরু হয় সাহেব মেমে তকরার। কাদের আলির খবর হল ঝগড়ায় সায়েব সুবিধে করতে পারতেন না তেমন। আজও চত্তির মাসের সন্ধ্যে। হু-হু করে গঙ্গা থেকে হাওয়া আসছে—সায়েবের বাগানের ফুল লুটোপুটি খাচ্ছে মনের আনন্দে—যেন সায়েব বাগানের শেকড় ছিঁড়ে উড়ে বেরিয়ে যাবে তারা। ছলাৎ করে আছড়ে পড়ছে গঙ্গার ঢেউ—গাড়ি নিয়ে ম্যাকফারসন গেছে, সঙ্গে মেমসায়েব। অ্যাসটন নিজের ঘরে আলো জ্বালিয়ে বসে রইল

ওদের পথ চেয়ে। রাত বোধ হয় সাড়ে এগারোটার সময় ওরা ফিরল। কাদের আলি দেখল দুজনেরই মুখ চোখ চক্ চক্ করছে যেন, দিলে অনেক ফুর্তি না থাকলে এমন হয় না। যেন হাওয়ায় সাফসুতরো হয়ে গেছে মনের সব কিছু কালি।

অ্যাসটন হাঁকল—আর্দালি!

কাদের আলি ছুটে গেল। মদের বোতলের সামনে বেহেড মাতাল হয়ে বসে আছে অ্যাসটন। মেমসাব লোটা হ্যায়?

হাঁ সাব লোটা হ্যায়।

সাব হ্যায় উন্‌কো সাথ?

জী হাঁ।

উনকো হামরা সেলাম দেও। ওরা দুজনে এখন সিঁড়ির নিচেয় একা একা। গলা খাঁকারি দিয়ে কাদের আলি ম্যাকফারসনকে বলল, সাব সেলাম দিয়া হ্যায়। কাদের আলি বলে, বলেই সায়েবের মুখের দিকে আমার নজর পড়ল। সর্বনাশ! এখন বলে কী করে সায়েবকে সে কথা। পষ্ট বোঝা যাচ্ছে মেমসায়েবের ঠোঁটের রঙের দাগ সায়েবের গালের ওপর। কাদের আলি খুব আস্তে একবার 'সাব' বলে ফেলেই সায়েবের দিকে উজবুকের মতো তাকিয়ে রইল। সায়েব ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল—'ক্যা দেখতা তোম?' কাদের আলি আর কি করে নিজের গালেই একবার হাত ঘষল। সায়েব ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হাসল একটু, তারপর রুমাল বার করে গালটা মুছতে গিয়েও মুছল না—সটান ঢুকল অ্যাসটনের ঘরে।

সেখানে কী কথা হয়েছিল দুই সায়েবে কাদের আলি সেকথা জানে না। মাতাল অ্যাসটনের বকবকানি আর ম্যাকফারসনের কাটা কাটা জবাব বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায়নি। শুধু পর্দাখানা উড়ে গিয়েছিল এক লহমার জন্যে সেই ফাঁকে কাদের আলি দেখেছিল দুই সায়েবই দাঁড়িয়ে কথা বলছে—মেমসায়েব ওপাশের একটা চেয়ারে বসে আছেন হাতলে মাথাটা রেখে। অ্যাসটনের চোখ জ্বলছে বাঘের মতো দপ্‌দপ্‌ করে। তারপর ম্যাকফারসনের গলা শোনা গেল অনেকক্ষণ ধরে, অনেকটা কথা সায়েব বলল একনাগাড়ে। কথা শেষ করেই ম্যাকফারসন বেরিয়ে এল ঘর থেকে—পিছু ফিরে মেমের দিকে কী একটা কথা ছুঁড়ে দিয়ে—গট্ গট্ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল সটান। বাগানে একবারটি থমকে দাঁড়িয়ে একমুঠো ফুল ছিঁড়ে নিল সামনের

গাছ থেকে—তারপর একটা ইংরেজি গান গুন্ গুন্ করতে করতে মোটরে গিয়ে উঠল অ্যাসটন সায়েবের দ্বিতীয় পক্ষের মনের মানুষ।
অ্যাসটন তেতলায় নিজের ঘরে চলে গেছে তখন। মেমসায়েব সেই চেয়ারেই বসে রইল ঠায়। কাদের আলি নিচে থেকেই দেখতে পেল ওপরে সায়েবের ঘরে নীল আলো আজ আর জ্বলল না। গঙ্গার ধারের জানলা খুলে অন্ধকারে সায়েব দাঁড়িয়ে রইল জানলার সামনে চুপ করে। অনেক রাত অবধি কাদের আলি দেখেছে সায়েব সিগারেটের পর সিগারেট খেয়েছে আর একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকেছে। নড়া চড়া নেই যেন পুতুল। গঙ্গার বুকে আধখানা চাঁদ ঢলে পড়ল······জোয়ারের ছলছলানি কখন হারিয়ে গেল কে জানে, হাওয়া পড়ে গেল।

পরের দিন সকালে নিজের বাক্স পেঁটরা চেঁচে পুঁছে নিয়ে অ্যাসটন সায়েবের দ্বিতীয় পক্ষ সায়েব-কুঠি ছেড়ে চলে গেল কলকাতায়। সায়েব তখন মিলে।

পশ্চিমের জানলা দিয়ে সে রাতে সায়েব কী দেখেছিল সায়েবই বলতে পারে—কিন্তু সায়েব-কুঠির সীমানা পেরিয়ে, পুরনো বস্তির নিচেয় গঙ্গার ঘাটের শেষ পইঠার পাটে প্রতিদিন রাতে জুড়ুতে আসতো শ্যামধারী, ভুলেও কি তার কথা সায়েবের মনে পড়েছিল—অবশ্য অ্যাসটন বলতে পারতো আমার সে কথা জানার কথা নয়।
কিন্তু কেন নয়? সিঁটকে ভিখিরির মতো পা কাটা, জোয়ান বয়সের শ্যামধারীর দমকা নিশ্বাস যদি সেদিন এই ঘর ভাঙার রাতে সায়েবকে এসে সওয়াল করত—কেন নয়? অ্যাসটন সায়েব বুকে হাত দিয়ে বলতে পারত 'আমি জানি না।'

রাত যেমন করে সর্বত্র কালো যবনিকাখানা ফেলে দেয়—ঢাকা দেয় সব কিছুকে নবগঞ্জের রাত তেমন নয়। এখানকার জীবননাট্যের দুই অঙ্কের মাঝখানে রাত যেন এক অন্ধকার গর্ভাঙ্ক। সে অঙ্কে কোনো কোনো কুশীলবের কাজ তখনও ফুরোয় না। এরাই হল বিকিকিনির হাটের দেউলে বেসাতীর দল।
ঘুমোয় জামতলি। শুধু রাতচরা গোরুগুলো পথ চলে। ঘুমোয় নবগঞ্জের বাণিজ্যব্রতীরা—শুধু বাজারের কুকুরগুলো জেগে থাকে, ঠোঙা চাটে।

ঘুমোয় পুরনো বস্তি, নতুন বস্তি, হাবেলি বাগান। শেষ পর্যন্ত বিন্দির গলি যে বিন্দির গলি সেও ঘুমিয়ে পড়ে।

সেকালে ঘুমোত না দুলালের মা। অনেক রাতে বিন্দির গলি ঝিমিয়ে গেলে সে আস্তে আস্তে উঠে আসতো তার ঘর ছেড়ে। বিন্দির গলি ছাড়িয়ে সেনপাড়া ডিঙিয়ে মুক্তোর ঘাটের মেটে পইঠার পাটের ওপর এসে বসে থাকত দুলালের মা। ওপারের আলোজ্বলা নির্জন রাস্তা আর একলা কুকুরের ডাক শুনতে শুনতে কী ভাবতো সে কে জানে।

ঘুমোত না খেয়াঘাটের মোড়ের সেই বুড়ো পাগলটা। রাত হলে একটা কাঠি বা লোহার শিক জোগাড় করে সমস্ত ল্যাম্পপোস্টগুলো ঢং ঢং করে বাজাতে বাজাতে সে ঘুরে বেড়াত।

আর ঘুমোত না শ্যামধারী। তার একখানা মাত্র আস্তো পা হিঁচড়ে হিঁচড়ে পুরনো বস্তির নিচেয় সায়েব ঘাটের শেষ পইঠায় এসে বসে থাকতো। দক্ষিণে গঙ্গার বাঁক। অগুনতি চটকলের আলো মিটমিট জলের দিকে তাকিয়ে শ্যামধারী ভাবতো তার অতীত, তার ভবিষ্যৎ, তার বর্তমান।

কিন্তু কারুর চোখেই জল ছিল না। নবগঞ্জের মাটি ধুলোয় ভরা। নবগঞ্জের আকাশ ধোঁয়ায় ভর্তি। সে বলে—আহেলিয়া, আমি তোমার চোখের জল শুষে নিয়েছি সব। তাই তোমার চোখে জ্বালা ধরাতে পারি—কিন্তু জল ঝরাতে পারি না।

পাঁচ

শুধু সম্মুখে চলেছি লক্ষ্যি
আমি নীড়হারা নিশার পক্ষী।

নবগঞ্জের মানুষ অভিসম্পাতে বিশ্বাস করে। আগেও করতো এখনও করে। তারা বিশ্বাস করে শেষ পর্যন্ত বকুলবালার অভিশাপ লেগেছিল কচিবাবুর দাদা ধীরুবাবুকে। বিশ্বাস করে শ্যামধারীর অভিশাপ লেগেছিল অ্যাসটনকে।
মতিচাঁদও বলে—অভিশাপ লাগে বাবু, অভিশাপ এড়ানো যায় না।
জিজ্ঞাসা করেছিলাম তবে নেপাল রায় এড়ালো কী করে। সে বলেছিল—নেপাল রায়ও এড়ায়নি, তবে তার গায়ে অভিশাপটা শেষ পর্যন্ত লাগল না, সে গল্প পরে হবে।
শ্যামধারীর অভিশাপটা কী জিজ্ঞাসা করাতে ও বলেছিল অনেক কথা। চটকল-মজুরের অলিখিত ইতিহাস যেদিন সত্যি সত্যি লেখা হবে হয়তো সেদিন শ্যামধারীর মতো চটকলিয়ার জীবনবৃত্তান্ত আমরা জানব—কিন্তু অনেক দিনের জট-পাকানো সুতুলিকে জট ছাড়িয়ে সিধে করে ফেলা যেমন এক লহমার কাজ নয়, শ্যামধারীর মতো মানুষের সকল রহস্যকে জানাও তেমনি এক দৃষ্টির কাজ নয়। তবু নবগঞ্জের ইতিকথাকে যদি পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে হয় তাহলে শ্যামধারীর কথাকে বাদ দেওয়া চলবে না।
'একটা চটকল মজুরের তিনটে করে গিঁট' মতিচাঁদ বলেছিল 'কিস্তিওয়ালা, বস্তিওয়ালা আর খিস্তিওয়ালা।' সেকালের চটকল মজুরের দুব্‌লা কলজেয় অত হিম্মৎ ছিল না যে ঐ তিন তিনটে গিঁট ছাড়িয়ে বেরিয়ে আসে। শ্যামধারীও পারেনি।
শ্যামধারী ছিল গুদাম ঘরের কুলি। একালে যেমন চটকলের তামাম মজুরই চটকলের পাকা খাতার মজুর সেকালে তেমন ছিল না। অর্ধেকের বেশি মজুর ঠিকাদারের ঠিকে মজুর। ঠিকা মজুরদের নোকরির কোনো মা-বাপ নেই। ঠিকাদারের দিল যদি গঙ্গার মতো হল তো চাকরি রইল—দিল যদি গরম হয়ে গেল তো নোকরি ছুটে গেল। ঠিকাদারের সঙ্গে সম্পর্ক কেবল বড়ো সায়েবের। মিলের সামনে এখন যেমন বদলিওয়ালারা বসে থাকে সার বেঁধে—সেকালে তেমনি ঠিকাদারের উমেদার হয়ে বসে থাকত চটকলিয়ার দল হাঁ করে।

বড়ো সায়েব বলবে ঠিকাদারকে, ঠিকাদার নেবে মজুর, যদি নসিবে থাকে তাহলে ঠিকাদার ডাকবে আমায়—এই ভেবে সবাই বসে থাকত।

কিস্তিওয়ালা হল যার কাছে চটকলিয়া দেনা করেছে। কিস্তিতে কিস্তিতে সুদ দিয়ে যাচ্ছে যাকে। কাবলিওয়ালা, মহাজন, গদিওয়ালা এরা হল কিস্তিওয়ালা।

বস্তিওয়ালা হল যার বস্তিতে চটকলিয়া থাকে। যে তার মোকান-মালিক। খাঁচার চারদিকে আলোর পথ অন্তত খোলা থাকে। বস্তির ঘরের চারদিকই প্রায় বন্ধ—শুধু ঢোকবার মুখ খোলা। অন্ধকার সেখানে দিনেও রাতেও। এই আস্তাবলের মতো আস্তানার যিনি মালিক তিনি হলেন বস্তিওয়ালা।

আর খিস্তিওয়ালা হল ঠিকাদার, হাজরেবাবু, বড়ো সায়েব। যারা শুয়ার কি বাচ্চা বললেও হাসতে হবে দাঁত বার করে। আরো খারাপ গালাগাল যখন দেবে তখনও চুপ করে থাকতে হবে—বুধোর মতন রুল হাঁকড়ালে চলবে না—অবিশ্যি যদি নোকরি বাঁচাতে চাস—আর না চাস তো চলে যা বুধোর মতন।

এই শ্যামধারী ছিল চটকলের ঠিকা কুলি,—ঠিকাদার ছিলেন ধীরুবাবু—যাকে বকুলবালার ভাশুর বলতো বিন্দির গলির ছেলেরা সেই ধীরুবাবু। মাধো সাহুর রেলপারের বস্তিতেই বাসা বেঁধেছিল সে। মতিচাঁদের কথায় যা বুঝেছিলাম তাতে এই বুঝেছিলাম যে সে ছিল জুট গুদামের কুলি। বুথ অ্যাণ্ড হেণ্ডারসনের চটকলের দুটো ভাগ। একটা মিল, একটা ফ্যাক্টরি। মিল অংশে ঠিকা কুলিরা কাজে লাগত—শ্যামধারী ছিল এই ধরনের ঠিকা কুলি। শ্যামধারী কবে এসেছিল চম্পারণ জেলার দূর দেহাত থাকে—খেতিউতি আর ভঁইসের মোহনমায়া ফেলে তার খবর কেউ রাখে না। মতিচাঁদ বলেছিল—পশ্চিমের গাড়ি থেকে অমন একশটা শ্যামধারী রোজ নামে এই নবগঞ্জের বাজারে—কে কার পাত্তা রাখে! শ্যামধারীও একদিন এসেছিল, তারপর মাধো সাহুর বস্তিতে সামিল হয়ে গেল। চম্পারণ, ছাপরা, মুঙ্গের, দ্বারভাঙ্গা, দোসাদ কুর্মি চামার মাধো সাহুর বস্তিতে ভিড় করে বাস করত। চটকলের রোজানা মেহনত খেটে দিন সন্ধ্যেয় মাধো সাহুর বস্তিতে খোলার ঘরে তারা ফিরে আসত। সকলে মিলে চুল্লি জ্বালিয়ে কয়েক লহমার মধ্যে ধোঁয়ায় ভরে ফেলত সারা বস্তি। একটু বাদেই জমে উঠত মাধো সাহুর বস্তি রঙ-বেরঙের গাল-গল্পে, রকমারি কেচ্ছা-কাহিনীতে। বিরাই আর সুখলালের কুস্তির আখড়ায়

পাঁয়তাড়া ভাঁজার আর তাল ঠোকার শব্দ শোনা যেত ফটাশ ফটাশ করে। ওদিকে অন্ধকারে লাঠির আওয়াজ বাজতে থাকত ঠকাস্ ঠকাস্—দশেরার মিছিলে নবগঞ্জের রাস্তায় লাঠির কেরামতি দেখাবে রাজপতি—এখন থেকে তৈরি হচ্ছে। কোথাও বা কোনোও জাতের পঞ্চ বসেছে কে হাত ধরে টেনেছে কার কিংবা ঐ ধরনের কোনো ব্যাপার। তুমুল চেঁচামেচি সেখানে। পাটের ফেঁসো বা তেল মাখানো তেলজুট ঝোলানো অবস্থায় জ্বালিয়ে নিয়ে অন্ধকারে কেউ এ মহল্লা ও মহল্লা করছে। সেই কায়েতপাড়ায় মাধো সাহুর বস্তির অনেক আগে দম ফুরিয়ে শেষ হয়ে গেছে মিউনিসিপ্যালিটির জল আলো ঝাড়ুদার মেথর, সারা দিনের নিস্তব্ধতার পর চিল্লাচিল্লি করছে মাধো সাহুর বস্তি। ঝগড়া বেধেছে রামদেবের মায়ের সঙ্গে সুখনের বউয়ের। ঘন-অন্ধকারে আর কিছু দেখা যাচ্ছে না—শুধু দুজনের কানে আঙুল দেওয়া খিস্তি বাতাসকে করে তুলেছে আরও ভারী—একটু দূরে উনুনে ফুঁ দিতে দিতে মাঝে মাঝে বাঙালীর বউ কার দিক হয়ে একটু করে ফোড়ন কাটছে—উস্কিয়ে দিচ্ছে ঝগড়াটাকেও। রোজকার মতোই দেশী সরাবের দোকান থেকে ফেরে বিট্টু চামার, তার বউটা রোজকার মতোই চুলোয় জল ঢেলে রাগ করে বসে থাকে, রোজকার মতোই পাশের মহল্লা থেকে রামা হো-ও-ও, ঢোলের আর চিৎকারের মিলিত কোরাস বিট্টুর মাতলামিকে চাপা দেয়। রোজকার মতোই মাধো সাহুর বস্তি মিলের বাঁশি বাজার পর প্রাণ ফিরে পায়।

শ্যামধারী এখানে থাকত। ঠিকাদার সাব ধীরুবাবুর ঠিকা কুলি ছিল সে। চটকলের মস্ত বড়ো গুদামঘরের সামনে লরিতে করে কাঁচাপাটের বড়ো বড়ো বেল বা গাঁটরি এসে দাঁড়ায়। লরি থেকে সেগুলো নামিয়ে গুদামজাত করা ছিল শ্যামধারীদের জিম্মায়। পেল্লাম দরজা, দোতলা সমান ছাতওয়ালা গুদামঘরের মধ্যে পাটের গাঁটগুলো সাজিয়ে রাখাই গোডাউন কুলির চাকরি। চটকলিয়ার ভাষায় যারা এই লরি থেকে গুদামঘরের কড়িকাঠের মাথায় পাটের ছ-মনী গাঁট-গুলোকে বয়ে নিয়ে যায় তাদের বলে শ্যাংরাকুলি। ছ-সাত মন ওজনের বিরাট বিরাট গাঁট দুজন দুজন কুলি মাথায় চাপিয়ে বয়ে নিয়ে যায়। দুজনের দুটো মাথা তখন একটা মাথা হয়ে যায়, চারটে পা তখন দুটো পা হয়ে যায়, দুটো লোক তখন একটা লোক হয়ে যায়। শ্যাংরাকুলিরা একালে বেশ ভালো মাইনেই পায়। সেকালে ঠিকাদারের অধীনে সে কাজ ছিল শুধু মেহনতের আর তখলিফের। সর্দারকে সদাই হুঁশিয়ার থাকতে হয়। কুলিকে একটু

বেহুশ হলে চলে না। বেহুঁশ হলে জান বরবাদ হয়ে যাবে তার। শ্যামধারী ছিল এই শ্যাংরাকুলিদের একজন।

চালু বাঁশি বাজার পর থেকে এগারোটার বাঁশি বাজা পর্যন্ত শ্যামধারী আর তার জুড়িদার বুলাকীলালের খৈনি টেপার পর্যন্ত সময় থাকে না। লরির পর লরি, গোরুর গাড়ি সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, খালাস করে তবে রেহাই। অ্যাসটন সায়েব আসে, সঙ্গে থাকে সায়েব ওভারসিয়ার, চেঁচায়—'বহুৎ ধীরসে কাম হোতা, ধীরুবাবু,' আর ধীরুবাবু একবার একে গাল দেয় হারামীর বাচ্চা বলে, ওকে গালাগাল দেয় গিধ্ধড় বলে, কাউকে বলে উল্লুক, জলদি করো, জলদি করো! শ্যামধারী আর বুলাকীলালের মাথায় তখন হয়তো জগদ্দল ওজন, ঘাড় শক্ত, গলার শিরগুলো দড়ির মতো ফোলা, মুখ বেগ্নে। সেই অবস্থাতেই ওদের চোখগুলো ভাঁটার মতো একবার জ্বলে ওঠে তারপর তখনি নিভে যায়। সেখানেও চারটে চোখ জ্বলে উঠত যেন দুটো চোখ।

শুধু যখন সেলাই ঘরের মেয়েগুলো এগারোটার বাঁশি বাজার সময়, হয়তো বা তার একটু আগেই দল বেঁধে বেরিয়ে আসতো তখন তাদের কাউকে কাউকে দেখে শ্যামধারী আর বুলাকীলালের চোখ দু-রকম হয়ে যেত। বুলাকীলাল ভাবত যে এই পাতলি কোমরওয়ালী মেয়েগুলোর ঠসক এবং ভড়ং দেখলে তার দিল বিগড়ে যায় কেন? আর শ্যামধারী ভাবত যে পনেরো বছরের পারবতীয়ার কাছে এই ঠসকওয়ালী মেয়েগুলো ঝুটা মাল। মতিচাঁদ মন্তব্য করেছিল যে—শ্যামধারী আর বুলাকীলাল দুজনে মেয়েমানুষ নিয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল।

মতিচাঁদের ফিলজফি এবং এথিকস্ এক। সে বলত—সব নেশার সেরা নেশা মেয়েমানুষের নেশা, তা সে ঘরেরই হোক্ বাইরেরই হোক্। নেশা যতক্ষণ নিয়মে থাকলো ততক্ষণ ভালো। আপনার দুখ, তখলিফে, বেতরিবতে সে দাওয়াই। আর যখনি সে মাথায় চড়ে বসবে তখনি সে বিষ। বেইমানি, দাগাবাজী, দোস্তিতে ফাটল সব নিয়ে আসবে তখন সে। বুলাকীলাল এই কথাটা জানত না। তাই শ্যামধারীকে শুধ্তে হল বুলাকীলালের নেশার দেনা, অ্যাসটন সায়েবের পাপের আর ধীরুবাবুর বেইমানীর দেনা।

বাবু, রঙদার এই চটকল বাজার। ভেল্কি এর আসমান্ জমিন সব জায়গায়। হাতি কলের কাজ ছেড়ে বেরিয়ে আসে টাটকা জোয়ান ছেলে, পাটের

রোঁয়া-জড়ানো চুল—তখন সেই চিম্‌সে ছোঁড়াকে মনে হয় পাকাচুলো বুড়ো। বয়লারের সামনে দড়ির মতো শুঁট্‌কো বুড়োর দাঁড়ি গোঁফ পোড়া মুখখানাকে দেখলে বয়স মালুম করা মুশ্‌কিল। এখানে ধুলোয় মিশে রয়েছে চটকলের কালি—গঙ্গার জলে মিশে রয়েছে চটকলের ভুসো। এখানে পঞ্চাশ টাকা মাইনের হাজরেবাবু হুগ্‌গোচ্ছব করে—আন্‌টাটকা দেহাতী ছেলে মুখে রক্ত তোলে। চটকল বাজারে ঝিঙে চালান হয় পটল বলে—এখানে বেইমানের ইমানদার হবার ঝোঁক। যে এ শহরকে চেনে না সে দুপুর বেলায় মনে করবে আকাশে বুঝি মেঘ এল—মেঘ নয়, চিমনির ধোঁয়া রোদ ঢাকা দিয়েছে এক লহমার জন্যে—তারপর ফুঃ বলে যেমন ভানুমতীর ভেল্কিতে 'নেই' করে দেয় তাস তেমনি করে ধোঁয়ার মেঘ উড়ে যায়। শীতের সন্ধ্যেয় ভূতের মতন সেই নকল মেঘ নেমে আসে মাটির বুকে—বস্তির চালে, কচার বেড়ার মাথার গায়ে আটকে থাকে। রঙদার এই চটকল বাজার—আজ যেখানে ছিল কেরাই ঝা, কাল তাকে ডাকতে যাও পাবে না সে মুলুক চলে গেছে, বহুৎ বেমারী—জানিয়ে দিল ছন্নু দোসাদ—এখন সে-ই ওখানে থাকে। এখানে কেরামতের কলেরা হলে ফুর্তির সাড়া পড়ে যায় বীরেশ্বর সাহুর বস্তিতে। কেরামত কাবলিওয়ালা—ভুগুক বেটা, যতদিন ভোগে ততদিনই রেহাই। সুখিয়ার বউ আজ পর্যন্ত একটাও জ্যান্ত ছেলে দিল না—সুখিয়ার বেওয়া ভাতিজা কোথা থেকে একটা তাগড়া বাচ্চা এনেছে—পঞ্চ বসাও। দাড়িতে আর চুলে মেহেদির রঙ মাখিয়ে খোদাদিন ঘুরে বেড়াল সারা জীবন। চারটে বিবি কেড়েছে সারা জীবনে। মরবার সময় চটকল বাজারের রঙদার তামাশাবাজির ভেল্কিওয়ালা 'নেই' করে দিল রঙ—সাদা ফ্যাকফেকে চুল দাড়ি নিয়ে সিড়িঙ্গে খোদাদিন যেদিন জানান দিল তার বয়স আস্‌সি বরষ। সেয়ানা মেয়ে এই গতর নিয়ে আসে বিন্দির গলিতে বিকিকিনির হাটে শরীর বেচতে—ফিরে বছর তাকে দেখতে পাবে পুলের তলায় ভিখ মাঙছে—কোমর সোজা করতে পারে না—'নেই' করে দিয়েছে তার গতর।

শুধু পাকা ভেল্কিওয়ালা যেমন 'আছে' করে দিতেও পারে মাঝে মাঝে—চটকল বাজারের রঙদার ভেল্কিবাজ সেই ফুস্‌মন্তরটা জানে না।

'দেখ্‌ পারবতীয়া' শ্যামধারী নাকি বলেছিল তার ষোলো বছরের বহুকে, নবগঞ্জের ইস্টিশানে গাড়ি থেকে নেমে—'এ চটকল বাজার এখানে তিন তাসের খেলায়

হক্কের ধন বেরিয়ে গিয়ে ফকির হয় মানুষ, আস্তো লোকটা বেরিয়ে আসে গিয়ান-ঘর থেকে টুটাফুটা—এখানে হুঁশিয়ার!' পারবতীয়া তখন তাকিয়েছিল পাঞ্জা বরফওয়ালার দিকে—বরফ গুঁড়ো করে কাঠির মাথায় পাথার মতো লাগিয়ে লাল নীল রঙ করে দিচ্ছে, লোকে চুষে চুষে খাচ্ছে—ঐ একটা খাবে সে।

মতিচাঁদ বলেছিল—শ্যামধারীর গল্প ততক্ষণ গল্প নয়, যতক্ষণ না এ গল্পে পারবতীয়া আসছে। পারবতীয়া তার বউ। সে বছর জষ্টি মাসে দেশ থেকে পারবতীয়াকে নিয়ে এল শ্যামধারী। বছর ষোলো-সতেরোর ডাগর ডোগর মেয়ে। একমুখ হাসি—আর নাকে মুখে খই ফুটছে মেয়ের। নই বাছুরের মতো তিড়বিড় করছে রাতদিন। জাতভাই সবাই বলল—এ বউ শহরে এনে ভালো করেনি শ্যামধারী। শ্যামধারী বলল—কোন্ শালা কী করবে হামার।

কিন্তু শ্যামধারীর হিম্মতে ছিল না পারবতীয়াকে কব্জা করে রাখা। যে মেয়ে গঙ্গার ঘাটের রাণায় হাঁটুর ওপরের কাপড় খসিয়ে গঙ্গা মাটি ঘষে ঘষে ময়লা সাফ করে আর পুরুষমানুষ দেখছে দেখেও দেখে না তাকে সামলানো শ্যামধারীর পক্ষে মুশ্কিল।

এ সংসারে সব থেকে বড়ো ধান্দা কী জানেন—মানুষ তার নিজের বুকের কাছের লোকটাকেও ঠিক ঠিক চেনে না। শ্যামধারী জানত না যে পারবতীয়া এত বাঁশি শুনতে ভালবাসে। শ্যামধারী এও জানত না বুলাকীলাল এত বাঁশি বাজাতে ভালবাসে। শ্যামধারী মনে করত যে ঘুঁটি খেলতে বুঝি একা পারবতীয়াই ভালবাসে—এখন শ্যামধারী দেখল—না, বুলাকীলালও বাসে তবে পারবতীয়ার সঙ্গে হলে একটু বেশি বাসে। গোলমালটা এখানে নয় যে, শ্যামধারীর বয়স বেশি আর বুলাকীলালের বয়স কম। বয়স কম তো কী হয়েছে জোয়ান তো শ্যামধারীও কম নয়।

মুশ্কিল ওখানে নয়, মুশ্কিল তফাতে। শ্যামধারী পারে বুলাকীলালের মতো রঙ তামাশা করতে, পারে ছড়া গাইতে, ঢোলক নিয়ে বিরহা গাইতে—শুনলে মনটা উদাস করে দেয়—না, পারে না, অথচ পারবতীয়া চায় পাতা কেটে চুল বাঁধে—হাতে আস্লি চাঁদির চুড়ি পবে কপালে কাঁচপোকার টিপ। শ্যামধারী কি এনে দেয় না সেসব? ঝুট বাত, কে বলেছে এনে দেয় না। পারবতীয়ার রকমসকম দেখে সাহুর কাছ থেকে কর্জ নিয়ে এসেছে সে, কিনে এনেছে চুড়ি, লাল চেলি, কাপড় কিন্তু তাতে কী হয়েছে। শ্যামধারী কি বলতে পারে বুলাকীলালের মতো কেমন মানিয়েছে তাকে—কী রকম খুবসুরত দেখাচ্ছে

তাকে—বলতে পারে চোরের মতো এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে সাঁঝের বেলায় এসে শ্যামধারী যখন কুস্তির মাটি মাখতে গেছে তখন। না, বড়োজোর হাতখানা ধরে টান দেবে—চল্, ঘর চল্—তাও যদি পরের দিন কুস্তির দঙ্গল না থাকে তবেই।

বুলাকীলাল ভাবত শ্যামধারী কিছু টের পাচ্ছে না। শ্যামধারীর কানে সব খবরই আসতো। আর তার মজা বাধত চটকলের পাটগুদামের সামনে। বুলাকীলাল না এলে শ্যামধারী কাজে হাত দেবে না। বুলাকীলাল নাগা হয়ে গেল তো দেখতে হবে না শ্যামধারীও এগারোটায় খেতে গিয়ে আর ঘুরে আসবে না। চটকলে তখন এসব চালাকি চলত না। সটান নোকরি চলে যাবে দিল্লাগী বাড়ালে। কিন্তু শ্যামধারী আর বুলাকীলালের মতো ওস্তাদ ত্যাংরা কুলি ধীরুবাবুর হাতেও দশ-বিশটা ছিল না—কাজেই একটু আধটুতে কিছু আসত যেত না।

তবে বুলাকীলাল আর শ্যামধারীর দোস্তি একদম টুটে গিয়েছিল। পাড়ার লোকে বলত শ্যামধারীর বউটা পাজী। পারবতীয়া নাকি বুলাকীলালকে দেখলে সড়কওয়ালী মেয়েদের মতো হাসে। বুলাকীলাল মস্করা করলে সেও জবাব দেয়। পঞ্চের পরামর্শে শ্যামধারী পারবতীয়াকে শাসিয়েছিল—ফের যদি দেখি তো ঘাড় ভেঙে দেব, হাঁ। আর বুলাকীলালের সঙ্গে বাতচিত প্রায় বন্ধ হয়ে গেল শ্যামধারীর। একজায়গায় কাজ করে, এক ডিপার্টের কুলি যেটুকু সম্পর্ক না রাখলে নয় সেটুকুই রাখত। নইলে বুলাকীলাল আর শ্যামধারী আলাদা হয়ে গেল। দুজনেই মেয়েমানুষ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মাথা খারাপ করে ফেলল।

শ্যামধারী পারবতীয়াকে যেদিন ঘরের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ঠেঙালো সেদিন বোঝা গেল যে শ্যামধারীর বারোটা বেজে গেছে। শ্যামধারী বুলাকীলালের মতো ছড়া বলতে পারত না বটে, রঙ তামাশাও জানত না সত্যি কথা, কিন্তু শ্যামধারী পারবতীয়াকে চোখে হারাত এমন ভালবাসত। পারবতীয়া শ্যামধারীর সেখানটায় দাগা দিয়েছিল। শনিবার সন্ধ্যেবেলায় একটুখানি দেশী সরাব খেয়ে সে ঘরে এসেছে, মনটা বেশ তর ছিল—এসে দেখে পারবতীয়ার গাল টিপে ধরে কী একখানা গান গাইছে বুলাকীলাল। তামাশা দেখুন একবার, মেজাজ ঠিক থাকে কারুর? বুলাকীলাল তো তখনই চলে গেল, মদের ঝোঁকে আর রাগের ঝোঁকে শ্যামধারী করল এক কাণ্ড। চুলের মুঠি ধরে পারবতীয়াকে

ঘরে নিয়ে গেল সে। দরজা বন্ধ করে খাটিয়ার সঙ্গে বেঁধে ফেলে পারবতীয়াকে ঠেঙাতে শুরু করলো শ্যামধারী। দেখতে দেখতে ভিড় জমে গেল ঘরের সামনে। মজা দেখতে এসেছে কেউ, কেউ এসেছে দরদ জানাতে। পারবতীয়াকে গাল পাড়তে লাগল মেয়েরা—মরদরা শ্যামধারীকে—হাঁ, অত হাত পাতলা হলে চলে? এজায়গা বহুৎ খারাপ।

চিৎকার করে কাঁদতে লাগল পারবতীয়া · শ্যামধারীর মরণ কামনা করে। শাপমন্যি দিতে লাগল সে। পারবতীয়ারই বা কী কসুর বলুন। দেহাতী মেয়েটা শহর বাজারের হৈ হট্টগোলের চরকিবাজির মাঝখানে এসে ঘুলিয়ে ফেলেছে মাথা। বুলাকীলালের কাছ থেকে সে শহর বাজারের হাজার তামাশার মজার গল্প শুনেছে, বুলাকীলাল তাকে দোসরা দুনিয়ার কথা বলেছে যেখানে হাসি, গল্প, সমাজ নেই, পঞ্চ নেই, মরদের মার নেই, ঠ্যাঙা নেই। হাঁ, বলতে পারেন, শ্যামধারীর দোষই বা কী তাহলে? কিছু না, কিছু কসুর নেই। শুধু সে ভুল করেছিল পারবতীয়াকে বাঁধতে গিয়ে। শুনুন বাবু, মেয়েমানুষকে কোথাও বাঁধ দিতে নেই, ছাড় দিলেই সে বাঁধা থাকে—কিন্তু শ্যামধারীর অত মগজ ছিল না কাজেই সে আলুথালু পারবতীয়াকে ফেলে রেখেই গেল সাহুর কাছে—পঞ্চ্ বসাও মুখিয়া, বুলাকীলাল আমার ইজ্জত খেয়ে দিয়েছে।

মতিচাঁদ বলল—মাধো সাহুর কাছে ঘোড়ার গাড়ি কেনার সময় কর্জ নিয়েছিলাম। তারই কিস্তি শুধতে ফি হপ্তায় আমাদের যেতে হত মাধো সাহুর বস্তিতে। দুনিয়া পাল্টে যাবে তবু মাধো সাহু কিস্তি ছাড়বে না। সেদিন আমি বসে আছি মাটির ওপর, মাধো সাহু বসে আছে খাটিয়ার ওপর—এই কেতা, কিস্তি-ওয়ালার সঙ্গে সমান সমান বসতে নেই—এমন সময় শ্যামধারী গিয়ে হাজির। তামাক খেতে খেতে কি বিত্তান্ত সব শুনলেন মাধোলাল তারপর আবার তামাক খেলেন তারপর এলান করলেন—সামনের শনিচর সামকো বখত পঞ্চ্ বসবে আমতলায়। বলে বললেন মাধো সাহু—বুলাকীলাল হারামীর বাচ্চা, বহুৎ বদ্‌মাশ। তবে হাঁ, তোর বউটাও কম নয়।

পঞ্চ্ না বসা পর্যন্ত এরকমভাবে দু-মুখো কথা বলাই মুখিয়াদের নিয়ম। অবশ্য শ্যামধারীকে এর জন্য পাঁচসিকে পয়সা জমা দিতে হল পঞ্চের টাট হিসেবে। মাধোর কাছ থেকেই হাওলাত করে মাধোর কাছেই জমা করে দিল পাঁচ সিকে পয়সা। মাধোলাল শাঁখের করাত, যেতে আসতে দু-দিকেই কাটতেন।

তারপর ছড়িদার দুজনকে দিতে হল দু-আনি দু-আনি চৌ আনি। খবর চলে গেল জাতভাই দশ আদমির কাছে—বুলাকীলাল আর শ্যামধারীর বউ-এর ব্যাপারটার ফয়সালা হবে পঞ্চের সামনে শনিচর সামকো বখত, সব ভাই হাজির থাকবে। কোনো কোনো ভাই বেঁকে বসল—না, আমরা আর যাব না। পঞ্চের মিটিনে আর ইজ্জত নেই। সেবার বিহারী খলিফা পঞ্চের টাট দিল—পঞ্চ বসতে না বসতেই বিড়ি তামুক সব সাফ হয়ে গেল—ঘরের খৈনি খরচ করে পঞ্চ করা পোষায় না। পারবে শ্যামধারী চা খাওয়াতে? ভেলী গুড়ের চা নয়, চিনি দেওয়া চা—হাঁ, পারে তো বলুক। আর একজন বলল—ছোড়ো বাত, জরুকে সামলাতে পারে না, ও খাওয়াবে পঞ্চকে চা।

শ্যামধারী ফের চলে গেল মাধোলালের কাছে। একটা হ্যাণ্ডনোট লিখে দিয়ে পাঁচটা টাকা যোগাড় করল সে—ঠিক আছে চাই খাওয়াবে সে, লেকিন বিচার চাই পঞ্চের কাছে।

বুলাকীলালের কাছেও খবর পাঠানো হল। পারবতীয়াকেও হাজির হতে হবে।

শনিবার দিন আমতলায় পঞ্চ বসল।

দুটো খাটিয়া পেতে মুখিয়ারা সব বসলেন, আর সব মাটিতে। মোচে তা দিতে দিতে মাধো সাহু একবার এদিক একবার ওদিক তাকাতে লাগলেন। বউ ঝিয়াড়ির দল ওদিকটায় বসলো—বসেই শুরু করল চেল্লাচিল্লি, ছোট ছেলে-গুলো মারামারি জুড়ে দিল, আরো ছোটগুলো কান্না। সবাই বাতচিত আরম্ভ করলো। কে কেমন আছে। অ্যাসটন সায়েবের মেমের খবর কী —আরে রাখো অ্যাসটন সায়েবের মেমের খবর, পারবতীয়ার খবরের পর আর সায়েবের ইজ্জত ঢিলে হল কিনা দেখতে যেও না।

তারপরে মাধো সাহু তো এবার পাকা বাড়ি তুলবেন, সবই গণেশজীর কিরপা আর কি। এর মধ্যে দোসাদ মহল্লার একটা বাঘা কুকুরকে মাধোলালের বস্তির একটা কুকুরের সঙ্গে কে এক বাচ্চা লড়িয়ে দিয়েছে—দু-দল কুকুরের ঘেউ ঘেউ ঘ্যাঁ ঘ্যাঁ—পঞ্চ ভেঙে যায় আর কি—শেষে ইঁট মেরে কত কষ্টে থামানো হল।

শুধু চুপ করে বসে আছে পারবতীয়া আর বুলাকীলাল। শ্যামধারী ভারী ব্যস্ত। চা খাওয়াচ্ছে সবাইকে। পান-তামাক চলছে ঢালাও। তারপর একসময় মুখিয়ারা বললেন—ওসব ফালতু বাত ছোড়ো, এবার আসল কাজের কথা হোক্। ছোটেলালের ছিল আবার সব তাতে উঠে দাঁড়িয়ে লেকচর দেওয়া রোগ। এটা

ও শিখেছিল নবগঞ্জের ভদ্দর আদমিদের মিটিন থেকে। সব আগেই সে উঠে দাঁড়াল, মুখিয়াদের দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে বলতে শুরু করলো—মুখিয়াদের কাছে আমার একটা আর্জি আছে। পঞ্চের রায় যদি কোনো শালা না মানে তবে তার জন্যে পঞ্চ কী ব্যবস্থা করেছে? ধোবি নাপিত বন্ধ? এ চটকল বাজারে তার কোনো মানে হয়? এ মহল্লা থেকে সে শালা চলে যাবে নতুন বস্তিতে, সেখানে তুমি যাবে—সে পুরনো বস্তিতে চলে যাবে। হাঁ, পঞ্চ একটা ঠিক বাত বলুক—নইলে শক্ত আদমির কাছে পঞ্চ জব্দ আর নরম লোকের কাছে দুশমন। এ আচ্ছা বাত ভি নেহি, সাচ্চা বাত ভি নেহি। সঙ্গে সঙ্গে ছড়া কেটে দিল গিরিধারী—

ইধর উধর লড়াই লাগা মুঝকে লাগা গোসা
আর বকরি আকে কান হিলায়া জলদি ঘরমে ঘুসা।

হা হা হা হো হো হো আর মেয়েগুলোর খিল্ খিল্ হাসির ঠেলায় আর কিছু শোনা গেল না। খাটিয়া ছেড়ে মাধো সাহু উঠে দাঁড়ালেন—দু-হাত নেড়ে বলতে লাগলেন—চুপ, চুপ, সব চুপ। সবাই চুপ করল একটু। মাধো সাহু বললেন—এবার আসলি বাত শুরু হোক, ফালতু বাত ছোড়ো সবকোই।

কিষণলাল মাধো সাহু লাঠি ঠুকে একবার হুঁকার দিলেন পঞ্চের নামে। শ্যামধারী তার ব্যাপার বুঝিয়ে বলল। বলল, বুলাকীলালের শয়তানির কথা। বুলাকীলালকে সে আপন ভাইয়ের মতন দেখেছিল, আর বুলাকীলাল তার সঙ্গে এমন-গদ্দারি করেছে। পারবতীয়া ছেলেমানুষ ওর কী দোষ আছে। এখানটায় পঞ্চের জমায়েত মেয়েরা টিটকিরি দিয়ে উঠলো—ছেলেমানুষ, কত ছেলেকে মানুষ করে দিল ও ছেলেমানুষ। মাধো সাহু কিষাণলাল হাত তুলে বললেন—চোপ চোপ। ছোটেলাল দাঁড়িয়ে বলল—মাতব্বরদের সামনে বেশি বাজে কথা বলতে নেই। তুলসীদাসজী বলেছেন—আবে রাপ। হাঁ, উসকো বাদ কী হল বল্। শ্যামধারী বলল—বুলাকীলাল পারবতীয়ার কী করেছে সে বুলাকীলালই ভালো জানে, লেকিন পঞ্চ যদি সুবিচার করে তো বহুত আচ্ছা নইলে সে বুলাকীলালের টুটি ছিঁড়ে ফেলবে। বুলাকীলাল ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল—আরে তু যা যা। শ্যামধারী লাফিয়ে উঠল, খবরদার। বুলাকীলালও দাঁড়িয়ে উঠল—আরে তু যা, জরুর পাশে হিম্মত দেখা গে যা। শ্যামধারী বুলাকীলালের চুলের মুঠি চেপে ধরল—মারপিট বাধে আর কি। হাঁ, ঐখানে বলতে হয় পঞ্চের দাপট। মাধো সাহুর ঐ তো তালপাতার সেপাই চেহারা, খাটিয়া ছেড়ে উঠে এসে

এক ঝাপড় শ্যামধারীকে আর এক ঝাপড় বুলাকীলালকে। বাস্ দুজনেই ঠাণ্ডা হয়ে বসে পড়ল। আর পারবতীয়া কাঁদছে দেখে কিষণলাল এক ধমক ছাড়লেন। পারবতীয়া একবার চম্‌কে উঠে চুপ করে গিয়ে আবার কাঁদতে শুরু করল।

আমতলার পঞ্চ জমজমাট। দূরের শ্যাওড়াগাছটা ঘিরে জোনাকির দল টিপটিপ করছে। মাধো সাহুর বস্তির ধোঁয়া-মাখানো আঁধারে আমতলার জমায়েত জেঁকে উঠেছে। মেসিন পরিষ্কার করা পাটের ফেঁসো—যার নাম তেলজুট তাই জ্বালিয়ে কেরোসিনের কুপি জ্বালিয়ে আর দু একটা লণ্ঠন নিয়ে গোল হয়ে বসে গেছে মাধো সাহুর বস্তি। বিচার হবে বুলাকীলালের। কুকুরগুলো চুপ করে বসে পড়ে জিভ বার করে হাঁপাচ্ছে। ছোট ছেলেগুলোও মায়েদের বুকে মুখ গুঁজেছে। মতিচাঁদ বলল—এ আপনার অ্যাসটন সায়েবের দ্বিতীয় পক্ষ নিয়ে কেলেংকারি নয়--যা হবে ঘরে ঘরে চুপ। কি ম্যাকফারসনের সঙ্গে দেখা হলেও দেঁতো হাসি হাসতে হবে। এ হল মাধো সাহুর বস্তির ইজ্জত। বুলাকীলালের টুঁটি ছিঁড়ে ফেলবে সবাই পঞ্চ যদি হুকুম দেয়। চটকল বাজার এমনিই মানুষের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। বহিন কি জরু কি লেড়কি কিছুই এখানে ঠিক রাখা চলবে না যদি একটু হুঁশিয়ারীতে ঢিল দেয় লোকে—এই হল মাধো সাহুর কথা। তাই মাধো সাহুর বস্তি কি হীরালালের মহল্লা কি দুখাই খলিফার বস্তি সব জাগাতেই পঞ্চের দাপট বেশি। যার ভালো লাগে না সে চলে যাক—পুরনো বস্তিতে কি নতুন বস্তিতে যেখানে তেলেগু, মুসলমান, ওড়িয়া সব পাশাপাশি থাকে, পঞ্চ তোকে জ্বালাতে আসবে না, আরামসে থাকবি। কোম্পানির কোলের ছেলে হয়ে।

বল্ বুলাকীলাল তোর কি বলার আছে, কিষাণলাল হাঁকলেন। লাল্‌চে গন্‌গনে তেলজুটের আলোয় সবাই থির হয়ে বসল। সকলের চোখ তখন বুলাকীলালের দিকে। পারবতীয়া ঘোমটার আড়াল থেকে দেখছে বুলাকীলালকে। মাধো সাহু মাথা নিচু করে মোচে চাড়া দিতে দিতে তাকালেন পারবতীয়ার দিকে। বুলাকী-লাল জিজ্ঞাসা করল, কী একতিয়ার আছে পঞ্চের আমার বিচার করার। বুলাকীলাল হঠাৎ বাঁই করে এই কথা বলে বসায় সবাই হকচকিয়ে গেল।

কেন? একথা কেন? তারপর সবাই একসঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ে বুলাকীলালকে তাড়া করল—মানে কী কথাটার। বুলাকীলালের সাহস আছে বলতে হবে। কেননা এই সব সময় পঞ্চ যদি মারপিট করে তো মুখিয়া সামলাবে না।

বুলাকীলাল বলল—তবে জীবনবাবুর বিচার করো তোমরা, সে যে দেওকির বউ রুকনির সঙ্গে লটর পটর করে, পঞ্চ তার কী ব্যবস্থা করেছে?
কী বাজে বকর বকর করছিস, জীবনবাবু কি মাধো সাহুর বস্তির লোক নাকি যে তার বিচার করবে পঞ্চ?
তবে রুকনির বিচার করো, সে হিম্মতও তো নেই তোমাদের। জীবনবাবু হাজরেবাবু। সব শালার টিকি বাঁধা আছে ওখানে কাজেই বিচার হবে না। সবাই ওখানে চোখ থাকতে কানা। আর আমাকে তোমরা পেয়েছ মেড়া আমার বিচার হবে—বাহা রে পঞ্চ!
পঞ্চ সুদ্ধ্ সবাই চুপ। মাধো সাহু খাটিয়া ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে এলেন। বুলাকীলালের চোখে চোখ রেখে খানিক দাঁড়িয়ে রইলেন—তারপর টেনে এক চড় বুলাকীলালের গালে। চুপ করে বুলাকীলাল গালে হাত বুলুতে বুলুতে দাঁড়িয়ে রইল বুদ্ধুর মতো, তখন আর কিছু বলার খ্যামতা নেই। পারবতীয়া কান্না থামিয়ে বোধহয় তাকিয়ে থাকলো মাধো সাহুর দিকে। পঞ্চের জমায়েত লোকেরা সব তারিফ করতে লাগলো মাধো সাহুকে—হাঁ, একেই বলে মুখিয়া। এমনি কড়া না হলে মহল্লা টিট্ থাকবে কেন? রাশ হাল্কা দিয়েছ কি সারা বস্তি শ্যামধারীর বউয়ের মতো বিগড়ে যাবে।
রায় দিল পঞ্চ। বুলাকীলালের তিরিশ রুপেয়া জরিমানা আর পঞ্চের সামনে হাতজোড় করে মাফি মাঙতে হবে ওকে। শ্যামধারীর বিশ রুপেয়া জরিমানা। পারবতীয়ার গায়ে হাত দিয়েছে পরপুরুষ তাই পঞ্চকে ডালভাত খাইয়ে জাতে উঠতে হবে তাকে।
কিন্তু টাকা কোথায় পাবে বুলাকীলাল, কোথায় পাবে শ্যামধারী। শ্যামধারীর তো এমনিই পারবতীয়াকে দেশ থেকে এনে অবধি দু-বার কর্জ করতে হয়েছে পারবতীয়ার বায়না মেটাতে। তা হোক তবু শ্যামধারী খুশি হয়েছে বিচারে। শালা বুলাকীলালের হাত জোড় করে মাফি মাঙার সময় পারবতীয়ার মুখ ফিরিয়ে নেওয়া হাসি দেখেই সে বুঝেছে যে বুলাকীলালের হয়ে গেল। মাধোলালের চড়টাও বেশ জমজমাট হয়েছে। না, পঞ্চ ঠিক বিচার করেছে। বুলাকীলালকে বেইজ্জত করে তার ইজ্জত ফিরিয়ে দিয়েছে পঞ্চ। টাকার ভাবনা কি মাধোলাল যতক্ষণ আছে। বুলাকীলালকে পরামর্শ দিল ছোটেলাল—যা, পা জড়িয়ে ধর গিয়ে মাধোলালের, দয়ার শরীর একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবেই।
বুলাকীলাল আর শ্যামধারী মাধো সাহুর কাছে হ্যাণ্ডনোট লিখে টাকা ধার করল।

পঞ্চের সব লোক বলল, মাধো সাহু ছিল তাই এ যাত্রা বেঁচে গেল ওরা নইলে সেই কেরামত কাবলেওয়ালার কাছে টাকা ধার করতে হত—এ তবু নিজেদের ঘরে ঘরে হয়ে গেল।

পঞ্চ শেষ হল। মাধো সাহু দলবল নিয়ে চলে গেলেন। পারবতীয়াকে নিয়ে শ্যামধারী চলে গেল ঘরে। বুলাকীলাল মেজাজ ঠাণ্ডা করতে চলে গেল বাজারে। চটকল বাজারের সব মন খারাপের শেষ কিনারা যেখানে হয় সেই বিন্দির গলির মোড়ের মাথায় পঞ্চি পানওয়ালীর দোকানের পাশের সরাবখানায় গিয়ে ঠেলে উঠল বুলাকীলাল। যে শনিবারের রাতে বুলাকীলালকে দেখা গেল বিন্দির গলিতে—দোস্ত শ্যামধারী আন্দাজ করি তখন পারবতীয়াকে সোহাগ করছে। আর বুলাকীলালের 'বেইমান পারবতীয়া' তখন শ্যামধারীর সঙ্গে হেসে গল্প করতে করতে লুটিয়ে পড়ছে। আজ রাতে শ্যামধারী জিতেছে। পারবতীয়াও রায় দিয়ে দিয়েছে বোধহয় আজ—বুলাকীলালের মাফ চাওয়া দেখে সে ঘেন্নায় মরে গেছে, এতনা ডরপোক আদমি সে দু-চোখে দেখতে পারে না।
সোমবার থেকে হপ্তা শুরু হল ফের। শ্যামধারী মিলে গেল—বুলাকীলালও গেল। কিন্তু এ আর সে বুলাকীলাল নয়। হাসি, বাঁশি, রঙতামাশা ছুটে গেল সব। শ্যামধারীর কাছ থেকে আলাদা হবার জন্যে সে ধীরুবাবুর কাছে আর্জি পেশ করল—হামকো দুসরা কাম দিজিয়ে। ধীরুবাবু ভাগ্ বলে ভাগিয়ে দিলেন তাকে।
দিন কাটতে লাগল। পারবতীয়া আর ভুলেও বুলাকীলালের কথা মুখে আনে না। শুধু শ্যামধারী হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারলো কী দামে সে পারবতীয়াকে জিতে এনেছে। টাকতি সুদ দিতে হয় কেরামতকে, টাকতি সুদ দিতে হয় মাধো সাহুকে। বাড়ি যা নিয়ে যায়—তা দিয়ে দুটো পেট চলে না। তবু চলে—চালাতে হয়। সাহুকে বস্তির ঘরের ভাড়া দিয়ে, টাকতি সুদ দিয়ে মাসখানেক বাদে আবার মাধো সাহুর কাছেই হাত পাততে হল—ফের ধার দাও, ফের হ্যাণ্ডনোট লেখো। শ্যামধারী কুস্তির দঙ্গল ছেড়ে দিল। রোজ বিকেলে শ্যামধারীর বুকে দরদ, এতে আর কুস্তি হয় না। শুক্রবার সন্ধ্যে হলেই সাহু একবার করে মহল্লাটা ঘুরে যান। পারবতীয়া ঘোমটা টেনে চুপ করে বসে থাকে। সাহুকে তার পাওনা মিটিয়ে দিয়ে শ্যামধারীও খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে থাকে চুপচাপ। বুলাকীলাল একা আদমি, ততক্ষণ চলে গেছে বিন্দির গলির মোড়ে।

সে তখনো পারবতীয়ার কথা ভোলেনি।

চটকল বাজারে কেউ কারুর কথা মনে রাখে না। কে মনে রাখে বকুলবালার কথা। কে মনে রাখে দুলালচাঁদের কথা। এ বেলার হুজুত ও বেলা ভুলে যাওয়াই চটকল বাজারের স্বভাব। কাদামাটিতে দাগ পড়ে—কিন্তু নবগঞ্জের ধুলোয় যদি দাগ কাটতে যাও বলব তুমি বোকা, তুমি বুদ্ধু—ধুলোর দাগ এই আছে, ঐ দেখুন হাওয়ায় উড়ে গেছে—সব ফক্কা। বুলাকীলাল বুদ্ধু সে পারবতীয়ার কথা ধরেই রেখে দিল।

সবচেয়ে কড়া বিষ দুনিয়ায় কী জানেন—মতিচাঁদ বলেছিল, রিষের বিষ। বড়ো বড়ো গাছ সটান দাঁড়িয়ে থাকে দেখে বোঝা যায় না, ভেতরটা ফোঁপরা করে ফেলেছে কুরে কুরে পোকায়, রিষের বিষ তেমনি। আস্তো টাট্‌কা মানুষকে যদি লাট খাইয়ে ভোকাটা করে দিতে চান রিষের বিষ পুরে দিন তার মনে—সে ফরসা হয়ে যাবে দেখতে দেখতে। শ্যামধারী পারবতীয়াকে বুলাকীলালের কবলে বেহাত হয়ে যেতে দেখে রিষের বিষে জ্বলে জ্বলে মরছিল। পারবতীয়ার হাসি, তার দিল, তার পিরিত সব সে জিতে নিল নিজের তাগদে--কিন্তু দাম দিতে হল তাকে। বিনা দামে সম্‌সারে ঘরের পরিবারকেও নিজের পাশে পাবেন না।

এখন বুলাকীলাল জ্বলতে লাগল ধিক ধিক তুষের মতন। ওর ঘর থেকে পারবতীয়ার ঘর দেখা যায়। পারবতীয়া হাসে। শ্যামধারী হাসে। পারবতীয়া হয়তো বুলাকীলালকে দেখিয়ে দেখিয়ে হাসে—ভুলেও বুলাকীলালের দিকে তাকায় না। ওর নামে এখন থুথু ফেলে পারবতীয়া—ছিঃ ওর সঙ্গে আস্‌নাইয়ের জন্যে মাফি মেঙেছে, এতনা ডরপোঁক ছিঃ। শ্যামধারী ভাবে ঠিক হ্যায়—চিত করে দিয়েছি বুলাকীলালকে। বুলাকীলাল ভাবে আচ্ছা, এ চটকল বাজার, এখানে আকাশে হাজার কেরামতি, দেখা যায়গা।

সেদিন হোলির বিকেল।

হোলির বিকেলে চটকল বাজারের রঙ পাল্টে যায়। সকালবেলা নবগঞ্জ আর জামতলির ভদ্দরপাড়ার বাবুছেলেরা কুটি কুটি ধুতি আর জানলা-বাহার গেঞ্জি পরে রঙ খেলেছে। দুপুর হতে না হতেই ঢোলক কর্‌তাল আর পিচকিরি নিয়ে দঙ্গলে দঙ্গলে পশ্চিমা মজুরের দল হোলি খেলতে বেরোয়। এদিন

চটকলে ছুটি। লাল আবিরে চাপা পড়ে যায় কয়লাকঠিন কালো রঙ। লাল রঙে রেঙে যায় নতুন সাদা পিরান। বস্তিতে মহল্লায় উদ্দাম ঢোল পিটুনি, কত্তালের ঝমঝমি আর পিচকিরির ফোয়ারা। লাল হয়ে যায় নবগঞ্জের জামতলির মাটি। গঙ্গামাটি ঘষে রঙ তোলা হবে সে কাল সকালে। আজ রঙ লাগাও, আবির মাখাও দোস্ত দুশমন সবাইকে।

আজ অ্যাসটন সায়েবও ভালো লোক। মিউনিসিপ্যালিটির বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে সায়েব, আর চটকলের তা-বড় তা-বড় সর্দারেরা পয়সা খরচ করে কেনা পাউডারের সঙ্গে নামমাত্র ফাগ্ মিশিয়ে সায়েবের কপালে আলতো করে ফোঁটা দেয়। সায়েব বখশিশ দেয় ছ-আনা, চার আনা। আজ সবাই ভালো।

মাঝে মাঝে অশ্লীল খেউড় আর হোলির ছ্যারারা—নবগঞ্জের ধুলোয় আজ রঙের কাদা গোলা হয়।

শুধু এই ফাঁকতাল্লায়, হৈ হুল্লোড়ের মাঝখানে বুলাকীলাল কী করে যেন ফাটিয়ে ফেলল নাক। কী করে যে ফাটিয়ে ফেলল সে খবর ঠিকঠিক কেউ জানে না। কানাঘুষো শোনা গেল একটা। বলে বুলাকীলাল গিয়েছিল নাকি পারবতীয়ার ঘরে পারবতীয়াকে রঙ লাগাতে। জান্‌কির মা দেখেছিল। সে বলে যে সে আর কিছু দেখেনি—শুধু দেখেছিল পিচকিরি হাতে উল্লুকের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে বুলাকীলাল। ঘরে আর কেউ ছিল না। শ্যামধারী গিয়েছিল হোলির মিছিলে। বস্তিও তখন ফাঁকা। সবাই ব্যস্ত হোলির হুল্লোড়ে। ওদিকে অশথতলা থেকে মিশিরজীদের ঢোলক, কত্তাল আর খচমচ গান কানে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। বুলাকীলাল কী বলল জান্‌কির মা তা শোনেনি, পারবতীয়ার জবাবও জান্‌কির মায়ের কানে ঢোকেনি। তবে জানকির মা দেখেছিল পারবতীয়া গোহমনা সাপের মতো ফোঁস ফোঁস করছিল—বুলাকীলাল নেশা করেছিল এটা অবশ্য জান্‌কির মা হলফ করে বলতে পারে না তবে মাথা বোঝাই আবির, গা বোঝাই রঙ নিয়ে টলতে টলতে পারবতীয়ার দিকে এগিয়ে গেল বুলাকীলাল এটা সে দেখেছে। পারবতীয়া দু-পা পিছিয়ে গিয়ে পেতলের লোটাখানা তুলে নিয়ে সটান এক ঘা বসিয়ে দিল বুলাকীলালের কপালে। কপাল চেপে ধরে বুলাকীলাল তবু নাছোড়। পারবতীয়াকে এক ঝটকানে জাপটে নিয়ে সে ঘরের মধ্যে চলে যাবে। তখন পারবতীয়া চেঁচাতে শুরু করেছে—আর জানকির মা ডেকে নিয়ে এসেছে মিশিরজীদের।

পিটিয়ে বুলাকীলালকে সবাই মিলে মাটি ধরিয়ে দিলে। সব ঠেঙানি মুখটি বুঁজে সহ্য করল সে। শুধু বিষদৃষ্টিতে তাকিয়ে যাবার সময় রক্তমাখা, আবির মাখা, রঙমাখা বুলাকীলাল পারবতীয়াকে বলে গেল—আচ্ছা, ঠিক হ্যায়, দেখা যায় গা তুমহারা হিম্মত। পারবতীয়া বলল—তু যা যা সড়ককা কুত্তা।

বুলাকীলাল নেশা করে বিন্দির গলি ঝাঁকিয়ে তুলল সেদিন বিকেলে। মাধো সাহু, শ্যামধারী, ধীরুবাবুর সবায়ের তিনকুল উদ্ধার করে দিতে লাগল গালাগাল দিয়ে আর খিস্তি করে। বুলাকীলালের কপাল দরদ, শির দরদ, দিল দরদ—সবই যেন ঘুচে যাবে এই গালাগালের তোড়ে।

বুলাকীলালের নেশা ভেঙে গেল সন্ধ্যে হব হব সময়ে। নবগঞ্জের বড়ো রাস্তায় এক মাল বোঝাই লরি হঠাৎ চাপা দিয়ে গেল মনোহর মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের সামনে একটা কুকুরকে। থ্যাঁতলানো কুকুরটা খানিকক্ষণ কেঁউ কেঁউ করে শেষ হয়ে গেল টানটান হয়ে পা ছড়িয়ে। লরিটা তো উধাও হল চক্ষের নিমেষে—থ্যাঁতলানো কুকুরটাকে ঘিরে ভিড় জমে গেল দেখতে দেখতে। চটকল বাজারে কাকচিল বসলেও ভিড় জমে কাজেই থ্যাঁতলানো কুকুরটাকে দেখার জন্যে ভিড় তো জমবেই। নেশা ছুটে গিয়ে বুলাকীলাল তাকিয়ে রইল কুকুরটার দিকে—চোখটা বড়ো বড়ো করে সে একদৃষ্টে কুকুরটাকে দেখতে দেখতে বলল—ঠিক হ্যায়, দেখা যায় গা তুমহারা হিম্মত।

ফিরেদিন সোমবার। মিল চালু হয়েছে। হোলির রঙ তখনো সবায়ের গায়ে মাথায়। নেশা তখনো মগজে। হঠাৎ বেলা দশটা নাগাদ মিলগেটের বাইরে যারা নানান তালে ঘোরা ফেরা করত তারা গুদামঘরের সামনে একটা দারুণ হৈচৈ শুনতে পেল। গেট পেরিয়ে কেউ কেউ ঢুকে পড়তে যাবে এমন সময় বড়ো সায়েবের বারান্দা থেকে অ্যাসটনের গলা শোনা গেল—দ্রোয়ান, গেট বন্ধ কর দেও। গরগর শব্দ করে বুথ অ্যাণ্ড হেণ্ডারসনের বিরাট মিলফটক বন্ধ করে দিল দুই দরোয়ান। দোসরা হুকুম শোনা গেল অ্যাসটনের—কোইকো বাহার যানে মৎ দেও। গুদামঘরের সামনে ভিড়। কী ঘটেছে দেখার জন্যে লাল টাই দুলিয়ে লম্বা নাক সামনের দিকে দোলাতে দোলাতে বারান্দা থেকে নেমে এলেন অ্যাসটন।—ধীরুবাবু কাঁহা হ্যায়। বড়োবাবু ব্যস্ত হয়ে পড়লেন—ধীরুবাবু কোথায়? চাপরাশি ছুটল—ধীরুবাবু কোথায়। ওদিকে পেষাই ঘর

থেকে, হাতিকল থেকে, মাগী ডিপার্ট থেকে, গিয়ান মেসিন থেকে ছুটে আসছে লোক গুদামঘরের সামনে—খুন হো গিয়া। ক্যা হুয়া, কোন্ খুন হুয়া। মাগী ডিপার্টের, সেলাইঘরের মেয়েগুলো ভয়ে কাঁদতে শুরু করেছে, আর গেটের বাইরে হাজার লোক গেট ধরে ঝুঁকে পড়েছে—কাকুতি মিনতি করছে দরোয়ানকে—কী হয়েছে দরোয়ানজী। অ্যাসটনের তেসরা গলা শোনা গেল—চিপরাশি, দরোয়ান লোককো বোলাও। দরোয়ানেরা তৈরি হয়েই ছিল, লাঠি নিয়ে হাজির হল। দাঁতে পাইপ চেপে ধরে অ্যাসটন হুকুম দিল বুড়ো আঙুলটা বেঁকিয়ে – ভিড় হটা দেও।

বচসা গোলমালের মাঝখানে কে কি বলছে শোনা গেল না। বাইরে থেকে দেখা গেল শুধু দরোয়ানেরা যত ভিড় হটাতে চাইছে তত ভিড় বেড়ে যাচ্ছে। একজনকে সরায় তো পাঁচজন এসে হাজির হয়। ধীরুবাবু আর অ্যাসটন সাহেব হাজরিবাবু কাটিকেষ্ট মিত্তিরকে নিয়ে হাত মুখ নেড়ে কী কথা সব বলছিলেন, এদিকে বাইরের লোক গেট ধরে চাপ দিতে লাগল—খোলো গেট, নেই তো তোড় দুঙ্গা ফাটক। অ্যাসটন এগিয়ে এলেন গেটের দিকে—দরোয়ান-দের পেছন থেকে বললেন—কোই আদমি এক কদম বাঢ়ে গা তো জান খতম হো যায়ে গা, হুঁশিয়ার। কানে আঙুল দেওয়া খিস্তির ঝড় বয়ে গেল বাইরে।

ভেতরে দরোয়ানেরা ততক্ষণে ভিড় সরিয়ে ফেলেছে।

ভিড় সরে যেতেই বাইরের হাজার আদমি দেখতে পেল—শ্যামধারী বিরাট এক সাতমনী পাটের গাঁটের তলায় চাপা পড়ে রয়েছে।—তখনো গোঙাচ্ছে, ওঠার চেষ্টা করছে। বুলাকীলালকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে দরোয়ানেরা ম্যানেজারের ঘরের দিকে। আর কেবল পাটের গাঁট চাপা পড়েই শেষ হয়নি জখম—পিছু হটছিল লরি তারই চাকা শ্যামধারীর পায়ের ওপর। এক লহমায় মিলগেটের বাইরের হাজার আদমির চেঁচামেচি থেমে গেল—সব চুপ। শুধু মোড়ের মাথা থেকে শোনা গেল বুক-ফাটানো কান্না। কাঁদতে কাঁদতে ছুটে আসছে পারবতীয়া। ভিড় আর একবার গর্জে উঠল—খোল্ দেও ফাটক। পারবতীয়া দাঁড়িয়ে রইল ফটকের এধারে। প্রায় বেহুঁশ শ্যামধারীকে সায়েবের আপিস ঘরের দিকে তুলে নিয়ে গেল ওরা—সঙ্গে কাটিকেষ্ট মিত্তির আর ধীরুবাবু।

তখন পারবতীয়া মাথা ঠুকছে মিলগেটে, ভিড়ের লোকেরা যোগাড় করছে ইঁট, পাটকেল, ডাণ্ডা। একটু পরে পান চিবুতে চিবুতে দারোগাবাবু এলেন

হেলতে দুলতে—সঙ্গে দুজন সিপাই। ভিড় পাতলা হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে—পুলিসে সেকালে বড়ো ভয় ছিল সবার।
আরো অনেক পরে এল হাসপাতাল গাড়ি।

কী হয়েছিল ঠিক করে কেউ বলতে পারে না।
কেউ বলে বুলাকীলালের শয়তানী। পারবতীয়ার ওপর বদলা নেবার জন্যে বুলাকীলাল ছেড়ে দিয়েছিল হাত। কেউ বলল, বুলাকীলাল নেশা করেছিল, পা বাধিয়ে ফেলে দিয়েছে শ্যামধারীকে। কেউ বলল—না, কারুর দোষ নেই। লরি পিছু হটছিল, চোট লেগেছিল, তাইতে পড়ে গিয়েছে শ্যামধারী, বুলাকীলাল ছিটকে পার পেয়ে গেছে। কেউ বলে—না, শ্যামধারীই ইদানীং দারুণ দুব্‌লা হয়ে পড়েছিল, ঘাড় শক্ত রাখতে পারেনি। ঠিক করে কিছু বোঝা গেল না।
কাদের আলির কাছে খবর শুনলাম হাজরিবাবু কাটিকেষ্ট মিত্তির সেদিন অনেক রাত অবধি সায়েবের বাংলোয় ছিল। খাতাপত্তর বয়ে নিয়ে গেল দু-দুবার সায়েবের আপিসের খাস চাপরাশি। আপিস আর বাংলোয় হাঁটাহাঁটি করেছিল সায়েবের বড়োবাবু। সন্ধ্যে কেটে গেল, রাত অনেক হল, সায়েব হাসিমুখে কাটিকেষ্ট মিত্তিরকে গাড়িতে চাপিয়ে দিলেন—বড়োবাবুকে এগিয়ে দিলেন। কাটিকেষ্টর পিঠ চাপড়ে দিলেন অ্যাসটন সায়েব।
পরের দিন বুলাকীলালের চাকরি গেল।—তুরন্ত চলা যাও মিলকো বাহার। বুলাকীলাল আর শ্যামধারীর জায়গায় দুটো লোক ভর্তি করে ফেলা হল।
আর সবচেয়ে তাজ্জব ব্যাপার কী জানেন? শ্যামধারীর নামে দেখা গেল হাত হপ্তা তুলে নিয়েছে সে—স্পষ্ট টিপ্‌ সই দেওয়া রয়েছে শ্যামধারীর, মস্ত বড়ো হপ্তা খাতায়। ভিড় সরিয়ে ঐ কম্ম করেছিলেন অ্যাসটন সায়েব কাটিকেষ্ট মিত্তির আর ধীরুবাবুকে দিয়ে—শ্যামধারীকে তার নিজের আপিস ঘরে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন ঐ মতলবে।—এই কথা নবগঞ্জের তামাম লোক ক-দিন ধরে বলেছিল। সত্যি মিথ্যে ভগবান জানেন।
তাই নাকি ডাক্তার আনতে দেরি হয়েছিল। তাই নাকি হাসপাতাল গাড়ি পৌঁচেছিল অত দেরিতে।

দিন চলতে লাগল যেমন চলছিল।
নবগঞ্জের চটকল বাজারে শ্যামধারীর জখমের কথা দু-দিনের বেশি তিন দিন কারো

মনে রইল না। চটকলের বাঁশি যেমন বাজে তেমনি বাজল। জামতলি, নবগঞ্জ, বিন্দির গলি, কুলি লাইন, সায়েব কোয়ার্টার্স জট-পাকানো সুতুলির মতো জট এখানটায় ছাড়ে তো ওখানটায় জড়ায়। মাধো সাহু টাকতি সুদ আদায় করে বেড়াতে লাগলেন। লিখতে লাগলেন হ্যাণ্ডনোট। অ্যাসটনের দ্বিতীয় পক্ষ নিয়ে আবার খানিকটা কেচ্ছা শোনা গেল। সকাল দুপুর সন্ধ্যে—হপ্তাবারের হুল্লোড়—শনিবারের রাত—নবগঞ্জের সবরকম মজাদার খেলা সমানে চলতে লাগল একটানা। জোয়ারে টগবগ, ভাঁটায় ছিমছিম গঙ্গা সমানে বয়ে চলল। পারবতীয়া কেঁদে কেঁদে দু দিন হাসপাতাল ঘর করলো, তারও দু-দিন পরে চুপ করে গেল। মাধো সাহু আর ধার দেবে না। মুদাইন আর কর্জ দেবে না। পারবতীয়া এখন কী করে!

তারও কিছুদিন বাদে পারবতীয়া কোথায় যেন চলে গেল। কোথায় যে গেল কেউ ঠিক বলতে পারলো না। কেউ বলল—মুলুক চলে গেছে। কেউ বলল, কামারহাটিতে ওর আপনার লোক আছে সেখানে গেছে। আবার কেউ বলল—না, মাধো সাহু মাটির মানুষ, দয়ার শরীর, তিনি বলেছিলেন—পারবতীয়া, ঘর ভাড়াও তো অনেক বাকি পড়ে গেল, দেনা না হয় বাদই দিলাম। কোথায় একা একা মরবি ঘুরে আর চটকল বাজার বহুৎ খারাপ জায়গা। এক এক আদমি এক এক কিসিম। তুই চল, তোকে আমার ভাতিজার মকানে রেখে আসি। সেখানে দু-বেলা পেট পুরে খেতে তো পাবি। পারবতীয়া তাই সেখানেই গেছে। ভাতিজা থাকে কোথায়? সে কেউ জানে না, আর কে জিগ্যেস করতে যাবে বাবা মাধো সাহুকে, যা রাগী লোক, চড় বসিয়ে দেবে হয়তো। পারবতীয়া চলে যাবার পর ঐ ঘরে এসেছে গন্নুয়া। ভারী ভালো লোক। মিঠে আদমি।

পারবতীয়ার কথা সবায়ের মনে পড়ল দু-মাস পরে। কেরাচ বগলে—শ্যামধারী যখন হাসপাতাল থেকে ফিরে এল একটামাত্র পা নিয়ে তখন। শ্যামধারী সটান নিজের ঘরের সামনে এসে নাকি ডেকেছিল পারবতীয়ার নাম ধরে। গন্নুয়া বেরিয়ে এসেছিল। এর ওর মুখে ও পারবতীয়ার খোঁজ করেছিল, কেউ ঠিক জানে না। সাহু বলল—হয়েছিল একটা ঐ রকম কথা বটে, কিন্তু তার আগেই পারবতীয়া চলে গেছে। দু-পাঁচজন বদমাশ লোক বলল—সাহু গিলে ফেলেছে মেয়েটাকে, নইলে সে যাবে কোথায়? এও নাকি সাহুর একটা ব্যবসা, মেয়ে পাচার করা। শ্যামধারী বোকার মতন ঘরের সামনে বসে রইল। সাহু তাকে হ্যাণ্ডনোটের কথাটা একবার মনে করিয়ে দিল।

কেরাচ বগলে শ্যামধারী অ্যাসটন সায়েবের কামরায় দেখা করতে গেল। অ্যাসটন সাহেব বলল—তুম হামারা আদমি নেহি থা, তোম ঠিকাদারকা আদমি থা, ঠিকাদারকো পাশ যাও। আউর তুম তো হাত হপ্তা উঠা লিয়া—যাও।

ঠিকাদার ধীরুবাবু। তিনি পান চিবুতে চিবুতে বললেন—দূর বোকা, তুই কি আমার কাজ করতে গিয়ে জখম হয়েছিস না কোম্পানির কাজ? কোম্পানির কাজ—যা কোম্পানিকে ধর গিয়ে। আর তাছাড়া তুই তো হাত হপ্তা তুলে নিয়েছিস, সায়েব বলেছে আমায়।

শ্যামধারী বলল—কোম্পানি ভেজ দিয়া তুমারা পাশ।

ধীরুবাবু বললেন—ঠিক হ্যায়, হাম তোমকো ফিন ভেজ দেতা কোম্পানিকো পাশ, যাও। শ্যামধারী আবার গেল অ্যাসটনের কাছে, বলল—সাব, হাম জখমী ভাতা নেহি মাঙতা, হামকো একঠো যো কুছ নোকরি ওয়াপস্ দিজিয়ে। সে বলল—সাব, আমার পা গেছে, জরু গেছে, ঘর গেছে। তুম একঠো নোকরি দেও, যো কুছ নোকরি, আমি আবার সব ফিরে পাবো। হপ্তা পেলে আমার তাগদ ফিরে আসবে—শনিচর আর এতোয়াররমে আমি তামাম চটকল বাজার বজবজসে হাজিনগর তক ঢুঁড়ে বেড়াব আমার জরুকে। একঠো কাম দেও।

সায়েব বললেন—বড়াবাবো, কাহে ইস্‌কো আপিসকা অন্দরমে ঘুসনে দিয়া? বড়োবাবু ডাকলেন—চাপরাশি, কাহে তোম ইসকো দরওয়াজামে রোখা নেই? অ্যাসটন সায়েব শ্যামধারীকে আঙুল দেখিয়ে বললেন—যাও, বাহার যাও।

মতিচাঁদ বলল—জানেন এ গল্পের আর সবটাই আমার এর ওর তার কাছে শোনা। শুধু শ্যামধারীকে যখন মিলগেটের বাইরে বার করে দিল মিলের দরোয়ানেরা তখন আমি কাদের আলিকে পৌঁছে দিয়ে ফেরত যাচ্ছিলাম। ওকে বাইরে বার করে দিতেই ও এসে পড়ল একেবারে আমার ঘোড়ার গাড়ির সামনে। রাশ টেনে ধরে গাড়ি সামলে নিলাম। শ্যামধারী কেরাচ বগলে মিলগেটের দিকে মুখ করে ঠকঠক করে কাঁপছে তখন রাগে। শ্যামধারীর সেই মূর্তিটাই আমি নিজের চোখে দেখেছিলাম। ও যা বলেছিল সেটাই নিজের কানে শুনেছিলাম। ও বলল—হা ভগবান, বিচার নেহি হ্যায় এ দুনিয়ামে। হামকো ঘর গিয়া, রুজি গিয়া, জরু চলা গিয়া, একঠো পাও ছুট গিয়া, আউর হাম একঠো নোকরি ভিখ মাঙতা, তোম হামকো সড়ককা কুত্তাকা মাফিক ভাগা

দেতা, হায় ভগবান। লেকিন শুনো বেইমান, বিচার হ্যায়, কঁহি না কঁহি কোই কিসিমকো বিচার এ ছুনিয়ামে হোঙ্গে, একরোজ তুমহারা ভি বিচার হোগি।

তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। মিলের ভেতরে দরোয়ানদের কেউ কেউ বাঁড়ুজ্যেদের সেই পুরনো পোড়া শিব মন্দিরের বারান্দায় ঝোলানো ঘণ্টাটা একবার ছলিয়ে দিল—শিবকে জাগানোর জন্তে—ঢং ঢং—ঢং ঢং। শ্যামধারী আস্তে আস্তে মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠে গেল। কেরাচ বগল থেকে নামিয়ে—হঠাৎ কথাবার্তা নেই, ঠকাস ঠকাস করে মাথা ঠুকতে লাগলো পাথরের দালানে। হৈ চৈ করে উঠলো দরোয়ানেরা। বাবুরা বেরিয়ে এলেন। ওখান থেকে টেনে ওকে রাস্তার ওপর দিয়ে গেল সবাই। আমি ওকে আমার গাড়িতে বসিয়ে পৌঁছে দিলাম মাধো সাহুর বস্তিতে।

মতিচাঁদ বলল—নবগঞ্জের লোকেরা বলে এই শ্যামধারীর শাপ লেগেছিল অ্যাসটনের সংসারে।

আমি বললাম—কিন্তু তাতে শ্যামধারীর কী লাভ ?

কিছু না। চটকল যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগল। বুথ অ্যাণ্ড হেণ্ডারসনের পাট গুদামে তেমনি পাটের গাঁট জমতে লাগল। সেখান থেকে হাতিকল, হাতিকল থেকে ফুকানলি, ফুকানলি থেকে মাগী ডিপার্ট, গিরান মেসিন, ইস্প্রিং ঘর, রিপু ঘর, পেষাই ঘর পেরিয়ে জেটি। জেটিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইস্টিমার। ইস্টিমারের লাগোয়া গাদা বোটে বোঝাই হয়ে চট বস্তা চলল কলকাতা। কলকাতা থেকে জাহাজ বোঝাই হয়ে চলে যাবে অথৈ দরিয়া পেরিয়ে ভিন্ দেশে। কে শ্যামধারী, কোথায় নবগঞ্জ, কবে তার পা কেটে গেছে কেউ সে খবর রাখে না।

নবগঞ্জের জীবনযাত্রায় কোনো ব্যত্যয় নেই। বিকিকিনির হাটের মানুষ সমান ব্যস্ততা আর ব্যগ্রতা নিয়ে দম বন্ধ করে ছুটে বেড়াতে লাগল। কেউ কানাকড়ি খেলে জমিয়ে তুললে কড়ির পাহাড়, কেউ মুঠো মুঠো কড়ি নিয়ে বেসাতি করতে এসে ফিরে গেল কানাকড়িটাও হারিয়ে। কেউ বিকিকিনির জোয়ালো নেশায় বুঁদ হয়ে বেঁচে ফেলল ইমান—কেউ ইমানকে বাঁচাতে গিয়ে হারিয়ে বসল জিন্দিগী। উপনগরের উপকথা তো ছেলে-ভোলানো রূপকথা নয় যে

গল্পের শেষে বলবো সুখে স্বচ্ছন্দে তারা ঘরকন্না করতে লাগল—এ উপসর্গের দেশের উপকথা। এর স্বভাব স্বতন্ত্র।

মাধো সাহুর একখানা পাকা বাড়ি উঠল। ধীরুবাবুর ধানকলের ভিত উঠতে লাগল গঙ্গার ধারে। মাঝে বকুলবালার পোড়া দালানটা আরেকবার হাতাবার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন ধীরুবাবু। খদ্দের দেখলেন ওটাকে বেচে দেবেন বলে। খদ্দেররা সব বাড়ি দেখে পিছিয়ে গেল—একে পোড়া বাড়ি তায় অভিসম্পাতের দাগ আছে এর গায়ে। মিউনিসিপ্যালটি ওটাকে ভেঙে ফেলার জন্যে উঠে পড়ে লাগল—আবার কী ভেবে সবাই যেন ঝিমিয়ে পড়ল। ওটা যেমন ছিল তেমনই রইল। বিন্দির গলির সন্ধ্যে বেলায় হল্লোড় সামনে চলতে লাগল। একদিন পুলিস এসে ধরে নিয়ে গেল খেঁদি বাড়িউলিকে। কোথাকার একটা ছোট মেয়েকে ফুসলে নিয়ে এসেছিল তারি ফইজতে পড়ল সে।

মাধো সাহুর বস্তি থেকে উঠে গেল শ্যামধারী। গঙ্গার ধারে ত্রিভুবনের ধাওড়ায় একটা ভাঙা ঘরে শ্যামধারী খাটিয়া পেতে পড়ে থাকত রাত্রে। মিউনিসিপ্যালটির পাকা রাস্তা হবে বলে তখন রাস্তায় খোয়া ভাঙার দিন মজুরির কাজ পাওয়া যেত। দিনে শ্যামধারী শিকের মাথায় ছাতা আটকে খোয়া ভাঙত। ত্রিভুবনের বস্তির নিচেই গঙ্গা। অনেক রাতে কেরাচ বগলে শ্যামধারী ঘাটের পইঠায় গিয়ে বসত। আর এক এক দিন অবসর পেলে চলে যেত এক একদিকে। যদি তালাশ মেলে পারবতীয়ার। কিন্তু না, চটকল বাজার রাক্ষসের মতো খেয়ে ফেলেছিল সেই ষোলো বছরের মেয়েটাকে।

অ্যাসটন সায়েরের মেম আর কলকাতা থেকে ফেরেনি। ম্যাক্‌ফারসন মোটর নিয়ে মাঝে মাঝে কলকাতা যেত। কাদের আলির খবর ছিল—অ্যাসটন সায়েবের দ্বিতীয় পক্ষ এবার একটা দ্বিতীয় পক্ষ কাড়বে—লোকটা হবে ম্যাকফারসন।

কিন্তু অ্যাসটন সায়েব তখন ভারী ব্যস্ত। সামনে আসছিল মিউনিসিপ্যালটির ভোট। সেবারে ভোটে কী হবে বলা শক্ত ছিল—মুখুজ্যে আর ভটচায্যিরা দু-দলেরই শক্তি সেবার সমান সমান। রোজ মিটিং বসত অ্যাসটনের বাংলোর সামনের লনে মালবেরি গাছের তলায়। সতু বোস একটা পুরনো টিনের ঘর ভাড়া নিয়ে কংগ্রেস আপিস খুলে বসল। কতকগুলো বেপরোয়া ছেলে জুটলো—দিনকতক শহরের অভিভাবকেরা সতু বোসের নামে তেলে-বেগুনে জ্বলতে লাগলেন। তারপর সব জ্বলুনি যেমন ঠাণ্ডা হয়—এ জ্বলুনিও ঠাণ্ডা

হয়ে গেল। ছেলের দলও তেমন তেমন হুজ্জুত সামনে নেই দেখে গা ঢিলে দিল। ধুনি জ্বালিয়ে বসে রইল একা সতু বোস। বুধোর জেলখাটা তখনও শেষ হয়নি।

ল্যাম্পপোস্টের ভুতুড়ে আলোর আমল নবগঞ্জে শেষ হয়ে এল! সেবার শোনা গেল ভোট হয়ে গেলেই ইলেকট্রিক লাইট হবে। মই বগলে তেলের টিন হাতে আলো জ্বালিয়ে বেড়াত যে লোকটা তার ভাবনা শুরু হল আমার কী হবে। আরো শোনা গেল—ভিস্তিতে চামড়ার থলি করে এতদিন যে জল ছিটোনো হচ্ছিল রাস্তায় তা বন্ধ হয়ে যাবে। লরিতে জলের ট্যাঙ্ক বসিয়ে ঝাঁঝরি দিয়ে রাস্তার ধুলো মারা হবে ঠিক হল। আরো শোনা গেল একদিন—শহরে বাস সার্ভিস চালু হবে মহকুমা থেকে যে রাস্তা সটান নবগঞ্জে এসেছে সেই রাস্তা বরাবর—বুঝতেই পারছেন খবরটা মতিচাঁদের ভালো লাগেনি।

বিকিকিনির হাটের জাবেদা খাতায় অনেক জমা অনেক খরচ লেখা হতে লাগল। এমনি একদিন এরই মধ্যে নেপাল রায়ের জমাখরচের ঢেরা পড়ে গেল—হিসেব খতম। ইদানীং নেপাল রায় বুকের ব্যারামে ভুগছিলেন। সে বছর পোষ মাসে একদিন সকালে খানিকক্ষণ বাড়িসুদ্ধ লোকের দুর্ভাবনা বাড়িয়ে, ডাক্তার বদ্যি, টেলিগ্রাম, কুটুম-সাক্ষাৎ সকলকেই ব্যস্তসমস্ত উদ্ব্যস্ত করে বিকেল নাগাদ নেপাল রায় সরে পড়লেন নবগঞ্জ থেকে—সব লীলাখেলা শেষ করে।

মতিচাঁদ নেপাল রায়ের শেষ গল্পটাও বলেছিল। বিকিকিনির হাট যদি রীতিমতো উপন্যাস হত তাহলে এ গল্প তারিয়ে তারিয়ে বলা যেত। নয় যখন সংক্ষেপেই বলে দিই। বুকের ব্যারাম হবার পর থেকেই নেপালবাবু কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলেন। পেল্লায় মোটাসোটা মানুষটা ভোম্ হয়ে বসে থাকতেন আধখানা ব্যাঁকা মুখ নিয়ে। মতিচাঁদ বলেছিল যে শুনেছি বাড়ির লোকজন কারুর সঙ্গেই নাকি বেশি কথাবার্তা কইতেন না। বেরুতেনও না বাড়ি থেকে আর। কেবল মরে যাবার মাসখানেক আগে একদিন বিকেলবেলা চাকর দিয়ে আমাকে ডেকে পাঠালেন। গেলাম। বললেন—গাড়ি এনেছিস? আমি বললাম, এনেছি। আস্তে আস্তে এসে গাড়িতে উঠলেন, বললেন—চল্। জিগ্যেস করলাম—কোথায় যাব, বাবু? লক্ষ্মীর

ওখানে চল্। একটু থতিয়ে গেলাম। লক্ষ্মীর ওখানে? এতদিন বাদে আবার? যাই হোক আমি তো হুকুমের চাকর, চালালাম গাড়ি বিন্দির গলির দিকে। গাড়ি নিয়ে বাইরের রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলাম। দুলালের মায়ের ঘরে গিয়েছিলেন তিনি। আমি নিজের চোখে দেখিনি। বিনি দেখেছিল আর অবাক হয়ে গিয়েছিল অ্যাদ্দিন বাদে নেপালবাবুকে দেখে। আড়ি পেতে শুনেছিল নেপাল রায়ের কথাবার্তা। বিনি বলেছিল লালমোহনকে। লালমোহন বলেছিল আমায়।

বিনি দেখেছিল নেপালবাবু উঠোন পেরিয়ে যেমন করে সেই আগেকার কালে এ বাড়িতে দুলালের মায়ের দাওয়ায় গিয়ে উঠতেন ঠিক তেমনি করেই দাওয়ায় গিয়ে উঠলেন। জুতোর শব্দ শুনে দুলালের মা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। চৌকাঠের ওপর দাঁড়াতেই সে হকচকিয়ে গেল।—এ কে? নেপালবাবু সেই কবে আসতেন আবার এই আজ এসেছেন। কিন্তু আজকের আসার সঙ্গে আর কোনোদিনের আসা মেলে না। চুপ করে দুজনেই খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর নেপালবাবু ডাকলেন—লক্ষ্মী।

এ নাম অনেকদিন বাদে সে শুনল। অনেকদিন বাদে তাকে তার নতুন বয়সের মানুষ এসে ডাকল তার নিজের নাম ধরে। মতিচাঁদ বলল—জানেন বাবু, বিনি বলেছিল যে সেই প্রথম সে দুলালের মাকে কাঁদতে দেখল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

আমি বোকার মতো জিজ্ঞাসা করলাম—কেন এতদিন বাদে কাঁদল কেন?

মতিচাঁদ বলল—কাঁদবে না। ধর্ম্মে হোক, অধর্ম্মে হোক, ঘেন্নায় হোক, লোভে হোক, একদিন তার শরীরটাকে তো এই মানুষটাকেই সে দিয়েছিল। মেয়েমানুষ সব ভুলতে পারে শুধু ভুলতে পারে না সেই মানুষটাকে একদিন যার দেওয়া ছেলে সে পেটে ধরেছিল। আজ সে ছেলেটা নেই। সেই মানুষটাকে দেখে তার দেওয়া ছেলেটার কথাই তো সেদিন বুকে বেশি করে বাজবে, বাবু।

কী বললেন নেপালবাবু?

কিছু না। তাঁর নিজের চোখেও জল এসে গিয়েছিল। শুধু বললেন, দুলালের মা। এ ডাক শুনে দুলালের মা ডুকরে কেঁদে উঠল, বলল—ডাকবেন না ও নামে, আপনি আমায় ডাকবেন না!

নেপালবাবু কিছু টাকা দিতে গেলেন দুলালের মাকে। বললেন—তুমি নাও।

তাহলে আমার পাপের বোঝা খানিক হালকা হয়। কাঁদতে কাঁদতে তুলালের মা বলল—না, ও আপনি ফিরিয়ে নিয়ে যান। আজ আর আমার কী হবে ও টাকায়। ফিরিয়ে নিয়ে যান, বাবু।

তুলালচাঁদের গল্প আগেই শেষ হয়ে গেছে। তুলালের মায়ের গল্পের শেষ এইখানে।

নবগঞ্জের লোক কিন্তু নেপালবাবুর এই শেষ গল্পটা শুনে তু-রকম কথা বলেছিল। যে কটা দিন বেঁচেছিলেন নেপালবাবু নবগঞ্জের লোকেরা বলেছিল—ঢং মিনসের। আর নেপালবাবু মরে যাওয়ার পর বলেছিল—না, লোকটা ত্যাতো খারাপ ছিল না।

দিন-রাত্তিরের বিরাট চাকা যেমন ঘুরছিল তেমনি ঘুরে চলল। বিকিকিনির হাটের তেজী-মন্দার খেলা কখনও জমে উঠল, কখনও মিইয়ে গেল, কিন্তু থামল না। শ্যামধারী, অ্যাসটন সায়েব, ধীরু বাঁড়ুজ্যে, কাটিকেষ্ট, বুধো, আরো কতজনা এই হাটের পসারী। বকুলবালা, তুলালের মা পসারিনী। কতজনের কত কথা বলা হল। আরো কতজনের কথা বাকি।

ফুলিঙ্গ তার পাখায় পেল
ক্ষণকালের ছন্দ—

এর পরের গল্প বলেছিল মতিচাঁদ—ব্রজেশ্বরী দেবীর গল্প।

ব্রজেশ্বরী দেবীকে এখন আর নবগঞ্জের কেউ চেনে না। নাম বললে হাঁ করে থাকবে—কে তিনি?

কিন্তু একদিন নবগঞ্জের মানুষ ব্রজেশ্বরী দেবীর নামে যুক্তকর হত। রাস্তা দিয়ে ব্রজেশ্বরী দেবী হেঁটে গেলে দু-পাশের নিচু তলার লোক একদিন 'সেলাম মাইজী' বলে হাতের কাজ ফেলে উঠে দাঁড়াত। লালপাড় খদ্দরের কাপড় কুঁচিয়ে পরা, মাথায় এক পিঠ রুক্ষচুলের এলো খোঁপা, এদিকের কাঁধে একটা দামী ব্রোচ, পায়ে জুতো, ব্রজেশ্বরী দেবী একদিন নবগঞ্জের রাস্তায় হাঁটতেন—দু-চোখে নির্ভীক সুদূর দৃষ্টি। সে দৃষ্টির রঙ ছিল মতিচাঁদের ভাষায় ভাদ্দর আশ্বিন মাসের আকাশের মতো নীল। বয়সের চেয়ে অনেক গম্ভীর, মধ্যমযৌবনা। কিন্তু কাছে গিয়ে দাঁড়ালে মতিচাঁদ বলত, যেন মনে হত একটা পেল্লায় গাছের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

সিঙ্গাপুরে সারা জীবন কাটিয়ে জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে কেন ফিরে এসেছিলেন ব্রজেশ্বরী দেবী সে কথা নবগঞ্জে কেউ জানতো না। কেউ বলতো, বাবা মারা যাওয়ার পর এ না করে আর উপায় ছিল না তাঁর। কেউ বলতো, সিঙ্গাপুরেই এক মস্ত বড়োলোকের ছেলের সঙ্গে তাঁর ভাব ভালবাসা হয়েছিল—সে ছেলে বিলেত গিয়ে নাকি আর ফেরেনি, সোনালী চুলের কাছে কালো চুল হেরে গেল, কটা চোখ হারিয়ে দিল নীল চোখকে। তাই মনের দুঃখে ফিরে এসেছেন স্বদেশে। আবার কেউ বলতো— না দেশের কাজ করার ইচ্ছা হয়েছে তাঁর।

তবে যে কারণেই হোক ফিরে তিনি এসেছিলেন—নবগঞ্জের মাটিতে এক নবীনা বিদেশিনীর ভূমিকা নিয়ে একদিন এক হাওয়া তুলেছিলেন তিনি, যে হাওয়া নবগঞ্জের অনেক দিনের পুরনো ধুলোয় তোলপাড় তুললো।

ব্রজেশ্বরী দেবী প্রথম দেখেছিলেন—নবগঞ্জে মেয়ে ইস্কুল নেই। তার আগে এ ব্যাপার নবগঞ্জের কারুর নজরে পড়েনি।

ব্রজেশ্বরী দেবী প্রথম দেখেছিলেন যে, নবগঞ্জের শ্রমিক মেয়েরা আসন্ন মাতৃত্বের বিপুল গর্ভভার নিয়ে মিলে হাজরি দেয়—কেউ তার নিরাপত্তার জিম্মা নেয় না। তিনিই প্রথম দেখেছিলেন মা-বাপ ফেলে যায় ছোট ছেলেগুলোকে বস্তির অভিভাবকহীন অন্ধকারে—তাদের ভবিষ্যৎ কারু চিন্তায় নেই।

সকাল বেলায় আর বিকেল বেলায় গঙ্গার ধার ধরে হাঁটতে হাঁটতে ব্রজেশ্বরী দেবী চলে যেতেন মহাবীরপ্রসাদ জুট মিল পর্যন্ত আবার ফিরতেন। সুগৌর, সুশরীরিনী সেই অকুতোসংকোচ মহিলাকে নবগঞ্জের অনেক লোকে দেখেছে যে তিনি বস্তির ছেলেগুলোকে কোলে তুলে নিচ্ছেন, চুমো দিচ্ছেন, বাতাসা বিলাচ্ছেন তাদের। এখন এই একালে যে ঘটনাকে ঘটতে দেখলে ভান বলে বোধ হয়, এখন থেকে অনেক দিন আগেকার সেই চটকলিয়া নৈরাজ্যের আমলে সেই ঘটনাকেই আশীর্বাদ বলে মনে হত। মতিচাঁদ বলতো, অন্নপূন্নোর ছবিই দেখা ছিল, বাবু, বোজেশ্বরী দেবীকে না দেখলে ছবির দেখা শুধু ছবিতেই থেকে যেত।

ওঁর মস্ত বড়ো বাড়ির কাছে একটা নৈশ বিদ্যালয় খুলেছিলেন তিনি। রোজ সন্ধ্যেয় নিজে লণ্ঠন জ্বালিয়ে বসে লেখা পড়া শিখাতেন ব্রজেশ্বরী দেবী। কুলিদের ছেলেগুলো হৈচৈ করতো, আরো ছোটগুলো চ্যাঁ ভ্যাঁ করতো—মতিচাঁদের বর্ণনা ছিল গণেশ জননীর মতো বসে থাকতেন বোজেশ্বরী দেবী।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম মতিচাঁদকে—তুমি কোনোদিন দেখেছিলে সে ইস্কুল? মতিচাঁদ জবাব দিয়েছিল—হ্যাঁ, বাবু দেখেছিলাম বই কি? একদিন গেছলাম, দেখি কি না মেয়েদের সেলাই শেখাচ্ছেন, ছেলেদের লণ্ঠন জ্বালা শেখাচ্ছেন। তাঁর নিজের হাতে বড়ো টর্চ টেপাবাতিখানা ছিল সেটা নিয়ে ক-জন ছোঁড়া টিপে টিপে আলো জ্বালাচ্ছে আর নেবাচ্ছে। লেখা পড়া ছাই—পড়াপড়া খেলা। ওখান থেকে লেখাপড়া শিখানো সেরে নিজের বাড়ির নিচের গঙ্গার ঘাটের পইঠেয় চুপ করে বসে থাকতেন খানিকক্ষণ। তারপর অনেক দূর অবধি চটকল আর জেটির আলো-জ্বালানো গঙ্গার জলের দিকে তাকাতে তাকাতে জলে নেমে যেতেন—সব কিছু ধুয়ে মুছে তারপর চলে যেতেন বাড়ি।

মতিচাঁদের গল্প শুনতে শুনতে ভাবতাম সেই দুর্বোধ্য রমণীর কথা। নবগঞ্জের ইতিহাসে যে চিরকাল প্রহেলিকাই রয়ে গেল। কী ভাবতেন ব্রজেশ্বরী দেবী?

সেই প্রবাস-বিলীন যুবকের কথা যে অনেক বসন্তের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক বসন্তেই বিদায় নিল? নাকি পিতৃ স্নেহচ্ছায়াঘন শান্ত শৈশবের কথা, সিঙ্গাপুরের নারিকেলমর্মর দিনগুলি? নাকি সত্যিই দেশের ডাক?

সেদিন শ্যামধারী খোয়া ভাঙছিল সেনপাড়ার বড়ো রাস্তার ধারে। ভরা গরম। দুপুরের রোদে ভয় তরাসে শহর বাড়ির মধ্যে মুখ গুঁজেছে তখন। নর্দমার ধারে পাঁকের কাছে কুকুর—পাঁকের মধ্যে শুয়োরগুলো গলা ডুবিয়ে পড়ে আছে। একটা কাঁসারি ঠং ঠং করে কাঁসর বাজাতে বাজাতে চলে গেল। শুধু শ্যামধারীর হাতুড়ির আওয়াজ বাজতে লাগল ঠকাস্ ঠকাস্ করে। নিঝুম দুপুরের আকাশে চিলেদেরও হরতাল ছিল বুঝি। সেন মশাইদের পুরনো কালের চিক দেওয়া বারান্দার ওধারে বসে ঘোড়ানিম গাছের ছায়ায় ছায়ায় বই পড়ছিলেন ব্রজেশ্বরী দেবী। বই পড়তে পড়তে চিক সরিয়ে বারান্দায় দাঁড়ালেন তিনি।

এমন সময় ফটকের বাইরে শ্যামধারীর ক্লান্ত মূর্তিটা নজরে পড়েছিল তাঁর। কে ঐ লোকটা—একটা পা নেই কেন? সেনবাড়ির পাঁচিল কোনোদিন ব্রজেশ্বরী দেবীর জন্যে নয়। কন্যা-বিহীন জ্যাঠামশাইয়ের স্নেহটারই ভরসা ছিল তাঁর—টাকা তাঁর বাবার দৌলতের অবশিষ্ট। কাজেই নবগঞ্জের কোনো পাঁচিলই তাঁর কাছে পাঁচিল ছিল না।

সটান বেরিয়ে এলেন ফটক পেরিয়ে। শ্যামধারীর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পরিষ্কার হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তোমার নাম কি? তোমার শরীর এত দুব্‌লা তো তুমি এ কাজ করো কেন? তোমার কে আছে?

শ্যামধারীর তখন পা কাটা যাওয়ার পর বছর দেড়েক কেটে গেছে। পারবতীয়া হারিয়ে যাওয়ার পর তার দুনিয়ায় আর কোনো নারী-কণ্ঠ বাজেনি—এমন করে তো নয়ই।

শ্যামধারী প্রথম দিন কাটা কাটা জবাব দিয়েছিল।

শ্যামধারী দ্বিতীয়দিন মুখ খুলে জবার দিয়েছিল।

শ্যামধারী তৃতীয় দিন মন খুলে সব বলে ফেলেছিল। তারপর হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল পারবতীয়ার কথা। বলেছিল—এ বেইমান চটকল বাজার সব কুছ ছিনলিয়া মায়িজী। চোখে রুমাল দিয়ে সেই মধ্যমযৌবনা তরুণী ফিরে গিয়েছিলেন চিকের আড়ালে।

মতিচাঁদ এই গল্প বলত আর ব্রজেশ্বরী দেবীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হত। আমার হঠাৎ-লেখক মন নানা কথা চিন্তা করত। কেন যেতেন ব্রজেশ্বরী দেবী দুপুর রোদ দু-পায়ে দলে শ্যামধারীর ইঁটের স্তূপের কাছে? দুপুর বেলায় সারা নবগঞ্জের সমস্ত আইবুড়ো মেয়েরা কোন্ কোন্ সইয়ের বিয়ে হল ভাবতে ভাবতে যখন ঘুমিয়ে পড়ত তখন কেন যেতেন ব্রজেশ্বরী দেবী নবগঞ্জের চটকলিয়া কুলি সমাজের এক পঙ্গু সদস্যের কাছে? একি শুধু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের দেশের ডাক? নাকি…নাকি তার কিছুতেই ঘুম আসতো না দুপুরে অথবা রাত্রে? সেই প্রবাস-পলাতক যুবকের স্মৃতির কাঁটা বুকে নিয়ে ব্রজেশ্বরী দেবীর ঘুম অথবা নিঘুম দুইই অশান্ত হয়ে উঠেছিল—সব কিছু ভোলার জন্যে চাই মানুষের সার্বজনীন দুঃখের নেশা, দুঃখ দূর করার নেশা? নাকি আমিই ভুল ভাবতাম? তারপরের দিন সকাল বেলায় বাজারে কংগ্রেস আপিসে বসে বসে সতু বোস খবরের কাগজ পড়ছেন আর চায়ের গেলাসে চুমুক দিচ্ছেন। খবরের কাগজ তখন খুব গরম, চায়ের গেলাসও ছিল খুব গরম কিন্তু নবগঞ্জ কি এত গরম যে সকাল বেলাতেই খোয়াব দেখবে সতু বোস্? সতু বোসের সামনে ব্রজেশ্বরী দেবী আর তাঁর পিছনে পা-কাটা শ্যামধারী।

ব্রজেশ্বরী দেবী সতু বোসকে কী জিজ্ঞাসা করেছিলেন মতিচাঁদ সে কথা জানে না। নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করেছিলেন—আপনিই কি এখানকার কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী? সতু বোসও কী জবাব দিয়েছিলেন সে কথা মতিচাঁদের জানার কথা নয়। অনুমান করি সতু বোস খবরের কাগজখানা ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—ইয়ে মানে হ্যাঁ।

মতিচাঁদ বলেছিল, তারপর বোজেশ্বরী দেবী শ্যামধারীকে নিয়ে কংগ্রেস আপিসের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিলেন এই বাজারের লোকে দেখেছিল।

এখানে আর অনুমান করা চলবে না কী কথা হয়েছিল, কী কথা হয়নি। মতিচাঁদের কাছে কাদের আলি বলেছিল যে সতু বোস গিয়েছিল বেলা এগারটার সময় মিলে। অ্যাসটন সায়েবের খাস কামরায় সতু বোসের সঙ্গে অ্যাসটন সায়েবের যখন বাত‌চিত হচ্ছিল তখন কাদের আলি ছিল সেখানে। সতু বোস কী একটা দরখাস্ত দিয়েছিল সায়েবের হাতে।

সতু বোসকে জিজ্ঞাসা করেছিল সায়েব—তুমি কে?

আমি কংগ্রেসের লোক।

আমার সঙ্গে কংগ্রেসের কোনো কুটুম্বিতে নেই।

থাকা উচিতও নয়, কিন্তু যে লোকটার কথা দরখাস্তে লেখা আছে তার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক আছে।

ইয়েস, লেকিন তার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কী?

তারপরেই অ্যাসটন সায়েব হেঁকেছে—চিপরাশি, বাবুকো দরওয়াজা দেখলা দেও। সতু বোস দরখাস্তখানা ফেলে রেখেই চলে এসেছিলেন বাইরে।

সেনবাড়ির বিরাট ফটক সতু বোস কোনোদিন ডিঙোতে পারবেন এ কথা তিনি নিজেও জানতেন না। অ্যাসটন সায়েবের ঘর থেকে বেরিয়ে সতু বোস চলে গিয়েছিলেন সেনবাড়ি। ব্রজেশ্বরী দেবীকে খবর দিলেন, অ্যাসটন সায়েবের মেজাজের খবর।

সতু বোস বাজারে সবাইয়ের কাছে গল্প করেছিলেন পরে। খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে ব্রজেশ্বরী দেবীর মুখখানা সিঁদুর টকটকে হয়ে গেল। খুব জোরে একটা নিশ্বাস টেনে চাকরকে বলেছিলেন গাড়ি ডাকতে। গাড়ি আসতেই উঠে বসলেন, সতু বোসকে ডেকে নিলেন।

মতিচাঁদ বলেছিল সতু বোস যখন ফিরলেন তখন তাঁর বুকখানা দশ হাত, মুখ-চোখ জ্বলছে। সতুবাবু বলেছিলেন, বুথ অ্যাণ্ড হেণ্ডারসনের তিন কালে কেউ কখনো স্বপ্নেও ভাবেনি যে একটা মেয়েছেলের কাছে অ্যাসটন সায়েবকে এমন নাজেহাল হতে হবে। খই ফুটনো ইংরেজিতে সায়েবের সঙ্গে সমানে তকরার করেছেন ব্রজেশ্বরী দেবী। সায়েব খাস কামরা থেকে বেরিয়ে কুঠিতে যাচ্ছিলেন। নবগঞ্জের চটকল বাজারে রাও হয়ে গেল দেখতে দেখতে—খুবসুরত এক মেয়েছেলে শ্যামধারীর কাটা পায়ের ইজ্জত নিয়ে এতদিন বাদে সায়েব ম্যানেজারের সঙ্গে মোকাবিলা করেছে। কে সে মেয়েছেলে? সবাই সবাইকে বলল—দেখিসনি যে ইস্কুল খুলেছে বস্তির ছেলেমেয়েদের জন্যে সে। সতুবাবু বললেন, এমনধারা তুবড়ি ছোটানো ইংরাজি তিনি কখনো শোনেননি। মজুররা যারা কেউ কেউ ব্যাপারটা দেখেছিল তারা বলল—অ্যায়সা দিমাগ যে শালা সায়েবকে পর্যন্ত তোতলাতে হয়েছে।

সতু বোস সেদিন অনেকক্ষণ কংগ্রেস আপিসের সামনে চুপ করে বসেছিলেন। কেন ছিলেন সে কথা মতিচাঁদ জানে না।

আমি ভাবি সেদিন কি সতু বোস কোনোও স্বপ্ন দেখেছিলেন। নবগঞ্জের নবীন আত্মার স্বপ্ন? নইলে সতু বোসের তো অন্ত স্বপ্ন থাকার কথা নয়।

বিকেল বেলায় ওদিকে অ্যাসটন সায়েবের মোটর গাড়ি সেনবাড়ির ফটকে

গিয়ে থেমেছিল। ব্রজেশ্বরী দেবীর জ্যাঠামশাই হরিবিলাস সেন মশাই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছিলেন সায়েব দেখে। কাদের আলি কায়দা করে দরজা খুলে ধরল গাড়ির। কায়দা করে সেই বিখ্যাত লাল টাই দুলিয়ে অ্যাসটন সায়েব সেনবাড়ির ফটক ডিঙোলেন।

হরিবিলাস সেন গভীর বিনয়ের সঙ্গে বারবার আভূমি প্রণত ভঙ্গিতে বলেছিলেন, সায়েব নিজে কেন এসেছেন ডেকে পাঠালেই তো যেতেন হরিবিলাস-বাবু। সায়েব বলেছিলেন—সে কী কথা, এ সব অঞ্চলের মাথা মাথা লোকেদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় রাখা তিনি তো কর্তব্যকর্মের মধ্যেই ধরেন।

সায়েব তারপরেই অনুমান করি নিশ্চয় কাজের কথা পেড়েছিলেন—মেয়েটি কে এবং এত সুন্দর ইংরেজি বলেন কী করে তিনি? এমন ব্রিলিয়াণ্ট মেয়ে সায়েব দেখেননি। হরিবিলাসবাবু গভীর আনন্দের সঙ্গে ভাইঝির পরিচয় দিয়েছিলেন। সিঙ্গাপুরে মানুষ সেই জন্যে।

সিঙ্গাপুর? সায়েব আশ্চর্য হয়ে চোখ বড়ো বড়ো করে ফেলেছিলেন।—আই, সি, কিন্তু এ মেয়ে কংগ্রেসাইটদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করে কেন?

সে কী? আঁতকে উঠেছিলেন হরিবিলাস সেন, সরকারের ডাক বিভাগের পেন্সনভোগী রুইকাতলাদের একজন।

জ্যাঠামশাই ডাকলেন—মা ব্রজ। সে ডাক নিশ্চয় প্রায় আর্ত ডাকেরই সামিল ছিল। চাকর এসে খবর দিল—মা বললেন দিদিমণি বাড়িতে নেই, বোসেদের সতুবাবুর সঙ্গে কোথায় যেন গেছেন।

সায়েব জিজ্ঞাসা করলেন—সতু বোস?

হরিবিলাস সেন চুপ করে বসে রইলেন—কী গেরো রে বাবা!

সায়েব শিষ্টাচার ভুলে হঠাৎ শিস দিতে দিতে উঠে পড়লেন। যাবার সময় এটিকেট আর তেমন জমল না।

যে বিকেল বেলায় রোদ নারকোল পাতায় ঝলর দোলায় যে বিকেল বেলায় নবগঞ্জের চটকল-ফেরত মজুরের দল গঙ্গার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, বাবুপাড়ায় মেয়েরা চুল বাঁধে, গা ধোয়, ছেলেরা ইস্কুলের মাঠে আকাশে-ওড়া পাখির মতো কিচমিচ করে, সেদিন সেই বিকেল বেলায় সতু বোস আর ব্রজেশ্বরী দেবী কংগ্রেস আপিসে বসে বসে দরখাস্ত লিখেছিলেন কলকাতার ইংরেজি কাগজে। অ্যাসটন সায়েবের কথা, শ্যামধারীর কথা ইংরেজিতে চটপট লিখে যাচ্ছিলেন ব্রজেশ্বরী দেবী। সামনে ভ্যাবা গঙ্গারামের মতো বসেছিল শ্যামধারী। সে বুঝছিল না

কিচ্ছু, শুধু হাঁ করে দেখছিল ব্রজেশ্বরী দেবীকে। সতু বোস গল্প করেছিলেন পরে—চাঁপার কলির মতো আঙুলে কালো কলম আর মুক্তোর মতন হাতের লেখার গল্প। মতিচাঁদ সে গল্পের সবটা শোনেনি। তার শোনার কথাও নয়।

কিন্তু আমি ভাবতাম এ গল্প শুনতে শুনতে ব্রজেশ্বরী দেবীর কথা। কী বেদনার মৌন ঝংকার নিজের বক্ষবীণায় লুকিয়ে রেখেছিলেন আপনি? তাকি সবটাই ব্যর্থ শ্যামধারীর আর্ততা? নাকি নিজের কাছ থেকে বারম্বার নিজেই পালিয়ে যেতে চাইছিলেন সেই সেকালে, সেই সখিবিহীন, পরিজন-পরিবেষ্টিত কিন্তু প্রিয়জন পরিহৃত নবগঞ্জে আপনি, শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী দেবী?

কলকাতার কাগজে কাগজে শ্যামধারীর খবর উঠল ফলাও করে। শ্যামধারীর কাছে সে খবর পৌঁছে দিলেন সতু বোস। শ্যামধারী খবরের কাগজ বস্তুটা বোধ হয় জীবনে প্রথম হাতে করল। তারপর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নেড়ে চেড়ে সতু বোসকে ফেরত দিল কাগজখানা।

ইংরেজি কাগজখানাকে নিয়ে সতু বোস দেখা করে এলেন ব্রজেশ্বরী দেবীর সঙ্গে। ব্রজেশ্বরী দেবীর সাদা ধবধবে খদ্দরের শাড়ির লাল টকটকে পাড়ের দিকে তাকিয়ে নিশ্চয় ভেবেছিলেন এবার বিপদ।

তবে সে বিপদ তাঁর নয় নিশ্চয়, বিপদ নবগঞ্জের স্থবির কালপুরুষের।

তার পরের দিন মতিচাঁদের গাড়ি করেই ঢোল দিতে বেরুলেন শহরে সতু বোস। —এতোয়ারমে পঞ্চাননতলা ময়দানমে এক ভারী সভা হোগি—চটকল মজদুরকা সভা। বিষয়—মালিকোঁ কা জুলুম, জখমি ভাতা। মতিচাঁদ বলেছিল—আমার গাড়ির মাথায় বসে সতু বোস নবগঞ্জের রাস্তায় রাস্তায় মিটিঙের কথা বলতে লাগলেন। এর আগে আর চটকল মজুরদের নিয়ে নবগঞ্জে মিটিং করার কথা কেউ ভাবেনি। পথচলতি কুলি-কাবালির দল থমকে দাঁড়িয়ে গেল। ভদ্দরলোকেরা রোয়াকে বসে চমকে উঠলেন। চটকল বাজারের ঢোঁড়াসাপ তা হলে ঢোঁড়া নয়। গাড়ির মাথা থেকে জানিয়ে দিচ্ছেন সতু বোস—না, এময়াল সাপ, নড়ে চড়ে হয়তো কম, কিন্তু যদি হাঁ করে তাহলে এক লহমায় গিলে ফেলবে বুথ অ্যাণ্ড হেণ্ডারসনের মতো অমন দু-দশটা ধাপ্পাবাজকে। মতিচাঁদ বেলা দুটো অবধি ভাড়া খাটল। গলদঘর্ম সতু বোসকে মতিচাঁদ যখন সেন বাড়ির সামনে নামিয়ে দিল তখন সেখানে ব্রজেশ্বরী দেবী অপেক্ষা করছিলেন।

আপনার খাওয়া হয়নি এখনো?

না, সে কিছু না, খেয়ে নোব এখন। তাহলে সামনের রোববার, আপনিই প্রেসিডেণ্ট।

হ্যাঁ, আর কী? আপনি কিন্তু খেয়ে যান, আসুন।

সতু বোস একটু ইনতাম করে ভেতরে পা বাড়াতে যাবেন, এমন সময় বললেন ব্রজেশ্বরী দেবী—ভালো কথা কে একটি লোক, লম্বা চওড়া দেখতে, নাম বললে বুধনাথ—বুধো, সে আপনার খোঁজে এসেছিল। বললে আজ ফিরেছে, কংগ্রেস আপিসে দেখা করবে আপনার সঙ্গে।

ইন্তাম করে ভেতরে ঢুকতে গিয়েছিলেন সতু বোস। খবর শুনেই—বুধো ফিরেছে, যাক ওঃ বাঁচা গেল, বলেই লাফিয়ে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠলেন সতু বোস। হাঁ হাঁ করে উঠলেন ব্রজেশ্বরী দেবী—ও কী আসুন, বুধো কে? কোথা থেকে এল সে? চললেন যে?

গাড়ি থেকে জবাব দিলেন সতুবাবু—ও জেল থেকে এল। ভয়ানক দরকারী লোক—চল মতিচাঁদ। ব্রজেশ্বরী দেবী দাঁড়িয়ে রইলেন, গাড়ি চলল।

গল্প শুনতে শুনতে আমি বলেছিলাম—উঃ গল্প এক্ষুনি কী গাড্ডায় পড়ছিল তুমি জানো না মতিচাঁদ। খুব বাঁচিয়ে দিয়েছে বুধো।

মতিচাঁদ বলেছিল—কী গাড্ডা বাবু?

আমি জবাব দিয়েছিলাম—একবার সতু বোস যদি ব্রজেশ্বরী দেবীর সামনে ভাতের থালা নিয়ে বসত তাহলে আর রক্ষে ছিল না, ব্রজেশ্বরী দেবী তো গিয়েই আছেন, সতু বোসও যেত।

মতিচাঁদ যেন একটু অসন্তুষ্ট হয়ে বলেছিল—যা ঘটেছিল তাই বলছি, আমি কি বানিয়ে বানিয়ে বলছি, বাবু।

বাজারের চৌমাথায় বুধোকে কংগ্রেস আপিসের সামনে জড়িয়ে ধরেছিলেন সতু বোস। ঘোড়ার গাড়িয়ালা আর বিড়িওয়ালারা সে মিলন দৃশ্য দেখেছিল। গাড়ি থেকে নেমে, দোকান থেকে উঠে সবাই বুধোর সঙ্গে হাত মিলোবার জন্য এগিয়ে এল। মতিচাঁদ তার গাড়ির মাথা থেকে বসে মন্তব্য করেছিল—নরক গুলজারের যেটুকু বাকি ছিল সেটুকু এবার ভর্তি হল।

ব্রজেশ্বরী দেবীর সেদিন বিকেল বেলায় বুধোকে দেখে মহাখুশি। হ্যাঁ, এই রকম লোকই দরকার। বুধো কিন্তু খুব একটা কিছু উল্লসিত হয়নি। ব্রজেশ্বরী দেবীর সুন্দর পানা মুখের দিকে চেয়ে উজবুকের মতো খানিকক্ষণ

বসে থেকে সে সতু বোসকে বলেছিল পরে—চটকল কোম্পানির সঙ্গে লড়াই দাদা, এর মধ্যে মেয়েছেলে না জোটালেই পারতেন। সতুবাবু বলেছিলেন, আরে যাঃ সে রকম মেয়েছেলে নয়, ইংরেজি যা জানে। বুধো একটা বুদ্ধু তো বরাবর, বলল—আরে সেকি অ্যাসটন সায়েবের মেমই কম জানতো ?
মিটিং রবিবার দিন।

হপ্তাভোর বুধো আর সতু বোস মিলগেটের সামনে সকাল দুপুর সন্ধ্যে গলা চিরে চেঁচিয়ে গেল—জালিম মালিকের জুলুমের নাম নিশানা মিটিয়ে দেবার মিটিং। সবাই যেন সামিল হয়। সভানেত্রী—ব্রজেশ্বরী দেবী।
মজুরদের মধ্যে অবস্থা তখন—শুনি ঘরে ঘরে কেহ পায় ভয় কেহ দেয় তারে গালি। শনিবার দিন সন্ধ্যে বেলায় অ্যাসটন সায়েব ডেকে পাঠালেন কাটিকেষ্ট মিত্তিরকে। বুথ অ্যাণ্ড হেণ্ডারসনের হাজরেবাবুকে।

কাটিকেষ্ট মিত্তির।
কাটির মতন রোগা আর কেষ্টর মতন কালো। তাই আসল নামটা হারিয়ে গেছে নবগঞ্জের হাটে। কাটিকেষ্ট মিত্তির নামেই বাজার চালু মিত্তির মশাই একদিন নবগঞ্জের চটকল বাজারে কলকাঠি ঘোরানোর দায় নিয়ে তাঁর ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে গিয়েছিলেন। শ্যামধারীর জখমী খেসারতও ফাঁকি দেবার বুদ্ধি যাঁর মাথা থেকে বেরিয়েছিল তিনি এই ভদ্রলোক।
মতিচাঁদের বয়ান ছিল—সাত টাকা মাইনের গোমস্তার দোল-দুর্গোৎসবের গল্প গল্প কিন্তু সাতাশ টাকা মাইনের হাজরেবাবুর কালিপুজোয় সায়েব কুঠিতে বিলিতি মদের বাক্স বিলুনো, চার জোড়া পাঁঠা বলি দেওয়া আমাদের দেখতা ঘটনা। নবগঞ্জের লোকে বলত, জোড়া সেলাই দেওয়া ডবল কাপড়ের পকেট ছিল কাটিকেষ্টর। হাজরেবাবু না হাজারিবাবু—কাটিকেষ্ট সম্বন্ধে এই কথাই নবগঞ্জে চালু কথা।
লোক ভর্তির সময় সেলামী নিতেন কাটিকেষ্ট মিত্তির। হাজরে খাতায় বাড়তি লোক দেখিয়ে চটকল কোম্পানির টাকা নিজের পকেটে নিয়ে আসতেন হপ্তায় হপ্তায়। লোককে বলতেন গুরুর কৃপায় চলে যাচ্ছে মন্দ না।
সুতরাং অ্যাসটন সায়েবের সঙ্গে একমত ছিলেন কাটিকেষ্ট—কংগ্রেস-ফংগ্রেস সব ঝুট ঝামেলার হাতে নবগঞ্জকে যেতে দেওয়া ঠিক হবে না। ঠ্যাটা মজুরকে টিট্ করার জন্যে কাটিকেষ্টর হাতে আছে সিঁটে গুণ্ডা। জামতলির ভটচায বাড়ির ছেলে। রাতারাতি গুণ্ডা হয়েছে সে। হাফহাতা শার্ট

লুঙ্গির মতন করা পরা কাপড়, একহাতে সাইকেল আর একহাতে হাণ্টার নিয়ে সিঁটে গুণ্ডা কাটিকেষ্টর শান্তিরক্ষক সেজে ঘুরে বেড়াত। কেউ কোথাও বেগরবাঁই করেছে—মিত্তিরের একটিমাত্র ইঙ্গিতেই সিঁটে গুণ্ডা তাকে সিধে করে দেবে। ভকতরামের কাটা কপাল তার সাক্ষী। কাটিকেষ্টর মাথাকে আর সিঁটে গুণ্ডার হাণ্টারকে ভয় করতো না এমন মজুর তখন নবগঞ্জের তামাম চটকল বাজারে ছিল না।

ইয়েস স্যার?

রাতদুপুরে অ্যাসটন সায়েবের কুঠিতে কাটিকেষ্ট গিয়েছিলেন।

কাদের আলি কাটিকেষ্টকে সায়েবের কাছে পৌঁছে দিয়ে বাইরে এসে দেখে কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় সিঁটে গুণ্ডাও দাঁড়িয়ে আছে। কাদের আলি মন্তব্য করেছিল 'জেলের পেছনে কেলে হাঁড়ি কখনো বাদ যাবার নয়।'

অ্যাসটন সায়েব বলেছিলেন—মিত্তির এতদিন পিসফুলি সব চালানো গেছে কিন্তু এইবার সিচুয়েশন নিয়ে চিন্তা করার সময় এসেছে। দ্যাট ব্রজেশ্বরী দেবী উইল ক্রিয়েট মাচ গোলমাল।

কাটিকেষ্ট বলেছিলেন—ইয়েস স্যার।

অ্যাসটন সাহেব বলেছিলেন—শি ইজ এ টারবুলেণ্ট লেডি।

কাটিকেষ্ট বলেছিলেন—ইয়েস স্যার।

অ্যাসটন সায়েব বলেছিলেন—রবিবার মিটিং, নাউ থিঙ্ক ওয়াট টু ডু?

কাটিকেষ্ট বলেছিল—শতখানেক টাকার ব্যবস্থা হলে আমি সব গরবড় করে দিতে পারি, স্যার।

সায়েব জিজ্ঞাসা করেছিলেন—হাউ?

লছমন সিং-এর সঙ্গে সীতাপতি পাঁড়ের কুস্তি লড়িয়ে দোব রবিবার দিন বিকেলে। ওরা দুজনে সবে বেনারস থেকে এসেছে। ব্রজেশ্বরী দেবীর মিটিঙে লোক হবে না।

সায়েব বললেন—নাইস। সব থেকে ভালো ব্যবস্থা। তাই করো তাহলে। কাল মিউনিসিপ্যাল আপিসে টাকা দিয়ে দোব।

কাটিকেষ্ট উঠলেন। শিস দিতে দিতে সায়েব বললেন—মিত্তির, মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেছে?

মিত্তির বলেছিলেন—না সায়েব, ওরা বোধ হয় বেম্মজ্ঞানী।

সে আবার কী?

হাফ্ ক্রিস্টান আর কি?

সায়েব, মিসেস অ্যাসটনের ছবি যেখানে টাঙানো থাকতো সেই শূন্য জায়গাটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মন্তব্য করেছিলেন—বাট রিয়েলি এ বিউটিফুল গার্ল। ইজ নট শি?

কাটিকেষ্ট মুখে বলেছিলেন—ইয়েস স্যার। আর কাটিকেষ্ট নিশ্চয় মনে মনে বলেছিলেন—এই মরেছে!

কাটিকেষ্ট ঠিকই বলেছিল। রবিবার দিন পঞ্চাননতলার মাঠে চটকল মজুরের টিকিও দেখা গেল না। শুধু ক্রাচ বগলে শ্যামধারী এক কোণে বসেছিল। কিন্তু লোক হয়েছিল অনেক। বিশেষ চটকলের মেয়ে শ্রমিকেরা কুস্তির থেকে জেনানা আদমির লেকচরকে বেশি ইণ্টারেস্টিং মনে করেছিল। শহরের ছেলে ছোকরার দল—ব্রজেশ্বরী দেবীর নামে জয়ধ্বনি করে বন্দেমাতরম্ বলে চেঁচাচ্ছিল। আর বলছিল ভারত মাতা কি জয়। সে ভারত মাতা ব্রজেশ্বরী দেবী হলেও আপত্তি ছিল না তাদের। সে বন্দেমাতরমের মা ব্রজেশ্বরী দেবীর মতোই কেউ বোধ হয়—অন্তত এই রকম তারা মনে করেছিল। তারাই ঘিরে রাখল সভা-মঞ্চ। মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি দিল। দূরে বসে রইল মাগী ডিপার্টের মেয়ে মজুরের দল—আরো দূরে রয়ে গেল দুই বীর মাটি-মাখা পালোয়ানের চারপাশে চটকল মজুরের দল। সেখানে তখন অ্যাসটন সায়েব বিচারক, কাটিকেষ্ট আর মিলের বড়োবাবু পরিচালক—শান্তিরক্ষক সিঁটে গুণ্ডা।

বক্তৃতাটা লেগেছে বেশ, রয়েছে রেশ কানে—বলাবলি করতে করতে সবাই বাড়ি চলে গেল সন্ধ্যে বেলায়। গঙ্গার ধারের মিটিং সেরে বাড়ি চলে গেলেন ব্রজেশ্বরী দেবী। ভাঙা মিটিং, ফাঁকা মাঠে সতু বোস আর বুধো দাঁড়িয়ে রইল। আর রইল শ্যামধারী। তার চোখ চক চক করছিল উল্লাসে। তার কথা খুব দরদ দিয়ে বলেছিল ব্রজেশ্বরী মায়ি।

শতিচাঁদের টীকাভাষ্য ছিল—এ মিটিঙে আর কিছু হোক বা না হোক একটা জিনিস বুঝল নবগঞ্জের লোকে যে অ্যাসটন সায়েবকে গালাগাল দেওয়া যায়, খোলা মাঠে লোক জড়ো করা যায়, নবগঞ্জের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা অ্যাসটন সায়েবের মুণ্ডপাত করা চলে। নবগঞ্জে দাঁড়িয়েই চলে।

ব্রজেশ্বরী দেবী সেদিনের মতো বাড়ি ফিরে গেলেন।

সিঙ্গাপুরের সেই বিচিত্র দিন নবগঞ্জের হাটের মাঝখানে ধুলিধুসরিত করে কোন্ তৃপ্তি তিনি পেয়েছিলেন তিনিই জানেন—নবগঞ্জের জয়ধ্বনি কানে তুলে নিয়ে সেই রুক্ষকেশী উদাসীনা তরুণীর কোন্ বাসনা চরিতার্থ হয়েছিল তাও তিনিই জানেন। নবগঞ্জ শুধু দেখেছিল তার বীর বিদ্রোহিণী মূর্তি।

খবরের কাগজে ছবি উঠল ব্রজেশ্বরী দেবীর।

বক্তৃতার বিবরণ উঠল ফলাও করে। প্রথমে সারা মহকুমা, তারপরে জেলা, শেষকালে সারা দেশ জানল ব্রজেশ্বরী দেবীর কথা।

নবগঞ্জের মানুষ ব্রজেশ্বরী দেবীকে মাথায় তুলে ফেলল। ধাওড়ায় ধাওড়ায় ব্রজেশ্বরী দেবীর প্রভাব বেড়ে গেল হু-হু করে। বস্তিওয়ালারা ঘন ঘন সায়েবকে জানাতে লাগল, সায়েব সামাল দেওয়া বহুৎ মুশ্‌কিল হবে পরে। বুধো আর সতু বোস চটকল মজদুর ইউনিয়নের তোড়জোড় করতে লাগল। ব্রজেশ্বরী দেবী জানিয়ে দিলেন মিটিং করে, ছুনিয়ায় এক দেশ আছে যেখানে হুজুরের দল হটে গেছে চিরকালের মতো, মজুরের দল রাজা হয়েছে।

সতু বোসের তক্‌লি ঘোরানো দেখে একদিন অবাক হয়ে গিয়েছিল নবগঞ্জ যেদিন সতু বোস বলেছিল এক এক পাকে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ম্যাঞ্চেস্টারের এক একটা মাকু। ব্রজেশ্বরী দেবীর নয়া খবর শুনে আর এক প্রস্থ হকচকিয়ে গেল সবাই।

'এ দেখছি আবার সতু বোসের ওপরে যায়।'

নবগঞ্জ আর আশপাশের চটকল বাজারে প্রতিষ্ঠিত হলেন ব্রজেশ্বরী দেবী। এই অঞ্চলের প্রথম শ্রমিক নেত্রী।

ঠিক সেই সময় একদিন এক ভাগ্যান্বেষী ব্যারিস্টার কলকাতা থেকে এসেছিলেন নবগঞ্জে। ব্যারিস্টার বি, কে, সান্যাল। সুন্দর সুঠাম গাড়িখানা নিজে হাঁকিয়ে সটান নবগঞ্জে চলে এসে ইস্টিশনের চৌমাথায় ব্রেক কষলেন—ব্যারিস্টার বি-কে। সূর্য তখনো পূর্বদিকে।—চেনো তোমরা ব্রজেশ্বরী দেবীর বাড়ি? গাড়ির ভেতর থেকে মাথা বার করে রাস্তার প্রাকৃত জনতাকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি। মতিচাঁদ তখন ছিল সেখানে। একটা ছোট ছেলে বলল—হ্যাঁ চিনি।

তাকে গাড়িতে তুলে নিলেন বি, কে, সান্যাল। বাঁ দিকের মোড় ধরে গাড়ি মিলিয়ে গেল। রাম শ্যামকে শ্যাম মধুকে জিজ্ঞাসা করল—কে মক্কেলটি?

জানে না কেউ। জানে না যে মক্কেল নয়, মক্কেল যারা পাকড়ায় এ তাদের একজন। মোটর থাকলে সেনবাড়ির ফটক ফটক নয়। সটান বসবার ঘরে

ঝাঁকিয়ে বসলেন বি-কে। তারপর সূর্য যখন নিঃসন্দেহে পশ্চিম দিকেই চলেছে বি, কে, সান্যাল তখন সেনবাড়ির ফটক পেরিয়ে মোটরে উঠলেন।

এটুকু সাধারণ ঘটনা।

অসাধারণ ঘটনা শুধু এই—ব্রজেশ্বরী দেবী নিজে এগিয়ে এসে তাঁকে মোটরে তুলে দিলেন, স্মিত মুখে সারা সেনবাড়ি চিক সরিয়ে বারান্দা থেকে অ্যাপ্রুভ করলেন ব্যাপারটা। অসাধারণ শুধু এইটুকু।

বিকেল বেলায় কংগ্রেস আপিসে রোজ যেমন আসেন তেমনি এলেন ব্রজেশ্বরী দেবী। একথা ওকথা সেকথার পর সতু বোসকে বলেছিলেন—শ্যামধারীর ব্যাপারটা কোর্টেই মীমাংসা হবে। কলকাতার একজন ব্যারিস্টার নিজে এসেছিলেন, তিনি কাগজে ঘটনার রিপোর্ট পড়েছেন, উনি পলিটিক্‌সে নামছেন, ভদ্রলোক শ্যামধারীর কেসটা করতে চান। কী বলেন?

বুধো তখন মাধো সাহুর ধাওড়ায় গিয়েছিল কী কাজে। সতু বোস মৃদু হেসে বলেছিল—সে তো খুব ভালো কথা।

ব্রজেশ্বরী দেবী বলেছিলেন—হ্যাঁ, আমিও তাই বলছি। এদিকে কাজ যেমন এগুচ্ছে এগুতে থাক। শ্যামধারীর ব্যাপারটার ফয়সালা করা দরকার।

খানিকক্ষণ থেকে ব্রজেশ্বরী দেবী চলে গেলেন। নিশ্চয় এদিন আর তিনি গঙ্গার ধারে যাননি। সটান চলে গিয়েছিলেন বাড়ি—নিজের ঘরে।

আমি এখন ভাবি—ভাগ্যিস সতু বোস সেদিন একথা জিজ্ঞাসা করে বসেননি যে ব্যারিস্টার শুধু শ্যামধারীর জন্যেই এসেছিল কি? কিন্তু না—সতু বোস খুব ভালো লোক, ও সব আবোল তাবোল কথা জিজ্ঞাসা করার লোক নয় সে।

বুধোকে নিশ্চয় ঘটনাটি বলেছিল কেউ—হয়তো সতু বোসই বলেছিল। এ নিয়ে সেও কোনো মাথা ঘামায়নি। নবগঞ্জে তখন পাকা মাথার দল সংখ্যায় এত বেশি হয়নি যে এটুকু মাত্র ব্যাপার দেখেই পর্বতো ধূমাৎ বহ্নিমান ধরে নিতে পারবে। জামতলির মন্দিরের রোয়াকে বসে থাকা সমাজপতিরা তখন ব্রজেশ্বরী দেবীর চালচলন আদব কায়দা নিয়ে মাথা ঘামালেও ব্রজেশ্বরী দেবীর শেষ চাল সম্বন্ধে তখনো ওয়াকিবহাল হয়নি। তখনো নবগঞ্জের ছেলের দলের চক্ষুমণি, শিরোমণি ব্রজেশ্বরী দেবী। দেবী চৌধুরানীর দেবী, আনন্দ-মঠের শান্তি, সীতারামের শ্রী। সতু বোসের উদ্দেশ্য তখন সফল হবার পথে। বুঝি বা নবগঞ্জের নববেশধারণ আসন্ন।

কিন্তু শনিবার দিন দাসপুকুরের মিটিঙে ব্রজেশ্বরী দেবী গেলেন না।

মহাবীর প্রসাদ জুট মিলের লাইন-সায়েবদের জুলুম বন্ধ করার জন্যে একটা মিটিং হবার কথা ছিল। ব্রজেশ্বরী দেবীর নামেই মিটিঙে তখন লোক জমে। চটকল মজদুর ইউনিয়নের কথা তখনো স্বপ্ন নবগঞ্জে। কাজেই তিনি না হলে মিটিং হবেই না।

মতিচাঁদ বলেছিল—আমিই গিয়েছিলাম গাড়ি নিয়ে সেনবাড়ি। সতুবাবু আগে ভাগেই চলে গিয়েছিলেন দাসপুকুরে, আমাকে বলে গিয়েছিলেন ব্রজেশ্বরী দেবীকে নিয়ে যেতে। গাড়ি সেনবাড়ির সামনে দাঁড় করিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে আমি হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। একটা আসমানী রঙের শাড়ি পরে তেল চকচকে খোঁপা বেঁধে রেলিঙে হেলান দিয়ে যিনি দাঁড়িয়েছিলেন তিনিই যে ব্রজেশ্বরী দেবী এটা বুঝতে আমার খানিকটা সময় লেগেছিল।

মতিচাঁদকে দেখে ব্রজেশ্বরী দেবী নেমে এসেছিলেন, বলেছিলেন—এসো মতিচাঁদ আমি তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি। দেখো, মানে ইয়ে, আমি আজ যেতে পারব না। শ্যামধারীর ব্যাপারটা কোর্টে যাবে তো, তাই নিয়ে কলকাতার ব্যারিস্টার সায়েবের সঙ্গে আজ কথাবার্তা কইতে হবে। তিনি আসবেন এখনি। তুমি দাসপুকুরে যাও, সতুবাবুকে এই চিঠিটা দাও গিয়ে।

মতিচাঁদ বলেছিল—সে তো আপনার খুব ভালো কথা, তা শ্যামধারীও কি আসবে এখন এখানে, না তাকে ডেকে দিয়ে যাব?

ব্রজেশ্বরী দেবী বলেছিলেন—আরে না না সে তোমায় ব্যস্ত হতে হবে না। সে আমি ব্যবস্থা করে নোব এখন। তুমি যাও এখন। সতুবাবু আবার মিটিং ছেড়ে এসে না পড়েন, তাহলে আবার মিটিঙটাই পণ্ড, বুঝলে না?

ঠিক আছে—মতিচাঁদ চলে এল।

মোড়ের মাথায় ব্যারিস্টার সায়েবের মোটর গাড়ির সঙ্গে মতিচাঁদের ঘোড়ার গাড়ির মোলাকাত হয়েছিল। মতিচাঁদ বলেছিল—দেখলাম সায়েব বেশ ফরসা, লম্বা, বাঁশির মতো নাক। জামাই করার মতো ছেলে বটে।

মতিচাঁদ যখন সতুবাবুকে গিয়ে খবরটা দিয়েছিল বুধো বিরক্ত হয়েছিল, সতু বোস মুখখানা প্যাঁচা করে মিটিং ভেঙে দিয়েছিলেন। 'না দিলেও আপনিই ভেঙে যেত' মতিচাঁদের বক্তব্য ছিল এই।—'কুলিদের জন্যে নয় ব্রজেশ্বরী দেবীর জন্যেই মিটিং হত তখন।'

ব্যারিস্টার সায়েব আরো দু-বার এলেন। তার মধ্যে কংগ্রেস আপিসে ব্রজেশ্বরী দেবী একবারও এলেন কি না সন্দেহ।

তার পরের সপ্তাহে জামতলির রোয়াক ঘোষণা করল—ব্যাপারটা তাঁরা লক্ষ্য করেছেন।

হেটো রাস্তার কেঠো-মনের লোকেরাও ঝাঁপ খুলতে খুলতে বলল—তাঁরাও বাদ যাননি। শ্যামধারী বোকার মতো মুখ করে সতু বোসকে বলেছিল—একরোজ মোলাকাত করনে গিয়া রহা, লেকিন মোলাকাত নেহি হুয়া। ক্যা ব্যাপার?

সতু বোস আকাশের দিকে চোখ তুলে বলেছিল—ক্যা জানে ভাই।

শুধু বুধো বলল—বসে থাকার সময় নেই, আপনি মাধো সাহুর ওখানকার বস্তি মিটিঙটার যোগাড় দেখুন—বলেছিলাম তো আপনাকে তখনই ওসব কুট ঝামেলার মধ্যে যাবেন না।

তবু সতু বোস হয়তো অপেক্ষা করেছিলেন। হয়তো ভেবেছিলেন ও সাময়িক ব্যাপার সেরে যাবে এখন। কিংবা হয়তো, তখন তো এসব ব্যাপার আকছার ঘটত না জিনিসটার প্রকৃত অর্থই তিনি ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। কাজেই তিনি সবাইকে ধৈর্য ধরতে বলেছিলেন।

ইন্দ্রের সহস্র চক্ষু। কাটিকেষ্টর সহস্রাধিক।

জামতলির রোয়াক আর নবগঞ্জের হাট যা আজ লক্ষ্য করে তিনি তা গতকাল লক্ষ্য করেছেন। যাকে আমরা দেখি একশ তাকে তিনি দেখেন হাজার। যা আমাদের কাছে তিল তা তাঁর কাছে তাল।

অ্যাসটন সায়েবের কুঠিতে গিয়ে হাজির হলেন কাটিকেষ্ট—সায়েব মজা বেধে গেছে খুব। ব্যাপার এই।

ব্যাপার এই শুনে অ্যাসটন সায়েব পাইপ নামিয়ে ফেললেন মুখ থেকে।—অলরাইট এখন যাও তুমি। ব্যারিস্টারের নাম কী?

বি, কে, সান্যাল।

ঠিক হ্যায়।

পাইপটা টেবিলের কাঁচের ওপর ঠুকতে লাগলেন সায়েব।

তারপর সপ্তাহ দুয়েক বাদে অ্যাসটন সাহেব ডেকে পাঠালেন কাটিকেষ্টকে।

মিত্তির, সান্যালের সমস্ত পারটিকুলার্স জোগাড় করেছি, ডু ইউ নো হিম?

ছুঁড়ীর সঙ্গে খুব ভাব হয়েছে ওর, এই জানি স্যার।

ভাব হয়েছে নয়, ভাব হয়েছিল, আবার নতুন করে হয়েছে। দি গাই কাম্‌স্‌ ফ্রম সিঙ্গাপুর।

মিত্তিরের কান গাধার মতো লম্বা হয়ে ওঠা উচিত ছিল সে সময়ে, কেচ্ছার গন্ধে। সায়েব বললেন—ইউ কে গিয়ে নানান দিকে ঠোক্কর খেয়ে শেষকালে ল-এর ডিগ্রি নিয়ে ফিরেছে এখন সান্যাল। এক সময় সান্যাল আর ঐ মেয়েটার লভ এপিসোড সিঙ্গাপুরের মুখরোচক কাহিনী ছিল। সান্যাল চলে যাওয়াতে ছাট ব্রোকেন-হার্টেড গার্ল ইণ্ডিয়ায় চলে আসে। ফ্রাস্‌ট্রেটেড সান্যালও এখন এসে জমেছে এখানে—অ্যাট লাস্ট।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সায়েব জিজ্ঞাসা করলেন—এ গুড স্টোরি?

ইয়েস, স্যার।

বাট উই হ্যাভ গট নাথিং টু ডু উইথ দি স্টোরি। কল লালমোহন ছাট স্ক্যাণ্ডেল-মঙ্গার। সে ছড়া বানাবে, সেই ছড়া নবগঞ্জের রাস্তায় রাস্তায় গেয়ে বেড়াবে ছোঁড়ার দল।

এদের মিয়ে?

সার্টেনলি, হার ট্রেড ইউনিয়ন কেরিয়ার মাস্ট কাম টু অ্যান এণ্ড। শি ইজ এ মেনেস।

লালমোহন এল। সায়েব আর দেখা করলেন না, মিত্তির কথা বলল।

সব শুনে লালমোহন বলল—আমার দ্বারা হবে না।

টাকা দেওয়া হবে তোমায়।

মাপ করো দাদা, ব্রজেশ্বরী দেবী মানুষ নয়, সাক্ষাৎ ভগবতী। ওসবের ভেতর আমি নেই। সায়েব বলল—ঠিক হ্যায় মিত্তির অন্য লোক দেখো। টাকা ছড়ালে নবগঞ্জে কিছুরই অভাব হয় না।

সেদিন সকাল বেলায় ব্রজেশ্বরী দেবী ঘন ঘন পায়চারি করছিলেন বাগানে। গঙ্গার হাওয়ায় তাঁর শরীর সেদিন একটুও ঠাণ্ডা হচ্ছিল না। তার আগের দিন বিকেল থেকে কুৎসিত এক ছড়া ছাপিয়ে বিলি করা হয়েছে তাঁর নামে। তাঁর অতীত এবং বর্তমান জীবনের কাহিনী নিয়ে। নবগঞ্জের মহিলার দল এতদিন তাঁকে প্রায় মেমসায়েব করেই রেখেছিল, পুরুষের দল তাকাত সম্ভ্রমের সঙ্গে। কাল থেকে নবগঞ্জের ধুলো উড়তে শুরু করেছে তাঁকে ঘিরে, লেগেছে

তাঁর গায়ে। ভাবখানা যেন—ওঃ ব্যাপারটা এই, ও আমাদের আগেই জানা ছিল।

বুথ অ্যাণ্ড হেণ্ডারসনই আবার বাজিমাত করল নবগঞ্জে।

কাটিকেষ্ট ছড়া বানিয়ে গেয়ে বেড়াবার লোক পায়নি। শেষকালটায় ছাপিয়ে বিলি করা হয়েছে। সতু বোস একবার করে আসতো বিকেলে, কাল আর আসেনি। বুধো এমনিই বিরূপ ছিল, ছড়ার কথা দেখে নিশ্চয় আরো বিরূপ হয়েছে। নবগঞ্জে মুখ দেখানো চলবে না? অ্যাসটন সায়েবই জিতবে তা হলে? তিনি হেরে যাবেন?

দুপুর তিনটের সময় ব্যারিস্টার সায়েব এসেছিলেন।

সেনবাড়ির চাকরেরা বলে—অনেকক্ষণ ঘরের মধ্যে দুজনে বসে বসে কি সব কথাবার্তা হয়েছিল। ব্যারিস্টার সাহেব যখন চলে গেলেন তখন ব্রজেশ্বরী দেবীর চোখ করমচার মতো লাল ছিল। আর কিছু নয় নবগঞ্জের মানুষের বিশ্বাস তাঁর ওপর থেকে চলে গেল। এ কথাটাই বারবার বলছিলেন।

মতিচাঁদকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—তা উনি তো আর পাঁচপাঁচি মেয়েছেলে ছিলেন না। বুঝিয়ে বললেন না কেন কাউকে ব্যাপারটা। এটা অ্যাসটন সায়েবদের কূটচাল এ কথা বুঝিয়ে বললেই পারতেন।

মতিচাঁদ যে জবাব দিয়েছিল তার সঙ্গে উত্তররাম চরিতের রামচন্দ্রের জবাবের মিল ছিল। মতিচাঁদ বলেছিল—লোকে কিছু বোঝে না বাবু।

তারপর?

তারপর আর কোনো খবর নেই।

এটা কোনো খবর নয় যে কয়েকদিনের মধ্যে ব্যারিস্টার সায়েবের সঙ্গে বিয়ে হবে বলে ব্রজেশ্বরী দেবী কলকাতা চলে গেলেন, জ্যাঠামশাই পাঠিয়ে দিলেন। পড়ে রইল নবগঞ্জ, পড়ে রইল মজুর-বস্তি। নবগঞ্জও তাঁকে আর টানল না—তিনিও টানলেন না। ছেলের দলের ভক্তির সিংহাসন থেকে নেমে গেলেন—নইলে হয়তো ব্রজেশ্বরী দেবী এ ইতিহাসে কিছু দিয়ে যেতেন—তবে সে অনুমান মাত্র।

এটাও কোনো খবর নয় যে শ্যামধারীর কেস কোর্টে একবার উঠেছিল। দেড় বছর হয়ে গেছে, কাজেই টাইম বার্‌ড্ বলে কেস ফেঁসে গেল। অ্যাসটন সায়েব ধীরুবাবু কোর্টে যার যা বক্তব্য বলে গেলেন। ব্রজেশ্বরী দেবী হাজির ছিলেন কোর্টে। অ্যাসটন সায়েব নাকি সেখানেও কোর্টে দাঁড়িয়ে তাঁর সম্বন্ধে কী ইঙ্গিত করতে গিয়েছিলেন। ব্যারিস্টার সায়েব, ব্রজেশ্বরী দেবীর স্বামী খুব

বড়ো ব্যারিস্টার নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু কিছু হয়নি। একটা যুবকও নবগঞ্জ থেকে ব্রজেশ্বরী দেবীর এ মোকদ্দমা দেখতে যায়নি। ব্রজেশ্বরী দেবী তাকিয়ে তাকিয়ে সেটা দেখেছিলেন।

কিন্তু এটা একটা খবর যে সেদিন কোর্ট থেকে ফেরার পথে একটা জনহীন রাস্তার মোড়ে অ্যাসটন সায়েবের মোটরের মুখ চেপে হঠাৎ এসে থেমেছিল আর একটা মোটর। এক সুবেশ যুবক গাড়ি থেকে নেমে সুন্দর ইংরেজিতে অ্যাসটন সায়েবকে অনুরোধ করেছিল—একটু নেমে আসতে—সায়েব নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিল।

সায়েব নেমে আসতেই যুবকের পিছু পিছু নেমে এসেছিল এক তরুণী। আঁচল কোমরে জড়ানো, হাতে ছিল একটা হর্স হুইপ। সেই বিখ্যাত লালটাই হাতের মুঠোয় ধরে দুপুর বেলার ফাঁকা রাস্তার ওপর মনের সাধে সেই মেয়েটি ঠেঙিয়ে গেল। মিনিট দু তিন বাদে শেষ পর্যন্ত সেই যুবকটিই মেয়েটিকে জাপটে ধরে গাড়িতে তুলে নিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল। সায়েব রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল। কাদের আলি বলেছিল, মেরে সায়েবটাকে কাঠবিড়ালি বানিয়ে দিয়েছে গো। সায়েব কিন্তু এ নিয়ে একদম রা কাড়লো না, একবারও না। কিল খেলে পরে কিল চুরি কি করে করতে হয় অ্যাসটন তা জানত—ম্যাকফারসন তার সাক্ষী।

এত বড়ো খবর নবগঞ্জে হররোজ ঘটে না।

ব্রজেশ্বরী দেবীও মিলিয়ে গেলেন বকুলবালার মতো, তবে শুধু ছাই ছড়িয়ে নয় এই যা সান্ত্বনা!

সাত

এখনো একাকী দীর্ঘ রজনী
জাগিতে হইবে পল গণি গণি—

মতিচাঁদ বলত, বাবু, এই নবগঞ্জের বাজারে কত কেচ্ছাই দেখলাম। মুখ গোমড়া করে যেন কিচ্ছুটি জানিনে সেজে বসে থাকি ঘোড়ার গাড়ির মাথায়—পেটে পেটে সব বুঝি। আমাদের কাছে ফাঁকি-ফুঁকি চলে না। আমাদের ঘোড়াটাকেও যদি শুধোন—দু-ঘণ্টা ধরে বলে দেবে লোকের হাঁড়ির খবর। ইস্টিশন থেকে যোগেশ বড়ালের মেয়েকে যোগেশ বড়ালের বাড়ির দোরে নিয়ে গিয়ে নামিয়ে দিলুম। দেখি মেয়ের সঙ্গে জামাই নেই, মেয়ে কাঁদছে। সিঁথেয় সিঁদুর ঠিক আছে, পরনে পাড়ালো শাড়ি ঠিক আছে, মেয়ে কাঁদে কেন? ও বুঝতে আমাদের দেরি হয় না বাবু, শ্বশুর বাড়িতে বনিবনা হয়নি তাহলে। যোগেশ বড়াল যা তাপ্পিবাজ—নিশ্চয় জামাইয়ের সঙ্গেও কিছু ধাপ্পাধুপ্পি মেরেছে, শ্বশুরেরা দিয়েছে খেদিয়ে। আবার এক বছর বাদে জামাই এল সেজে-গুজে জামাই ষষ্ঠীর দিনে—হীরালাল পৌঁছে দিলে। এসে বললে—যাক্ বোধ হয় মিটমাট হয়েছে। শালীরা খুব শাঁক-টাঁক বাজিয়ে জামাই ঘরে তুললে দেখলাম। কাজেই আমাদের কাছে কিছু লুকোছাপা নেই। ভুষুণ্ডির কাকের মতন কোচবাক্সের ডালে বসে সব দেখছি। সেবার জষ্টি মাসে কাদের আলি একদিন সকালে এসে বললে—মতিচাঁদ ভাই, গাড়ি বার করো।

এত সকালে কেন?

বলো কেন, যত শালার ঝুট ঝামেলা, কাটিকেষ্ট মিত্তিরের বাড়ি যেতে হবে। সায়েবের হুকুম এখুনি তাকে সায়েবের আপিসে খাস কামরায় হাজির করা চাই। কিছু ফইজৎ মনে হচ্ছে।

কেন ফইজৎ ছাড়া কি আর কাটিকেষ্টকে ডাকে না সায়েব।

তা কাটিকেষ্ট কী করবে?

সে কাটিকেষ্টই জানে আর অ্যাসটন সায়েবই জানে। তোরই বা কী আমারই বা কী। নে চল আর কথা বাড়াসনে।

বুথ আর হেণ্ডারসনের যত কুলি-কাবালি, বাবু, নবগঞ্জের যত উমেদার, যত বদলিওয়ালা এক ডাকে সবাই চিনত অ্যাসটন সায়েবকে—আর তার সমান কিংবা তার চেয়ে বেশি চিনত হাজরিবাবু কাটিকেষ্ট মিত্তিরকে। পান চিবুতে চিবুতে সকাল বেলায় মিত্তির যখন হেলতে দুলতে গিলে যেত-পিছনে পিছনে যেত একপাল উমেদার, বেড়ালের পেছনে বেড়ালছানার মতন। সর্দাররা খাতির করত তাঁকে—ভয় করত যমের মতন। বাবুরা সব দাদা বলত তাঁকে—কেষ্টদাদা ধরে দেয় হাত উপুড় করে—হাত চিত করতে সে জানে না। ধীরু বাঁড়ুজ্যের চাল কল উঠেছে গঙ্গার ধারে তাঁর খাতির আছে অবিশ্যি—এক নম্বর বংশের খাতির, দু-নম্বর ঠিকেদারির খাতির, আবার তিন নম্বর চালকলের খাতির। নবগঞ্জের যত সাধুখাঁ আর পালমশাইরা তখন ধীরুবাবুর সঙ্গে ব্যবসা করার জন্যে হাঁ করে রয়েছে। কিন্তু কাটিকেষ্টর মতো মানী লোক বোধ হয় তিনিও নন।

মেয়ে ইস্কুল হবে জামতলিতে। মিটিন হল মিন্‌সিপ্যালটিতে। অ্যাসটন সায়েব পিসিডেন। অ্যাসটন সায়েব হাঁক দিলেন টুপি খুলে—'ট্যাকা দাও সবাই ইস্কুলের তবিলে' বলে রেওয়াজমতো বক্তিমে দিলেন। নবগঞ্জের জামতলির সব রুই কাতলা হাজির। কিন্তু টাকার কথায় কেউ ঘাই মারছে না। অ্যাসটন সায়েব ঝানু সায়েব। ডাক ছাড়লেন আবার। এ ওর মুখের দিকে তাকায়, ও এর মুখের দিকে তাকায়। অতিকষ্টে বিপিন সাধুখাঁ দশ টাকা বের করল। তাইতেই সবাই ধন্যি ধন্যি করে হাততালি দিল। আর সবাই কথা দিল শুধু, যাত্রায় মেডেল দেওয়ার মতন—আমি এত দেব, উনি অত দেবেন। কিন্তু কাটিকেষ্ট মিত্তির বাপের ব্যাটা। ঝড়াক করে দশখানা দশটাকার নোট বার করে ফেললেন খাকি জামার পকেট থেকে। অ্যাসটন সায়েবও ট্যারা হয়ে গেল দেখে।

কলের বড়োবাবু যিনি তিনি ট্যাংরা, চিংড়ি, খলসে খান না একথা বলতে পারেন না। কিন্তু হাজরিবাবু যিনি তিনি ওসব চিনতেন না, চেনাতে গেলে এঁকে দেখাতে হত তাঁকে। বিলিতি বোতল আসতো নবগঞ্জে সায়েবদের জন্যে—আর আসতো কাটিকেষ্টবাবুর জন্যে। দিশি তিনি ছোঁন না। যে গাড়ি করে বরফ আসতো সায়েব বাংলোয় সেই বরফওলাই বরফ পৌঁছে দিত কাটিকেষ্টকে। নবগঞ্জের ছোটলোকেরা বলত, কাটিকেষ্টবাবুর খাকি জামার পকেটে জোড়া সেলাই, ডবল কাপড়, আধুলি আর রুপোর টাকার ওজনে ছিঁড়ে না বেরিয়ে যায় তাই জন্যে।

সেবার বড়োদিনে মুর্গি নিয়ে এক খিটকেল হয়ে গেল বাজারে। কাদের আলি আমার গাড়ি নিয়ে গেছে মুর্গি কিনতে সাদেক মিয়ার কাছে। কুড়িখানেক মুর্গি চাই কাদের আলির। কাদের আলি অবিশ্যি তা থেকে গোটাকতক তখুনি তখুনি ঝেড়ে দিত পরোটার দোকানে, তা সে কথা যাক—মুর্গি কিনতে গিয়ে দেখে মুর্গি সব বেচা হয়ে গেছে। নবগঞ্জের হাটে কে বাবা এমন শাঁসালো খদ্দের এল যে এককুড়ি মুর্গি সাত সকালে কিনে নে গেল? সাদেক বলল—কাটিকেষ্ট মিত্তির, কোথায় সব বাগানে নিয়ে ফিস্টি করবে তানারা তার লেগে। রাগে গর গর করতে করতে কাদের আলি ছুটল বাংলোয়। তখনো মেম নবগঞ্জেই রয়েছেন। মেম সব শুনে কাঁই খাপ্পা। কাগজে কী একটা খসখস করে লিখে কাদের আলিকে পাঠিয়ে দিলেন কারখানায়।

কাদের আলি বলেছিল—তাহলে কী হবে, বেটা বাস্তু ঘুঘু, সায়েব থাকে ডালে ডালে তো ও থাকে পাতায় পাতায়। আমি যেতেই কাটিকেষ্টও হাতজোড় করে তো ঢুকলো সায়েবের কামরায়—ও ঠিক খবর পেয়েছে আগে থেকে, পেছনে পেছনে ঝুড়ি বোঝাই সেই মুর্গি। সায়েব কথা বলার আগেই কাটিকেষ্টবাবু বললেন—সায়েব গোস্তাফি মাফ করবেন, একটা অপরাধ করে ফেলেছি। সায়েবও তো তাই শুনতে চাইছেন—কী ব্যাপার? না, আজ বড়োদিন, আপনার এঁটো-কাঁটা খেয়েই তো দিন কাটছে গোঁ গুষ্টির, একটু ভেট এনেছি, দয়া করে না করবেন না, বলে সেই ঝুড়িটি মাটিতে নামিয়ে রাখল। সায়েব বোকার মতন হেঁ হেঁ করে হাসলেন। আমাকে দিয়ে ঝুড়িটা বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন, সঙ্গে পৌঁছে দিতে এলেন কাটিকেষ্ট মিত্তির। সায়েব লিখে দিয়েছেন হাতে একটা চিঠি। মেম সায়েব চিঠি পড়ে মহাখুশি—মিত্তিরকে চা কেক খাওয়ালেন খুব খাতির করে—আবার যেতে বললেন। কাদের আলি বলে—আমি তো হাঁ হয়ে গেলাম ব্যাপার দেখে।

হাজার টাকা তাঁর কাছে খেলাধুলোর ব্যাপার ছিল। এখন যেমন বাড়ি ভাড়া করার সময় সেলামি দিতে হয় তখন তেমনি হাজরিবাবুকে সেলামি দিতে হত। এই হল এক নম্বর। হপ্তা তোলার পরই হাজরিবাবুকে এক হিস্যা পৌঁছে দিতে হবে সন্ধ্যে বেলায়—কম করে যদি দুশো মজুরও দেয় তো কত হয় হিসেব করুন—এই হল দু-নম্বর। আর লাইন-সায়েব বড়োবাবুর সঙ্গে যোগসাজস করে বুথ অ্যাণ্ড হেণ্ডারসনকে দুইতেন আর এক কায়দায়। অমুক ডিপার্টে অত কুলি কাজ করছে তাদের মাইনে হয় এত টাকা। কিন্তু সত্যি যদি অত কুলি কাজ না

করে? যদি তার থেকে অনেক কম কাজ করে ঐ ডিপার্টে তাহলে বাকি টাকা কি হাজরিবাবু ফেরত দেবে অ্যাসটন সায়েবকে ডেকে—ভুলেও না। লাইন-সায়েব তিন আনা, বড়োবাবু দু-আনা আর সর্দাররা চার পয়সা পাবে—হাজরিবাবু নিয়ে যাবে দশ আনা। কেন? না চাকরি যখন যাবে তখন কি বড়োবাবুর যাবে না ঝুটো খাতার জন্যে হাজরিবাবুর যাবে? সেইজন্যে।

কাটিকেষ্ট মিত্তিরের আর এক কীর্তির কথাও নবগঞ্জের চায়ের দোকানের লোক এখনও বলে। সাতাশ টাকা মাইনে পেতেন তিনি—আর প্রায় ভুলে যেতেন মাইনের দিন মাইনে নিয়ে যেতে। অ্যাসটন সায়েবের কানে উঠল কথাটা। ডেকে পাঠিয়েছিলেন তিনি কাটিকেষ্টকে। জিগ্যেস করেছিলেন—কী ব্যাপার বাবু, আমার থেকে কত বেশি পাও তুমি? কাটিকেষ্ট নাকি ঘোরে ছিল, বলে ফেলেছিলেন—কোন্‌টার কথা বলছ সায়েব, মাইনে তোমার থেকে আমি কম পাই।

অ্যাসটন সায়েবকে কাটিকেষ্ট খুশি করতেন জলপথে। ঘটা করে কালিপুজো হত বাড়িতে, তেমন পুজো ধীরুবাবুদের বাড়িতেও তখন আর হত না। সায়েব যেতেন নেমন্তন্ন খেতে। গলবস্ত্র হয়ে সায়েবকে লুচি মাংস চেয়ার টেবিলে বসিয়ে খাওয়াতেন কাটিকেষ্টবাবু। বাড়ির মেয়েরা দরজার আড়াল থেকে সায়েবের লুচি খাওয়া দেখে খুশিতে ফেটে পড়তেন। কাটিকেষ্টর মায়ের চোখে জল এসে পড়ত এমন রত্নগর্ভা তিনি—ছেলের বাড়িতে সায়েব এসে পাত পাড়ছে। কাটিকেষ্টর বউ হাতের বাজু ঘুরিয়ে অন্দরে দেমাকে ফেটে পড়ত—দেখে যাক পাড়ার ভালোখাগীরা কেবল নেকাপড়া করলেই হয় না—দাঁড়িয়ে নাতি মারি অমন নেকাপড়ার মাথায়।

কাটিকেষ্ট বলতেন—ছোট ছেলে চাঁদ চায়, বড়ো ছেলে চাঁদি চায়। চাঁদ দোব বললেই ছোট ছেলে খুশি, চাঁদি কিন্তু হাতে দিয়ে দিতে হয়। অ্যাসটন সায়েবকে দাও বাক্‌স্ বোঝাই খাঁটি বিলিতি—খুশি হয়ে থাকবে সে। কালি-পুজোর নেমন্তন্ন খেয়ে সায়েব গাড়িতে উঠতেন—উঠে দেখতেন বাক্‌স্ বোঝাই খাঁটি জিনিস—নিশ্চয় আসমান থেকে আসেনি।

অ্যাসটন সায়েবের ডানহাত বাঁ হাত কাটিকেষ্ট মিত্তির। শ্যামধারী গোলমাল করতে পারে—ডাকো হাজরিবাবুকে। অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে সামলাতে হবে—হাজরিবাবু কাঁহা হ্যায়। শ্যামধারীর জখমের দিন মতলব বেরিয়েছিল কার মাথা থেকে—সে তো হাজরিবাবু। ব্রজেশ্বরী দেবীর মিটিং ভাঙার মতলবের

গোড়ার কথাও কাটিকেষ্ট মিত্তির। কাজেই হাজরিবাবু মিত্তির মশাইয়ের সাতখুন মাপ। সেবারে শিউপূজনের সঙ্গে টাকা নিয়ে কাটিকেষ্ট মিত্তিরের গোলমাল হল। শিউপূজন বলল—কাহে রূপেয়া দেগা, হামারা তলব কা হিস্‌সা কেঁও তোমকো দেগা, বাতাও। গোলমালের ফল হল খুব খারাপ। শিউপূজন যদি আর সব মজুরের মতো হত তাহলে কিছুই হত না। কাটিকেষ্টও ভেবেছিলেন তাই হবে শিউপূজন। কিন্তু শিউপূজন ছিল একটু ঠ্যাটা মতন। সে নওজোয়ান ছেলে—সে বলল আমার মেহনতের টাকা আমি দোব না হাজরিবাবুকে। শিউপূজনের সর্দার তাকে বোঝাল অনেক কিন্তু শিউপূজন না-বুঝ। বলল, আমার টাকা আমি দেব না। যদি জুলুম করো তো খারাপ হবে। কী খারাপ হবে? না, ফাঁসিয়ে দোব বলে শিউপূজন চটের থলে-কাটা ছুরি দেখিয়েছিল। কিন্তু শিউপূজন ও-রাস্তায় গিয়ে তেমন যুত করতে পারলে না। কেননা তখনকার নবগঞ্জের নামকরা গুণ্ডা সিঁটে গুণ্ডা তখন কাটিকেষ্টর নিমক খায় মাসকাবারে। আর সিঁটে গুণ্ডাকে ভয় খেত না এমন প্রাণী তখন নবগঞ্জে ছিল না। একখানা পাঞ্চ সব সময় তার আঙুলে পরানোই থাকতো। যেদিন শিউপূজন কাটিকেষ্টকে ফাঁসিয়ে দেবে বলে শাসালে সেদিন মিলগেটে সন্ধ্যেবেলায় শিউপূজনকে ডাক দিল সিঁটে গুণ্ডা—একহাতে সাইকেলের হ্যাণ্ডেল আর এক হাতে হাণ্টার। শিউপূজনকে হুকুম দিল সিঁটে গুণ্ডা—মাফি চেয়ে নে শুয়োরের বাচ্চা মিত্তির মশায়ের কাছ থেকে। শিউপূজন শিউরে উঠে সুড়সুড় করে মাফি চেয়ে নিল। হাজরিবাবুর সেলামি তাকে দিতেই হল। চটকলে নানা কিসিমের লোক। ব্যাকা লোককে সিধে করতে হলে সিঁটে গুণ্ডার মতো লোক হাতে রাখতে হয়।

কিন্তু শিউপূজন মাফি চেয়ে নিলে কী হবে, কেলে সায়েবের কানে ব্যাপারটা তার আগেই উঠেছে। কেলে সায়েব ডেকে পাঠালেন কাটিকেষ্টকে—হপ্তার দিন এবার আমার সামনে হপ্তা দিতে হবে মিত্তিরবাবু। কাটিকেষ্ট বুঝল সব। সন্ধ্যেবেলায় একবার চুপি চুপি কেলে সায়েব যখন ছিল না তখন সায়েবের কুঠিতে গেল কাটিকেষ্ট। মেমসায়েব হ্যায়? হ্যায়। মেমসায়েবের পায়ে হাত দিয়ে দণ্ডবত হল কাটিকেষ্ট—কাদের আলির খবর ভুল হবার উপায় নেই। তারপর মিত্তির মেমের পায়ের কাছে রাখল হীরে-বসানো একজোড়া দুল আর এক ছড়া সোনার হার। 'ও ডিয়ার' বলে মেমসায়েব নাকি লাফিয়ে উঠে খুরওয়ালা জুতো দিয়ে হাত মাড়িয়ে দিয়েছিলেন কাটিকেষ্টর। কেলে সায়েব

তার পরের দিন কাটিকেষ্টকে শুধু নাকি বলেছিলেন—ইউ নটি বয়! ওটা সায়েবদের আদরের কথা। মিত্তির হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

অ্যাসটন সায়েব ছিলেন মূল ব্যাধি, কাটিকেষ্ট তার উপসর্গ—এই বলত লোকে। ব্রজেশ্বরী দেবী মূল ব্যাধির চিকিৎসা করতে চেয়েছিলেন। ব্যাধি বা উপসর্গ দুইয়ের কোনোটাই তার ফলে একটুও দমেনি। মতিচাঁদ বলল—এই কাটিকেষ্ট মিত্তিরের বাড়ি যাচ্ছিলাম আমি। আমার পাশে বসেছিল কোচবাক্সে কাদের আলি। কাদের আলির সায়েবী কেচ্ছা শুনতে শুনতে মিত্তিরের বাড়ি যখন গিয়ে পৌঁছলাম তখন মিত্তিরের মা গঙ্গাজল দিয়ে সদর দোরের সামনেটা ধুইয়েছেন, ধুইয়ে গোবর জল দিয়ে নিকোচ্ছে ঝিয়েরা তারি তদারক করছেন। ভারি ছুঁচীবেয়ে মেয়েমানুষ ছিলেন এই কাটিকেষ্টবাবুর মা। রোজ আট ঘড়া করে গঙ্গাজল লাগত তাঁর। সারা বাড়ি ধোয়াতেন তিনবার, ঝাঁটাতেন ছ-বার। অবশ্য নিজের কোমরের তাতে কোনো ক্ষয় ছিল না। চটকলেরই চারটে কুলি তাঁর বাড়িতে কাজ করত—মাইনে পেত মিল থেকে, নাম ছিল সেখানকার খাতায়। কাদের আলি গাড়ি থেকে নেমে সদর দরজার দিকে এগুতে যাচ্ছে দেখে, ওর দাড়ির দিকে তাকিয়ে আ হা হা করে উঠলেন মিত্তিরের মা। নিজের দাড়িতে হাত দিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল কাদের আলি —ওখানেই দাঁড়াও বাছা, কাকে চাই? বলে কাদের আলিকে জিগ্যেস করলেন—কিছু মনে কোরো না বাছা, এই গঙ্গাজল দিয়ে সব ধোয়ালাম, আবার নৈ নেত্য করবে। কাদের আলি বলল—ঠিক আছে মা, মিত্তির-মশাইকে বলুন গিয়ে বড়ো সায়েব তলব করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে একগাল হেসে জল হয়ে কাটিকেষ্টর মা বললেন—বড়ো সায়েব ডেকেছে, আহা বাছা আমার কেষ্টকে যে কী চোখেই দেখেছে, বাসী মুখ খুলতে না খুলতেই কেষ্ট আর কেষ্ট। বেঁচে থাকুক সব এখন, বাবা পঞ্চাননের দৌলতে ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক। তুমি দাঁড়াও, আমি ডেকে দিচ্ছি।

মিত্তিরমশাইকে গাড়ি করে পৌঁছে দিলাম সায়েব-কুঠি।

দুপুরবেলার দিকে কাদের আলি এল। শিকারী বেড়ালের যেমন লেজ নাড়ানো দেখলেই বোঝা যায় যে শিকার আছে সামনে। কাদের আলির তেমনি মোচে চাড়া দেওয়া দেখলেই বোঝা যায় যে গল্প আছে তার পেটে।

মতিচাঁদ বলল—আমরা জানতাম ও এবার কিছুই যেন হয়নি এমন ধারা মুখের ভাব দেখিয়ে বিড়ি চাইবে। তারপর আস্তে আস্তে বিড়িটার মুখের দিক

গালে পুরে তাতিয়ে নেবে, নিয়ে বিড়িটা ধরাবে, তারপর ধোঁয়া ছাড়বে একগাল, ছেড়ে বলবে—আছ তো সব বেশ আরামে এদিকে--বলে গল্প শুরু করবে কাদের আলি।

আজো ঠিক তাই হল। কাদের আলি বলল—খেলা দেখবিনে সব?

কিসের খেলা রে।

ফুটবল খেলা। মহাবীর প্রসাদ জুট মিলের সঙ্গে বুথ অ্যাণ্ড হেণ্ডারসনের খেলা হবে যে সামনের রোববার। গঞ্জের মাঠে।

নবগঞ্জের পঞ্চাননতলার মাঠে কপাটি খেলাই হত ফি বছর। সেবার থেকে মিত্তিরদের ছেলেরা ঠিক করল ফুটবল খেলা হবে। অবিশ্যি আরো পাঁচটা দল খেলতে নামবে। কিন্তু অ্যাসটনের দলের সঙ্গে ম্যাকফারসনের দলের খেলায় যে রকম ভিড় টানবে সে রকম আর কোনো খেলায় হবে না এ তো জানা কথাই। এবার পয়লা চোটের খেলাই পড়েছে এই দু-দলে।

কাদের আলি বলল—কাটিকেষ্টকে তাই তলব করেছেন সায়েব। দল বানাতে হবে। এমনিতে যে খুব একটা খেলাধুলোর রেওয়াজ ছিল চটকলে তা নয়। তবে চটকলের সায়েবদের খুব নজর ছিল এদিকে। সেই জন্যে সায়েবরা সবসময় খেলার কথায় নেচে উঠত। নবগঞ্জে এসব বালাই ছিল না। ভেলমারি ডিগ ডিগ করে কপাটি খেলেই বেশ দিন কাটছিল। ইস্কুলের ছেলেরাই যা খেলত ফুটবল আর খেলা হত নবগঞ্জের বাইরে। দেখতে দেখতে গোটা চারেক দল গড়ে উঠল শহরে। এবারে নবগঞ্জের মধ্যেই ফুটবলের হুজুগ শুরু হল। ম্যাকফারসন সায়েব নিজে খেলোয়াড় লোক—দল বানাতে লেগেছেন কোমর বেঁধে। এদিকে অ্যাসটন সায়েব নিজে খেলতে তেমন না পারলেও খেলার বেলায় বারফট্টাই ছিল খুব। কাটিকেষ্টকে ডেকেছেন—মিত্তির, একটা দল তৈরি করে ফেলো। মিত্তির বলেছে তার পরের দিন সায়েবকে নামের লিস্টি দেবে। ম্যাকফারসনের সঙ্গে আর এক মর্তোয়া লড়বেন সায়েব।

এই জন্যেই কাটিকেষ্ট মিত্তিরকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন তিনি। সায়েব বলেছেন যে বাবু হোক, বা বাবুদের পুষ্যিদের মধ্যেই হোক, যেখান থেকে হোক চটকলের অন্ন খায় এমন ধারা লোকদের ভেতর থেকে বাছা বাছা এগারোটা খেলোয়াড় জোগাড় করতে হবে। বাবুদের আত্মীয়বর্গের ভেতর যদি তেমন তেমন চোটের খেলোয়াড় কেউ থাকে মিলে তার চাকরি-বাকরির

ব্যবস্থা করবেন সায়েব। কাটিকেষ্ট বলেছে—অলরাইট স্যার। আমরা যারা শুনছিলাম, শুনে একেবারে বোম্ কেদার বলে লাফিয়ে উঠলাম। এত বড়ো হুজুগ অনেক দিন নবগঞ্জে পাওয়া যায়নি। বিনি পয়সায় কাটিকেষ্ট থুথু অবধি ফেলে না সেই কাটিকেষ্ট টিম বানাতে কী করল এবার শুনুন।

বলব কী আপনাকে সেই হপ্তাটা নবগঞ্জে খেলা খেলা করেই কেটে গেল। গঙ্গার ধারে পঞ্চাননতলার মাঠে বড়ো বড়ো কাঠের খুঁটি পুঁতে খেলার মাঠ বানানো হল। মিন্‌সিপ্যালটির রোলার চালিয়ে মাঠের খিঁচ মারা হল। রোববার দিন দুপুর থেকেই ভিড় জমে গেল লোকের। চার কোণে চারটে লাল নিশেন পুঁতে দেওয়া হল। একে নবগঞ্জে সেই পেরথম ফুটবল খেলা তায় আবার দু-দিকে দুই বাঘা সায়েবের রেষারেষি—অ্যাসটন সাহেব আর ম্যাকফারসন সায়েব। মহাবীর প্রসাদ জুট মিলের বাবুদের মধ্যে গুগ্‌গোচ্ছবের সাড়া পড়ে গেল। বুথ অ্যাণ্ড হেণ্ডারসনের বাবুরা অ্যাসটন সায়েবকে যে চোখেই দেখুক না কেন খেলার বেলায় আপন-পর বেশ টনকো জ্ঞান ছিল তাদের।

হুজুগ পেলে নবগঞ্জ আর কিছু চায় না। এ আপনার বরাবর দেখে আসছি। তা সে বকুলবালার মোকদ্দমাই হোক বা অ্যাসটনের সঙ বেরুনোই হোক, হুজুগের বান একবার এলে হয়, নবগঞ্জ কোমর বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়বে তাতে। এ বোধ হয় চটকল বাজারের ধর্ম্ম। দিনরাত চটকলের ধোঁয়া খেতে খেতে আর পাটের গাঁট হিসেব করতে করতে মানুষের মন এমন ধারা ভেতরে ভেতরে খাবি খেতে থাকে যে হুজুগ পেলে মনে করে, যাক্ একটু দম নিয়ে বাঁচি। নবগঞ্জের বাজারে তাই নিত্যি নতুন হুজুগ। গোবর্ধন শাঁখারীর মেয়েকে কালী পেল, দিনকতক সে হুজুগে কাটল মন্দ না। তারপর সে হুজুগ যখন মিইয়ে গিয়ে তেতো হয়ে গেল, এল গঙ্গার জলে কুমীরের হুজুগ—কোথায় কুমীর, শুশুক ভাসে তাকেই কুমীর বলে চালিয়ে চলল বেশ কিছুদিন। এখন এল ফুটবলের হুজুগ। ব্রজেশ্বরী দেবীর গোলমাল নিয়ে বেশি দিন কাটানোর সময় ছিল না বিশেষ। অ্যাসটন সায়েবের কিল খেয়ে কিল চুরি করার পর অ্যাসটন সায়েবের পক্ষ থেকে কোনো সাড়াশব্দ না থাকায় তেমন জমল না ব্যাপারটা। তবু সে খবরটা দিনকতক নবগঞ্জে চায়ের দোকানে জামতলির রোয়াকে সময়টাকে হালকা করে দিয়েছিল। এখন এল খেলার ব্যাপার। খেলার দিন সে এক ইলাহী কারবার। জামতলির বুড়ো বুড়ো ভটচাযেরা থেলো হুঁকো হাতে করে

খড়ম পায়ে এসেছেন খেলা দেখতে। বিন্দির গলি ঝেঁটিয়ে গিয়েছে চ্যাংড়াগুলো। সায়েবরা সব এসেছেন—চেয়ার পেতে বসেছেন মেয়েদের নিয়ে। অ্যাসটন সায়েব, ম্যাকফারসন সায়েব, কেলে সায়েব, এলিস সায়েব, আরো সব লালমুখোর দল মাঠ আলো করে বসেছে। আর দুটো মিলের রাজ্যের লোকের তো কথাই নেই। বুধোও এসেছে খেলা দেখতে—বিন্দির গলির ছেলেগুলো তাকে ঘিরে রেখেছে। সারা নবগঞ্জ ফেটে পড়েছে মাঠে। কেবল—কেবল কাটিকেষ্ট মিত্তির মাঠে নেই। শ্বশুরের অসুখ তাই তানাকে চলে যেতে হয়েছে। ঠিক আছে—অ্যাসটন সায়েবের তাতে কোনো ব্যাজার নেই। দল সে তৈরি করে দিয়ে গেছে। ভুজাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, কয়লাওয়ালা যে যেমন ছিল একদণ্ড ফুরসত করে নিয়ে চলে এসেছে পঞ্চাননতলার মাঠে। ম্যাকফারসন সায়েব আজ আর এক চোট লড়ে নেবে অ্যাসটনের সঙ্গে। মিন্‌সিপ্যালটির সেই নিশেন তোলার হাঙ্গামার পর আর এমন মজাদার বিকেল নবগঞ্জের মাঠে নামেনি। এমন মজা নিজের চোখে না দেখলে নবগঞ্জে জন্মই মিথ্যে। দাবার বোড়ে সাজানোর মতন করে মাঠ সাজিয়ে দু-দিকের খেলোয়াড়েরা সব দাঁড়িয়ে পড়ল। ম্যাকফারসনের দল লাল-সাদা আর অ্যাসটন সায়েবের দল কালো-সাদা জামা পরে মাঠ আলো করে দাঁড়াল। কিন্তু অ্যাসটন সায়েবের দল দেখে চার চৌকো মাঠের পেত্যেকজনা একবার চৌকো হাসি হেসে উঠল। নবগঞ্জে হাসির আবার রকমফের আছে। সায়েব কি বাবুর মন রেখে যে হাসি হো হো করে হাসতে হয় তাকে বলে গোল হাসি বা গোল্লা হাসি। আর যে হাসিতে লোকে লোককে উপহাস্থি করে দাঁত দেখাবে তাকে বলে চৌকো হাসি—হেসে গড়িয়ে যাওয়া যে হাসিতে অন্য লোকে না হাসি পেলেও হাসবে তাকে বলে কান-এঁটো-করা হাসি। তা এখানে অ্যাসটন সায়েবের দল দেখে সবাই একখানা করে চৌকো হাসি হাসলো।

অ্যাসটন সায়েবের দলের একেবারে বাঁদিক ঘেঁষে বিপ্‌নে ছোঁড়া দাঁড়িয়েছে। ছোঁড়া পুন্নো চক্কোত্তির ভাগ্‌নে। নবগঞ্জে যত যাত্রা-থিয়েটার হয় তার সবকটায় মেয়েছেলে সাজে সে। মেয়ে সেজে এমন মুশ্‌কিল হয়েছে তার যে চলন বলন, হাত ঘোরানো, মুখ ঘোরানো তেরচা করে তাকানো সবই হয়ে গেছে মেয়েদের মতন। সে বলের দিকে তাকিয়ে ঝাঁ করে মাথাটা নিচু করে ফেলল—কনে দেখানোর সময় মেয়েছেলেরা যেমন করে

মাথা নিচু করে থাকে ঠিক তেমনি করে। তাতে সবাই যখন হেসে উঠল তখন নজ্জা নজ্জা মুখখানা করে ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল বিপ্নে। উলু দিয়ে উঠল বিন্দির গলির ছেলেগুলো আর ফিক করে হেসে ফেলল বিপ্নে। অ্যাসটন সায়েব বড়ো বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন—উ কোন্ হ্যায় বড়াবাবো?

আর বিপ্নের পাশে ওদিকে যে দাঁড়িয়েছে তার নাম মোট্কা ভূতো। নবগঞ্জে তেরোটা ভূতো। কানা ভূতো, বামুন ভূতো, বেঁটে ভূতো, টেকো ভূতো এই রকম তেরোটা ভূতোর মধ্যে মোটকা ভূতোর শরীরখানা দেখবার মতন ছিল। মোট্কা ভূতোর বাবা ছিল অ্যাসটন সায়েবের খাস আপিসের বাবু। ছোঁড়া একখানা গতর বানিয়েছিল বটে—সাতটা শেয়ালে খেয়ে কুলোতে পারত না। হাত-পাখা নিয়ে বসেছিলেন এলিস সায়েবের মোটা মেম, ভূতোকে দেখে একবার নিজেই জোরে জোরে হাওয়া খেয়ে নিলেন।

ফর্র্ করে বাঁশি বাজল, খেলা শুরু হল। খেলা যেই শুরু হল—মুখপাতের সঙ্গে সঙ্গেই মোট্কা ভূতো গায়ে পাছে বল লাগে বলে লাফ দিয়ে সরে এসে এক্কেবারে বিপ্নের ঘাড়ে পড়ল। বিপ্নে—'আ মরণ, ঘাড়ের ওপর পড়ে কেন গো' বলে সটান মাঠের দাগের বাইরে চলে এল। ম্যাকফারসন সায়েব মুখে রুমাল দিয়ে হেসে খুন—অ্যাসটন মুখখানা প্যাঁচার মতো করে ম্যাকফারসনের দিকে তাকালেন।

চারিদিকে তো হাসির হরির লুট। বলটা ওধারের লাইনে গেছে, এমন সময় ওদিকে একটা হৈ চৈ। সাধন সাণ্ডেলের ভাই তারিণী অ্যায়সা বল হাঁকিয়েছে যে খেলা দেখছিল একটা ছোট ছেলে তার দাঁত তো উড়ে গেছেই—এখন দাঁত কপাটি। ছাড়াবে কি করে ছাড়াও। ওদিকে একটা ভিড় জমেই রইল। এদিকে খেলা চলতে লাগল। অ্যাসটন সায়েব, একফাঁকে গিয়ে দেখে এলাম, সাদা ভীমরুলের চাকের মতন করে বসে রইলেন—দলের নমুনো তো দেখছেন। কাটিকেষ্টকে একবার পেলে হয়।

আর ম্যাকফারসনের দল—সে আর কথায় কাজ নেই। ম্যাকফারসন নিজে তালিম দিয়েছে ক-দিন ধরে—ছাঁটাই করেছে দল থেকে, নতুন নতুন ছেলে যাচাই করে, দেখে বাজিয়ে পিটিয়ে তবে দল গড়েছে। সে আপনার বল মাটিতে পড়তে পায় না, ওদের পায়ে আঠার মতো লেপটে থাকে।

গোটা ছয়েক বোধহয় খেয়েছে অ্যাসটন সায়েবেরা এমন সময় মিন্‌সিপ্যালটির

সাদা ষাঁড়টাকে মাঠের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল বিন্দির গা ছেলেগুলো ষাঁড়টা বেরুবার জন্তে মাঠময় ছুটোছুটি করে, আর যেদিকে যায় মাঠের চার পাশের লোকে ছাতা খুলে তাড়া দিয়ে মাঠের মধ্যিখানেই আবার পাঠিয়ে নেয় ষাঁড়টাকে। যে বাঁশি বাজাচ্ছিল সে দু-বার ফর্র্ করে বাঁশি বাজালে—কিন্তু মোটকা ভূতো আর ষাঁড়টা অ্যায়সা দৌড়াদৌড়ি শুরু করল যে হৈ হৈ হুল্লোড়বাজির পর খেলা ভেঙে গেল। কারুর সঙ্গে কথা না বলে রাগে গর্ গর্ করতে করতে অ্যাসটন সায়েব উত্তুরমুখো চললো আর ম্যাকফারসন সায়েব হাসতে হাসতে দক্ষিণমুখো হাঁটা দিল। অ্যাসটন সায়েব রাস্তায় গিয়ে মোটরে উঠবেন—ম্যাকফারসন সায়েব চলে যাবেন কলকাতায়—কোথায়? না যেখানে অ্যাসটন সায়েবের দ্বিতীয় পক্ষ আছে সেখানে। কিন্তু ওদিকে মাঠের উত্তুর কোণে গোলমাল কিসের? দেখা গেল কে যেন কাকে পিটছে। ছোট্ট ছোট্ট ছোট্ট। কী বিত্তান্ত? না শিউপূজনকে হাণ্টার পেটা করছে সিঁটে গুণ্ডা। গিয়ে দেখি সবাই হাঁ করে তাকিয়ে দেখছে শিউপূজনকে পিটছে সিঁটে গুণ্ডা। কেন? না শিউপূজন চেঁচিয়ে নাকি বলেছে যে মোটকা ভূতো, বিপ্নে, তারিণী এদের বাপ দাদা মামার কাছে ট্যাকা খেয়ে কাটিকেষ্ট দল বেঁধেছিল ফুটবলের। ঐ যে সায়েব বলেছিল তেমন তেমন চোটের খেলোয়াড় হলে চটকলে পাকা চাকরি করে দেওয়া হবে তার—ঐ কথাই হয়েছে কাল। ঐ কথাটাই সুবিধে মতো ছেড়েছিল চটকল বাজারে কাটিকেষ্ট মিত্তির। তারপর টু-পাইস সকলের ট্যাঁক থেকে খসিয়ে খেলার দফা গয়া করে ছেড়ে দিয়েছে।

দু-পয়সার কল্যাণে ভূতো, বিপ্নে তারিণী সাণ্ডেল সব হয়ে উঠেছিল খেলোয়াড়। শিউপূজনের মহাপাপ যে ব্যাটা বলে মরেছে। শিউপূজনের রাগ ছিলই হাজরিবাবুর ওপর—কী ফিকিরে ব্যাপারটা জানতে পেরে দিয়েছে মাঠের মধ্যে কথাটাকে ছেড়ে। কাছেই ছিল সিঁটে গুণ্ডা, সে তো আর নিমক-হারামী করতে পারে না, ধরেছে ওকে। সিঁটে গুণ্ডা বেশ হাতের সুখ করছে, করেই চলেছে এমন সময় পেছন থেকে ঘাড় ধরে তাকে টেনে সরিয়ে দিল এই ধ্যাড়াঙ্গা লম্বা এক জোয়ান। আমাদের বুধো।

—কী লবাবপুত্তুর, বড্ড আরাম হচ্ছে? কিন্তু আমি যদি ঘাড়খানা এমনি করে ধরে লটকে দিই তাহলে আর দোসরা ঘাড় মিলবে না যে—বলে

এক জোর হ্যাঁচকা টান মারল বুধো।

সিঁটে গুণ্ডা ধাক্কাটা সামলে উঠে দাঁড়াল।—কে তুমি চাঁদ?

কেনরে কী করবি?

চাঁদকে আজ অমাবস্তে দেখাব।

দেখা, আমি কিন্তু মায়ের নিকে দেখিয়ে ছেড়ে দোব। চোখ বুজে যাবে না তো। বুধো হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল—রোয়াব মারছিস্, ধত্তে পারিস পাঞ্জা, বল্ শালা। সারা নবগঞ্জে সিঁটে গুণ্ডাকে কেউ শালা বলেনি কোনোদিন, দাদা বলেছে বটে। রাগে ঝাঁজে একা সিঁটে তিনটে হয়ে গিয়ে বলল—আবে চলে আয়। সিঁটে গুণ্ডার ভয়ে পিঁপড়ের গর্ত খুঁজবে এমন মায়ের দুধ বুধো খায়নি।

মাটিতে লোহার মতো দু-পা পুঁতে পাঞ্জা ধরল সিঁটে গুণ্ডা আর বুধো। তখন খেলা-ভাঙা বাবুরা সব বাড়ি চলে গেছে। শুধু চটকলের কুলি-কাবালি, শিউপূজনের ভাই বেরাদাররা আছে, আছে বিন্দির গলির ছেলেগুলো, গাড়োয়ান, বিড়িওয়ালা এরা সব। গোল হয়ে অমন বোধহয় হাজার লোক চুপ মেরে দাঁড়িয়ে গেল। পাঞ্জা ধরেছে দুই জোয়ান। পাঞ্জায় পাঞ্জায় বাধিয়ে দুজনে দাঁতে দাঁত দিয়ে হাতে চাপ দিতে লাগল এ ওকে কাবু করতে। চুপ করে দেখছে শিউপূজন, দেখছে হাজারটা লোক। চোখের পাতা পড়ছে না হাজার লোকের। হাজার লোকের বুকের ঢিপ ঢিপ কান পাতলে শোনা যাবে তখন, মুঠি আনমনে শক্ত হয়ে গেছে হাজার লোকের। হাজার লোকের মন তখন বলছে, হে বজরঙ্গ-বলী, বুধো যেন জেতে বুধো যেন জেতে। আস্তে আস্তে সিঁটে গুণ্ডার দম ভারী হয়ে এল, আস্তে আস্তে তার কপালের শির দড়ির মতন ফুলে উঠল। আর এক ঝটকানে সিঁটে গুণ্ডার হাতখানাকে পাকিয়ে তাকে পিছু ফিরিয়ে দিল বুধো। তারপরেই মারল দড়াম করে এক লাথি। মতিচাঁদ বলেছিল—বাবু, এই লাথিখানার দাম ছিল নবগঞ্জে। এই এক লাথিতে চটকল বাজারের রাজা হয়ে গেল বুধো।

শিউপূজন মার ঠেঙানি সব ভুলে চেঁচিয়ে উঠল—একসাথ্ বোলো ভাই, বুধো ভাই কি—। ভিড় আসমানের তারাকে চমকে জিগির দিল 'জয়'। তারপরেই বুধোকে সবাই কাঁধে তুলে নিয়ে নাচতে লাগল ধিনিক্ ধিনিক্ করে। বুধো লোহার মতো শক্ত পাঞ্জাখানা উঁচু করে ধরে রইল। যেন ঐ পাঞ্জা

দিয়ে রুখে দেবে সব শয়তানি সব জুলুমবাজি। বুধো বলছে যেন ভয়ো মত। বুধোর নাম ছড়িয়ে গেল সারা নবগঞ্জে। বুধোর জানের ভয় নেই। না—বুধো কাউকে ডরায় না। খাতির? হ্যাঁ, শুধু সতু বোসকে করে, আর কাউকে নয়।

মতিচাঁদ বলেছিল—সেই যাত্রাই কাটিকেষ্ট মিত্তিরের বারোটা বেজে যেত। গেল না শুধু অদেষ্টে ছিল না বলে। দু-দিন ধরে কাটিকেষ্টর কোনো পাত্তাই পাওয়া গেল না। ওদিকে দু-দিন ধরে নবগঞ্জের লোকে চায়ের দোকানে, মজলিসে, রোয়াকে মোড়ের মাথায় গুলতানি করলো কাটিকেষ্টর দলবাছাই নিয়ে, হেসে হেসে তারিণীর ফুটবল হাঁকড়ানো, মোটা ভুতোর লাফ দেওয়া আর বিপ্‌নের 'আ মরণ' বলার নকশা করে আসর জমালো ভালোই। তারপর যখন শিউপূজনের গল্পখানাও বাজারে ছড়িয়ে পড়ল তখন সবাই আর এক চোট কান-এঁটো-করা হাসি হাসলো। বলল—বাঁ হাতের ব্যাপারে কাটিকেষ্ট নিজের মা-বৌকেও রেয়াত করে না। শিউপূজনও আকোছের মাথায় গল্পটা রাও করে দিল চারিদিকে। কেবল রেগে কাঁইবিচি হল অ্যাসটন সায়েব। কাদের আলি বলে, আর ভাই, হেঁটে হেঁটে পায়ের দড়ি ছিঁড়ে গেল। সায়েব কেবলই বলছে—বোলাও শালা মিত্তিরকো। যখন তখন মুখ ছুটিয়ে মিত্তিরের মা-বাপের আর কিছু বাকি রাখছে না সায়েব। কিন্তু মিত্তির এখনো তার শ্বশুরকে দেখে ফেরেনি। সায়েব শেষ পর্যন্ত তারিণীর দাদা সাধনকে ধরতে পেরে কামরায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সাধন সাণ্ডেল তো কেঁদে কূল পায় না, শেষে বলে এসেছে যে তারিণী তার মার পেটের ভাই নয়, কাজেই সে কিছু জানে না। কাদের আলি বলল—দেখো দিকিন ঘোড়ার ডিমের হ্যাঙ্গাম, কোথায় ছোঁড়াগুলোর চাকরি হবে, তা না এখন লুকিয়ে বেড়াও, বলো যে ওরা আমার আপনার লোকই নয়। পুন্নো চক্কোত্তির আবার কথায় কথায় পৈতে ছেঁড়ার বাতিক ছিল। এক ঝোঁকে ছিঁড়ে ফেলল পৈতে, বলল—মরবে, শালা মরবে, তে রাত্তির পোয়াবে না মরবে, এই বলে দিলাম। ব্যাটা বলেছিল যে বিপ্‌নের চাকরি হবে।

কিন্তু ওদিকে কিছু হল না। মাঝ থেকে শিউপূজনকে পাওয়া গেল রেল-

পারের জঙ্গলে। ভোর রাত্তিরে জঙ্গলে গিয়েছিল লোটা নিয়ে। অনেক বেলায় আর এক দল জঙ্গলে গিয়ে দেখল শিউপূজন পড়ে আছে—মাথা ফাটা, নাক-মুখ দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে, সাড় নেই। ধরাধরি করে নিয়ে এল তারা। ডাক্তার ডাকল সবাই মিলে। ডাক্তার বলল, হাসপাতালে নিয়ে যাও তাড়াতাড়ি নইলে বাঁচবে না।

চোট খেল শিউপূজন, ক্ষেপে উঠল নবগঞ্জের চটকলিয়ার দল। মহল্লায় মহল্লায় রাও পড়ে গেল—শিউপূজন খুন হো গিয়া। দুপুর বেলায় খেতে এসে সবাই শুনল শিউপূজনের হাল। দুপুর বেলায় যখন চটকলিয়ার দল খাওয়া-দাওয়া সেরে ফের কলে যায় তখন কথাবার্তা বিশেষ বলে না। নবগঞ্জের বাবুদের বাড়ির মেয়েরা তখন দুপুরের ঘুম সারতে যায়। রাস্তায় চটকলমুখো মজুরের দলের নাগরা জুতোর থপ্‌থপ্‌ শব্দ বাজতে থাকে—শুনতে শুনতে তাদের ঘুম চোখ জড়িয়ে আসে। সেদিন হঠাৎ চটকানা ভেঙে গেল সবায়ের। বাইরে কারা চেঁচাচ্ছে—জানালার ফাঁক দিয়ে সবাই দেখলেন—চটকলিয়া কুলি-কাবালির দল দঙ্গল বেঁধে গোলমাল করতে করতে রাস্তা হাঁটছে। ত্রিভুবনের ধাওড়া, মাধো সাহুর ধাওড়া, নতুন বস্তি, পুরনো বস্তি সব জায়গা থেকে চাপা রাগের ফুলকি এদিক ওদিক ছুটতে লাগল নবগঞ্জের আকাশে। কাঁহা হ্যায় সিঁটেবাবু, বোলাও হাজরিবাবুকো। নবগঞ্জের দুপুরে আকাশের রোদ উপুড় হয়ে পড়ে আগুন ঢালতে লাগল। পাড়ায় পাড়ায় বেকার ভদ্রলোকেরা মোড়ে দাঁড়িয়ে খবর নিতে লাগলেন কী ব্যাপারটা। বহুৎ হল্লা হোগা বাবু—তারা জানিয়ে দিল। সিঁটে গুণ্ডার কলজে ফেড়ে নিয়ে আসবো। ব্রজেশ্বরী দেবীর মিটিঙে কথা শুনে শুনে একটা সুবিধে হয়েছে, চটকলের মজুর কথা বলতে আর ভয় খায় না তখন।

আর এইসব গোলমালের মধ্যে নবগঞ্জের ইস্টিশনে বসে বসে আমরা শুনতে পেলাম সতু বোস এক রাজ্যের কুলির দল পাকিয়ে অ্যাসটন সায়েবের বাংলোয় গিয়ে হাজির হয়েছে। সায়েব তখন ছোটা হাজরি খেতে বাংলোয় গেছে।

কাদের আলির কাছে খবর পেলাম সব তার পরের দিন। সতু বোসকে জিগ্যেস করেছিল সায়েব—তুমি আবার কেন? সেবার তুমি জবাব পাওনি আমার? সতু বোস বলেছিল, তোমার কারখানার কুলিদের ওপর

বহুৎ জুলুম   শ্যামধারীকে তোমরা জখমী ভাতা ঠকিয়েছ, শিউপূজনকে তোমার হাজরেবাবুর '   খুন   -কেননা   হাজরেবাবুর জালিয় খিলাফ দাঁড়িয়েছিল। এখন এর বিচার হবে কিনা জানাও। সায়েব বলেছে—আমি তো বলেছি সেবার তোমার কংগ্রেসের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নেই? আর কংগ্রেসের লোক হিসাবে তুমি এসেছই বা কেন আমার কাছে।

সতু বোস বলেছে—আমি চটকল মজদুর ইউনিয়নের লোক হিসাবে এসেছি।

সায়েব বলেছে—বুথ অ্যাণ্ড হেণ্ডারসন ওর নামও শোনেনি এখনো।

সতু বোস জবাব দিয়েছে—এবার থেকে রোজই শুনবে। এখন আমার কথার জবাব দাও। শিউপূজন হাসপাতালে, সে কবে ছাড়া পাবে ঠিক নেই, যবেই পাক ততদিন তোমাকে মাইনে দিতে হবে। তার চাকরি সে এলে তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে, কাটিকেষ্টবাবুর ব্যাপার তল্লাশ করতে হবে।

সায়েব বলেছে—অল রাইট। সামনের রোববার তুমি তোমার ওই ব্লাডি ইউনিয়নের জনা কতক মেম্বর নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা কোরো আপিসে। পরামর্শ করে দেখা যাবে। এখন তুমি আমার লোকদের ছেড়ে দাও—মিলের বাঁশি বেজে গেছে। বলে সায়েব গট গট করে ওপরে উঠে গেছে।

সতু বোস চেঁচিয়ে ব্যাপারটা জমায়েতকে বুঝিয়ে বলল বটে তবে তেমন খুশি হল না ওরা। কাদের আলি বলেছিল যে, সে বুধোকে বলতে শুনেছে সতু বোসকে—ভুল হয়ে গেল দাদা, এখন এই দঙ্গল সামলানো মুশ্‌কিল হবে। হলও তাই। মায়ের দয়া রোগ জানেন তো যদি ঠিক ঠিক রোগ বেরুতে পেল তো অল রাইট, যদি তা না হয়ে রোগ দেবে যায়, নিয়ে আসে নানান উপসগ্‌গ, সায়েব, কাটিকেষ্ট দুইই তাঁদের নাগালের বাইরে। সিঁটের কোনো পাত্তা নেই। কিন্তু হাত নিশপিশ করছে, যো কুছ হো একটা কিছু করা দরকার। ফল হল এই বেহুদা কেরামত কাবলিওয়ালা মিলগেটের সামনে মার খেয়ে গেল। এ শালা আর এক নম্বর লুটেরা। কী একটা ব্যাপার নিয়ে গুদামঘরের সামনে একটা দরোয়ানের কপালে ঢিলে ঝেড়ে দিল কে একজন। কাস্টিং ঘরের সামনের কাঁচের জানলাটা ঝনঝন করে ভেঙে গেল। হল্লার মধ্যে মিলের বাইরে ভুজাওলা বিশ্বনাথের

ছোলাবাদাম সব লুট হয়ে গেল। তারপর খানিকক্ষণ দাপাদাপি করে সর্দারদের সঙ্গে খানিকক্ষণ বচসা করে বিকেল নাগাদ সব জুড়িয়ে গেল।

ওদিকে সন্ধ্যে নাগাদ পৌঁছে গেল কাটিকেষ্ট মিস্তির। সায়েবের কামরায়। সে ঝোপ বুঝে কোপ মারতে ওস্তাদ। সায়েব কাটিকেষ্টকে পেয়ে হাতে স্বগ্‌গ পেলে। কাদের আলি বলে সেদিন রাত এগারোটা পর্যন্ত মিস্তিরের সঙ্গে গুজুর গুজুর ফুস্থুর ফুস্থুর করল সায়েব। ফুটবল খেলার কথা মাথায় উঠেছে তখন।

চটকল শহর আশ্বিন মাসের আকাশ। এই তার এক চেহারা, ঐ তার দোসরা চেহারা। এই মেঘ ঐ রোদ। এই ঝিকিমিকি খেলছে মাঠে, ঐ গুড় গুড় করছে আকাশ। কাটিকেষ্টর দলের ফুটবল খেলার কথা লোকে তখন ভুলে গেছে। নয়া গোলমাল বেধে উঠেছে তখন শিউপূজনের জখম নিয়ে, চটকল মজুরের হল্লা নিয়ে। নবগঞ্জে তখন তাই নিয়েই চারিদিকে মজলিস বসছে। বাবুদের মধ্যে যারা ছিলেন মিন্‌সিপ্যালটি নিয়ে মাতোয়ারা তারা সব সতু বোসকে গাল পাড়তে লাগলেন। ছোটলোকেদের মাথায় তোলা ঠিক হচ্ছে না সতু বোসের—হলই বা সায়েব, তা বলে কি তার বাংলো চড়াও হয়ে তাকে শাসিয়ে আসতে হবে। মানীর মান না রাখতে পারলে তাঁদের মানের গোড়াতেই যে ছাই পড়ে যাবে। বাবুদের ঘরের ছেলেগুলো সামনা সামনি বাপ দাদার ভয়ে চুপ মেরে রইল বটে, লুকিয়ে লুকিয়ে সতু বোসকে বলল—ঠিক আছে দাদা চালিয়ে যান। সতু বোস বলল—তা এ তো আমার একার কাজ নয়, আপনারাও আসুন। একজন বলল, বাব্বাঃ, জ্যাঠামশাই তাহলে খড়ম পেটা করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে না। বলল; জানেন, স্বদিশি করতে আমার খুব ইচ্ছে কিন্তু জ্যাঠার ভাতে থাকি কিনা বুঝেছেন তো?

শহরের ব্যবসাদার যাঁরা ছিলেন, যেমন ধরুন গিয়ে যদু পাল, নিত্যহরি সাধুখাঁ, যাদের ট্যাকাপয়সাও অঢেল বাজারে বেশ মান ইজ্জতও আছে তাঁরা চেষ্টা করতে লাগলেন বাজারে কংগ্রেসের আপিসের টিনের ঘরখানা থেকে কেমন করে সতু বোসকে তাড়ানো যায়। বাজারের মধ্যে ওসব হুজ্জুত ভালো নয়। তা ছাড়া চটকল বাজারে কুলি ঘেঁটিয়ে শেষটা কী বিপদ ডেকে আনে তার ঠিক কী, ব্যবসাপাতি সাজিয়ে বসে আছি শেষটা কী গণেশ ওল্টাবো সব।

মাধো সাহু এসব হুল্লোড় দু চোখে দেখতে পারেন না, তিনি পরামর্শ করতে গেলেন ভজন সর্দারের সঙ্গে, সে গেল রহমত খলিফার কাছে। সর্দারেরা ঠিক করল—চটকল বাজারের হুজ্জুতের মধ্যে আমরা নেই।

শুধু বুধো ঘুরে বেড়াতে লাগল সতু বোসকে নিয়ে মহল্লা থেকে মহল্লায়, এ বস্তি থেকে ও বস্তি। চটকল মজদুর ইউনিয়নের চাঁদা দাও।

মতিচাঁদ বলেছিল—বাবু সেই পয়লা টাইম আমরা দেখলাম যে চটকলের কুম্ভকর্ণ আড়মোড়া ভাঙছে। শিউপূজনের ওপর হামলার ফলে নবগঞ্জের চটকলিয়ার দল ফণা ধরতে শুরু করল। ধরতে শেখাল বুধো। বুধো সিঁটে গুণ্ডার হাত মুচড়ে ধরার পর থেকেই মহল্লায় মহল্লায় তার কদর বেড়ে গেল হু-হু করে। যেখানেই সে যায় কুলি কাবালির দল, বিন্দির গলির ছেলেরা একবার করে বুধোর লোহার মতো শক্ত পাঞ্জাখানায় হাত মেলায়। শ্যামধারীর কাটা পায়ের ছবিটা তখন নবগঞ্জের চটকলিয়ার চোখে দিনরাত ভাসছে। লাইনবাবু, ওভারসিয়ার বাবুদের জুলুম বেড়েই চলেছে। হাজরিবাবুর হিস্যা দিতে দিতে কলজে শুকিয়ে যাচ্ছে—মাধো সাহুর ভজন সর্দারের টাকতি সুদের বায়নাক্কা মেটাতে জান বরবাদ হচ্ছে। রোজ খাটাখাটনির কোনো শেষ নেই যেন। এর মধ্যে চটকল মজদুর ইউনিয়নের এলান বেজেছে সতু বোসের গলায়। বুধোর বিরাট পাঞ্জা বারবার বলছে যেন—ডরো মত। আগে বাঢ়ো। শ্যামধারী, শিউপূজন, হরিয়া, জানপহেচান নেই নবগঞ্জের কত লোকের অভিশাপ নবগঞ্জের আকাশে—নবগঞ্জের ভদ্দরলোকেরা ভয়ে ভয়ে দেখল যে গোঁয়ার কাটমুখ্যু অনেক কালের চোট খাওয়া চটকলিয়ার দল এবার ফয়সালা চাইছে। পাঞ্জা ধরতে চাইছে একবার গদ্দার নসিবের সঙ্গে।

কিছু একটা করা দরকার। অ্যাসটন আর কাটিকেষ্ট দুজনেই বুঝছেন—কিছু একটা করা দরকার। কাজেই অ্যাসটন সায়েব আর কাটিকেষ্ট দুজনে দু-মুখো রাস্তা ধরলেন। একই রাস্তার দুটো মুখ। মিন্‌সিপ্যালটিতে মিটিং ডাকলেন সায়েব। ওদিকে সর্দারদের নিয়ে মিটিং ডাকলেন কাটিকেষ্ট মিত্তির। তার নিজের বাড়িতে।

অ্যাসটন সায়েব মিন্‌সিপ্যালটিতে শহরের তা-বড় তা-বড় ভদ্দরলোকের জড়ো করলেন। বললেন যে কংগ্রেস-ফংগ্রেস চুলোয় যাক, যা ইচ্ছে হোকগে মরুকগে—কিন্তু এই যে চটকলিয়াদের ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছে দু-চারজন লোক এর নতিজা খুব খারাপ। এরা বিগড়ালে শহরের জান মান রক্ষে করা দায় হবে। সব

ব্যাটা চোর, গুণ্ডা, বদমাশ—চটকল খোলা আছে তাই কোনোরকমে ঠাণ্ডা আছে। আমি চেয়ারম্যান হিসেবে আপনাদের জিগ্যেস করছি আপনারা বলুন কী চান? শহরে গোলমাল, হাঙ্গামা, হুজ্জুত চান আপনারা? যদু পাল আর নিত্যহরি সাধুখাঁ লাফিয়ে উঠল, বলল—না, তা হলে আমরা ধনে প্রাণে মারা পড়ব। শহরে ব্যবসাপাতি বন্ধ হবার মতো কিছুর মধ্যে আমরা নেই। রায়বাহাদুর ভূষণ মুখুজ্যে আর ধীরু বাঁড়ুজ্যে মশাই বললেন যে নিশেন তোলা নিয়ে রাজার জন্মদিনে সেবার যে হাঙ্গামা হয়েছে তাতেই যথেষ্ট কেলেংকারি হয়েছে। আবার যদি কিছু হয়—ভূষণ মুখুজ্যে বললেন, তা হলে এ শহরের বাস তাঁদের ওঠাতে হবে।

ধীরু বাঁড়ুজ্যে মশাই বললেন—তা ছাড়া বুধো সিঁটেকে লাথি মেরেছে কেন তারও একটা মীমাংসা হওয়া দরকার। সিঁটে গুণ্ডা হতে পারে কিন্তু সে ভটচাযের ছেলে, ব্রাহ্মণ সন্তান, ও ছোঁড়া দুলে হয়ে বামুনের গায়ে হাত দেবে কেন? জামতলির ভটচায্যিরা বললেন, ঠিক কথা, এ কথার অর্ধেকও সত্যি।

অ্যাসটন সায়েব বললেন—তা হলে যদি সত্যি সত্যি শহরে হাঙ্গাম হুজ্জুত বন্ধ রাখতে চান তাহলে আসুন শহরের সব ভদ্দরলোকেরা মিলে ডেপুটি সায়েবের কাছে একটা দরখাস্ত করা হোক। তিনি যা ব্যবস্থা করতে হয় করবেন এখন। আমি কাল তার সঙ্গে দেখা করতে যাব—দরখাস্তখানা হাতে করে দিয়ে আসতে পারি।

কাটিকেষ্ট মিত্তির মিলের সর্দারদের নিয়ে জমায়েত বসালেন তাঁর বাড়িতে। পরে খবর পেলাম যে ওখানে নাকি ওসব বড়ো বড়ো কথা কিছুই হয়নি। এবারে গণেশ পুজোয় কেমন জলুস বেরুবে, কেমন রোশনাই হবে তারি সব নাকি সলা পরামর্শ হয়েছে সেখানে। কাটিকেষ্ট বলেছে যে সে নিজে পঞ্চাশ টাকা চাঁদা দেবে চৌমহল্লার পুজোয়, আর সর্দাররা যদি ধরা-করা করে তা হলে বড়ো সায়েবও এবার আরো বেশি টাকা চাঁদা দেবে। কিন্তু সতু বোস নাকি সায়েবের বাংলোয় চড়াও হয়ে সায়েবের মেজাজ বিগড়ে দিয়েছে, এটা ঠিক হচ্ছে না। সায়েব বলেছে যে সর্দাররা তার লেড়কার মতন—কিন্তু সর্দারেরা তাকে নাকি ঠিকমত মদত দিচ্ছে না। সর্দারেরা বলেছে—এ কভি হো নেহি শেকতা। আমরা সব কাল সায়েবের সঙ্গে মোলাকাৎ করব।

তারপর গণেশ পুজো নিয়ে কথা হয়েছে। এবার ত্রিভুবনের ধাওড়া যদি লাঠি খেলায় জেতে তা হলে মাধো সাহুর বস্তির আর ইজ্জত থাকবে না। এই ইজ্জতের ওপর অনেক কিছু দাঁড়িয়ে আছে। আজ যদি ত্রিভুবনের বস্তির পালোয়ানেরা কুস্তিতে, লাঠিতে, গণেশ পুজোয় জলুসে আগে বাঢ়ে —তা হলে নবগঞ্জের চটকলিয়াদের কাছে ত্রিভুবনের ইজ্জত বেড়ে যাবে। মানে কেউ টাকা ফাঁকি দেবে না, ত্রিভুবনের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হলে বলবে, নমস্তে, ছোকরারা টিট্ থাকবে।

কাটিকেষ্ট মিত্তিরের সঙ্গে সে কথাও হল মাধো সাহুর। আড়ালে আলাহিদায়। কাটিকেষ্ট ছাড়া এসব দিলকা বাত বুঝবেই বা কে?

তারপর সবাই চলে গেলে—মিন্‌সিপ্যালটির কেরাসিনের আলো নিভে গেল। তখন সেই অনেক রাতে চুপি চুপি এসেছিল সিঁটে গুণ্ডা। কানা মহেশ তাকে বিড়ির দোকানে বসে বসে দেখেছিল সে কাটিকেষ্ট মিত্তিরের বাড়িতে ঢুকছে।

রাত্তির বারোটার পর সিঁটে গণ্ডা সেখান থেকে বেরুল। কেউ জানে না, জানার উপায়ও ছিল না যে কী কথা হয়েছিল এই দুই মক্কেলে।

অ্যাসটন সায়েব দরখাস্ত নিয়ে তার পরের দিন হাকিম সায়েবের সঙ্গে দেখা করেছিলেন কিনা সে অ্যাসটন সায়েব জানে। হাকিম সায়েব জানে। মতি-চাঁদ বলল—আমরা জানি না। আমরা তখন গণেশ পুজোর রোশনাই নিয়ে মেতে গেছি। চতুদ্দোলায় গণেশ-জিউ বসবেন। আলো জ্বালিয়ে, ঢাক পিটিয়ে, নেচে কুঁদে গণেশ পুজোর মিছিল যাবে শহরের বড়ো বড়ো রাস্তা দিয়ে। গণেশ পুজো যেমন তেমন করে সারা হত—কিন্তু ভাসানের মিছিল দেখবার মতো ছিল। হুজুগে হুজুগে ফুটবল খেলার কথা সবাই ভুলে গেল। কাটিকেষ্ট আবার বুক ফুলিয়ে বেড়ানো শুরু করল। তার বউ নতুন এক জোড়া অনন্ত পরে একদিন পেন্নাম করে এল গোপীবল্লভের মন্দিরে গিয়ে। সিঁটে গুণ্ডাও মাথা চাড়া দিল আবার। বুধো আমাদের বলল—সতুদা মিছেই এখন ঘুরছে, ও গণেশ পুজো না কাটলে আর কিছু হবে না।

গণেশ পুজো। নবগঞ্জে গণেশ পুজো এক দেখবার জিনিস। পুজো কবে হয় সে খবর কেউ রাখে না—গণেশ পুজোর বিসজ্জনের দিন একটা দিনের মতো দিন। সেদিন গণেশ পুজোর ভাসান। গুড়গুড়, গুড়গুড়, গুড়গুড়,

গুড়গুড় করে ঠিক দুপুরবেলা থেকে বিলিতি বাজনা বাজতে শুরু করল। ঢাক কাঁসি আরম্ভ করল ঝিনকে ঝাজিম ঝিম, ঝিনাক ঝাজিম ঝিম— ব্যাগপাই কাঁ কাঁ করে উঠলো, পোঁ ধরল সানাই। সারা নবগঞ্জের বাতাসে তখন হরেক রকম বাজনার শব্দ ভাসছে। ত্রিভুবনের ধাওড়া থেকে ভেসে আসছে রামশিঙের পিলে চমকানো আওয়াজ। তখন রাস্তায় ভিড় নামেনি। ধাওড়ায় ধাওড়ায়, বস্তিতে বস্তিতে তোড়জোড় শুরু হয়েছে। মতিচাঁদ বলেছিল—আমাদের সেদিন মরসুম। সব ঘোড়ার গাড়ি সেদিন মিছিলে ভাড়া হয়ে যায়। ঘোড়ার গাড়ির মাথায় বড়ো বড়ো মাটির জালা চাপিয়ে দেওয়া হয়। জালা ভর্তি ভেলিগুড়ের আর সরবতী লেবুর সরবত। মিছিলে যারা সামিল হয়েছে তেষ্টা পেলে খাবে তারা।

মতিচাঁদ বলল—মাধো সাহুর বস্তির মিছিলের সঙ্গে ছিলাম আমি। চটকল ফটকের পাশ দিয়ে বড়ো রাস্তার এসে দাঁড়িয়ে গেল সবাই। সামনে অমন দশখানা গণেশ ঠাকুরের চতুর্দোলা। কোনোটা ইঁদুরের মতন, কোনোটা জাহাজের মতন, কোনোটা ময়ূরপঙ্খী, কোনোটা আবার চারতালা বাড়ির মতন করে সাজানো হয়েছে। এক এক মহল্লার এক একরকম সাজ। রঙ বেরঙের কাগজ কেটে বাঁশ বাখারি বেঁধে বাহারে সব চতুর্দোলায় গণেশজীকে বসিয়েছে। সামনে গ্যাসবাতি মাথায় কিছু লোক। সন্ধ্যে হলে জ্বেলে দেবে।

এক এক মহল্লার যত সব মোড়ল মাথা ঝিন্দে বড়ো বড়ো ছ-হাত লাঠি নিয়ে মিছিলের মধ্যে মোচে চাড়া দিতে দিতে চলেছে। আর সকলের হাতে লাঠি, মাথায় পক্কর। লাঠিতে লাঠিতে বাজছে ঠকঠক ঠকঠক। কালো প্যাণ্ট আর গেঞ্জি পরা ডাঁটো চেহারার ছেলে মুখে হুইশিল বাঁশি নিয়ে এক একটা মিছিলের আগে আগে চলেছে। ঢাক ঢোল, বিলিতি বাজনা, রামশিঙে, বিউগিলের হুল্লোড়ের মাঝে মাঝে ফর্‌র্‌র্‌ করে হুইশিল বাজছে। থেমে পড়া মিছিল বুঝছে রাস্তা ক্লিয়ার আবার এগুচ্ছে। শহরের বড়ো চৌমাথায় সব মিছিলেরই দশ মিনিট করে টাইম পাওনা। চৌমাথার চারধারে ছাতে, পাঁচিলে, রোয়াকে, রাস্তার আশে পাশে কেবল লোক লোক আর লোক। মেয়েছেলে, ব্যাটাছেলে ছেলেমানুষ বুড়ো। কেরামতি দেখানোর সেরা জায়গা সেটা। দশ মিনিট ধরে এক একদল চৌমাথায় দাঁড়িয়ে থাকবে। দশ মিনিট ধরে নবগঞ্জের চৌমাথায় মস্ত বড়ো চত্বরে

খেলা দেখাবে মিছিলের লোক। ক্যাটা ক্যাটা ক্যাটা ক্যাটা ক্যাটা ক্যাটা করে বাজনা বেজে বলে একনাগাড়ে। লাঠি খেলছে সীতারাম। চরকির মতন বন্‌বন্‌ করে ছ-হাত লাঠি ঘুরিয়ে চলেছে সে। ইঁটের টুকরো ছুঁড়ে দিলে ইঁট ছিটকে বেরিয়ে আসবে। এদিকে লম্বা ভোঁতা তরোয়ালের কনুই অবধি হাতলে হাত ঢুকিয়ে ফেলল ছেদিলাল। লকলক করে উঠল তরোয়ালের রুপুলি জিভ। 'বহুত আচ্ছা ছেদিলাল'। সীতারামের লাঠি খেলা শেষ হতে না হতেই তরোয়ালের খেলার মধ্যেই তুমুল বাজনা-বাদ্যির মাঝখানে আজব খেলা দেখাবে বিশুয়া। একটা সতেরো হাত লম্বা লাল কাগজের সরু ফালিকে অ্যায়সা কায়দায় ঘোরাবে যে মনে হবে ঠিক যেন আগুনের ভেল্কিবাজির মাঝখানে বিশুয়া দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারপরে হবে সেই খেলা—যে খেলা দেখার জন্যে চৌমাথা বোঝাই বালবাচ্চার দল হাঁ করে এতক্ষণ আছে। দুটো পেল্লায় বাখারির দু-মাথায় তেলজুট বেঁধে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হবে। সেই জ্বলন্ত ডাণ্ডা দুটো নিয়ে দু-হাতে বাঁই বাঁই করে ঘোরাবে সুয্যি। ছেলেপিলের দল হাঁ হয়ে যাবে। তারপর সুয্যি সবাইকেই তাজ্জব বানিয়ে দেবে। একটা লোহার চার চৌকো ফেরেমের চারদিকের ডাণ্ডিতে তেলজুট জড়িয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। থামিয়ে দেওয়া হয় বাজনবাদ্যি। থমকে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখে সকলে নিসাড় হয়ে। তারপর দুজন লোক সেটাকে মাটি থেকে উঁচুতে সোজা করে ধরে দাঁড়াবে। সুস্‌ করে একটা শিস দিয়ে এক ডিগবাজি খেয়ে সুয্যি পাখির মতন বেরিয়ে যাবে সেই ফেরেমের ভেতর দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে ফর্‌র্‌র্‌ করে বাঁশি বাজিয়ে দেবে সেই কালো প্যাণ্ট পরা ছেলেটা আর বাজনা-বাদ্যি গুড় গুড় করে উঠবে। এগিয়ে যাবে এই মিছিলটা সামনের দিকে। শত শত লাঠিতে ঠকঠকি বাজাতে বাজাতে চৌমাথায় তখন ঢুকবে এর পরের দল।

মতিচাঁদ বলেছিল, সেদিন মাধো সাহুর মহল্লার মিছিলের চৌমাথায় ঢুকতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। মাধো সাহুর বস্তির অন্য আইটেম ছাড়া দুটো নতুন আইটেম ছিল। এক নম্বর—দুটো ছোঁড়া মেয়েছেলে সেজেছিল তাদের নাচ। আর দু-নম্বর ছিল মুখে কেরাসিন নিয়ে কুলকুচো করে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে আগুন ধরানো। একজন পাশেই থাকে জ্বলন্ত মশাল নিয়ে, সে অমনি সঙ্গে সঙ্গে আগুনটা ছুঁইয়ে দেয় সেই কুলকুচোয়— দপ্‌ করে শব্দ হয়ে অনেকখানি ধরে জ্বলে ওঠে। এ খেলাটা বেশ জমে

উঠেছে। আমার গাড়ির জালাও ইদিকে বেশ খালি খালি হয়ে গেছে। মিছিলের মশাল সব হাতে হাতে জ্বলে উঠেছে। গাড়ির ওপর থেকে একবার পেছন পানে চেয়ে দেখলাম সেরেফ লোকের মাথা, মশাল আর গণেশজীর চৌদোলার রঙ বেরঙের বাহারী আলো। লাঠি আর লাঠি।

এরি মধ্যে কখন যে চৌমাথার বাঁদিকের রাস্তা দিয়ে মহাবীর প্রসাদ জুট মিলের জলুস বাজনা বাজাতে বাজাতে এসে দাঁড়িয়ে গেছে টের পাইনি। বলল নাকি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে ওরা। আর দাঁড়াতে পারছে না। এবার ওরা রাস্তা ছেড়ে দিক, ওরা ওদের মিছিল বার করে নিয়ে যাক। বাজনা-বাত্তি আগুন খেলার মাঝখানেই দেখা গেল এদিক ওদিক দু-দিকেরই মাথা মাথা লোকেরা বচসা জুড়ে দিয়েছে। নেহি হোগা আর জুরুর হোগার ঝগড়া।

ঠিক এই সময় আমার গাড়ির সামনে দিয়ে সুট করে এগিয়ে গেল একটা লোক। এক পলকেই চিনে ফেলেছিলাম তাকে—সিঁটে গুণ্ডা। সিঁটে গুণ্ডা সামনের ভিড়ে মিশে যাওয়ার একটু পর থেকেই হঠাৎ শোনা গেল এদিক থেকে বলছে—হাঁ, ঠিক বাত, বদলা নিতে হবে। শালারা ফুটবল খেলায় জিতে মনে করেছে কী, সাপের পাঁচ-পা দেখেছে। জরুর হটাবে না জলুস, ফুটানি দেখাতে এসেছে। গেন্দা খেলায় জিতে আস্কারা পেয়েছ? হটাও ভুসিমাল। দাঁড়াতে পাচ্ছে না—কোমর দরদ করছে। কোমর দরদ করছে তো ঘরে যা, খোকার মাকে বল গে যা কোমরে হাত বুলিয়ে দেবে।

ওদের দলের কালো প্যাণ্ট ডোরা গেঞ্জি হুইশিলওয়ালা খানিকক্ষণ বচসা করতে করতেই হঠাৎ এদের পেছু ফিরে ওদের মিছিলের দিকে মুখ করে বাজিয়ে দিয়েছে তার হুইশিল। হো-ও-ও করে আওয়াজ তুলে লাঠি ঠক ঠক করে হাজার লোক এগিয়ে এল এদিকে। সিঁটে গুণ্ডা বাঁই করে সোডার বোতল ছাড়লে। ভট করে আওয়াজ করে ফেটে গেল আর দুটো লোক মাটি নিল। মারামারির আর বাকিটা কি বলুন। লাঠি ইঁট সমানে চলল। আমার গাড়ির পেছনে একটা বাক্স বসানো ছিল। কোচবাক্স থেকে আমি সেটা নজরে রাখতে পারিনি। এখন দেখলাম সে বাক্সটা সোডার বোতলে ভর্ত্তি। সিঁটে গুণ্ডা নাকি আমার গাড়ির পেছনেই ছিল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই রাস্তা ফাঁকা হয়ে গেল। যে যেদিকে পারল পালালো। গণেশজীর চৌদোলা মাটিতে রেখে ভারিরা পালিয়েছে। রাস্তার কেরোসিনের আলো ইঁট খেয়ে

নিভে গেছে। মারামারি হয়তো করেছে দু-দশজন লোক। বাকি লোক বুদ্ধুর মতন 'বহুৎ মার হোতা' বলে ভেগেছে। যাবার পথে দোকান ভেঙেছে। যার যার ওপর রাগ ছিল সে তাকে ঠেঙিয়েছে। দুটো ঘোড়ার গাড়িতে আগুন ধরিয়ে গেছে। কেরোসিন তেল ঢেলে মশাল দিয়ে জ্বেলে দিয়েছে। ঘোড়াগুলোকে কেউ হয়তো খুলে দিয়েছে। তারা ছুটে পালাবার সময় চাট দিয়ে ক-জনকে বসিয়ে দিয়ে গেছে। সেই মেয়েছেলে সাজা ছোঁড়া-দুটোকে দুটো মাতালে ধরেছিল—তারপর ছেড়ে দিয়েছে—অবিশ্যি ঘা কতক দিয়েছে বেশ করে। আধঘণ্টার মধ্যে সারা শহর ভয়ে দরজা বন্ধ করে সন্ধ্যে আটটায় রাত নিশুতি বানিয়ে ফেলল। একঘণ্টা বাদে ফাঁড়ি থেকে দশজন পুলিস নিয়ে হাবিলদার ছোটবাবু বেড়াতে এলেন। তখন ঘোড়ার গাড়িগুলো জ্বলছে দাউ দাউ করে—তা নইলে রাস্তা ফাঁকা ভোঁ ভাঁ। গণেশজীর চৌদোলাগুলো পড়ে রইলো অনেক রাত অবধি।

সিঁটে গুণ্ডা মারপিট শুরু হতেই কোথা দিয়ে পালিয়েছিল কেউ দেখেনি। সেখান থেকে সে সটান চলে গিয়েছিল কাটিকেষ্ট মিত্তিরের বাড়ি। নিঝুমপুরী শহর পেরিয়ে কাটিকেষ্ট মিত্তির সিঁটেকে নিয়ে চলে গেল অ্যাসটন সায়েবের কুঠিতে। কাদের আলির খবর—রাত তখন অনেক, ফাঁকা ধু-ধু রাস্তার লাল সুরকির দিকে তাকিয়ে সায়েব খালি খালি ঘড়ি দেখছিল আর বাগানে পায়চারি করছিল। কাটিকেষ্ট আসতেই সায়েব একেবারে লাফিয়ে এগিয়ে গেল। কাদের আলি বলে—কাটিকেষ্ট পিশাচের মতন হাসছিল, সিঁটে গুণ্ডা হাত কচলাচ্ছিল আর হেঁ হেঁ করছিল। সায়েব বলল—মিত্তির তুম বহুৎ খলিফা আদমি।

সায়েব কাটিকেষ্টকে কী সব বলল, তারপর আমাকে বলল—গাড়ি বাহার করনে বোলো। গাড়ি বেরুলো। সায়েব আর কাটিকেষ্ট গাড়িতে উঠলেন। সায়েব হুকুম করলেন থানামে চলো। সিঁটে গুণ্ডা বলল—তাহলে আমি কী করবো দাদা, এখেনেই······গাড়ি থেকে সায়েব হুকুম করলো কাদের আলিকে—উনকো বাগিচামে একঠো কুরসি দেও বৈঠনেকে লিয়ে। হাসতে হাসতে গল্প করতে করতে কাটিকেষ্ট সায়েবের সঙ্গে চলে গেল। আজ কাটিকেষ্ট ভারী খুশি—আজ তার জিত। এক চালে আজ সে অনেক বাজি মাত করেছে।

ওরা চলে গেল। সিঁটে গুণ্ডা চুপ করে বসে রইল। কাদের আলি বলে—আমার সঙ্গে দু-বার কথা পাড়ার চেষ্টা করল সিঁটে গুণ্ডা—আমি সাড়া দিলাম না। বেটা ডরপোঁকের বাদশা। ও বসে রইল। আর আমি ওকে দেখিয়ে দেখিয়ে মুর্গি জবাই করা ছুরিটা শানাতে লাগলাম ওর সামনে বসে। শান দিই আর একবার করে মুখের দিকে তাকাই ওর দিকে। কিছু না একটু রগড় করা আর কি। শোন্ শান্ নিঝুম রাত, শালা একবার আমার দিকে তাকায় আর একবার রাস্তার দিকে তাকায়—যদি লোক দেখে রাস্তায় তো আরো চমকে ওঠে।

এমন সময় একটা কালো পেঁচা সায়েব বাগানের ঘোড়ানিম গাছের তলায় ক্যাঁ ক্যাঁ করে ডেকে উঠল। কাদের আলি বলল—সিঁটে গুণ্ডা চেয়ার ছেড়ে খাড়া দাঁড়িয়ে গেল—মনে হল যেন এবার দৌড় মারবে। ব্যাটার মুখের দিকে তাকিয়ে—কাদের আলি বলেছিল, আমার মায়া হল, পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করে ওর দিকে ছুঁড়ে দিলাম, বললাম—বোসুন, ভটচাযিয মশাই, ভয় নেই, এখানে কেউ আসবে না। এর নাম সায়েব-কুঠি।

মতিচাঁদ বলেছিল—ওর পষ্ট মনে আছে ঠিক তার পরের দিন দুপুর বেলা নবগঞ্জের পুলিস শহরে ঢোল দিল। হীরুর গাড়িখানা ভাড়া নিয়ে হাবিলদার সায়েব নিজেই বেরিয়েছেন ঢোল দিতে। লোকেদের শুনিয়ে শুনিয়ে ঢোল বাজল—আজ থেকে শহরে একশ চৌ-চল্লিশ জারি হল। পাঁচ আদমির বেশি একঠাঁই জড়ো হবে না, লাঠি ঝাণ্ডা ডাণ্ডা হাতে রাখবে না, রাখলে ফৌজদারী সোপরদ্দ হবে—ডুম ডুম ডুম।

ইস্টিশনের সামনেটায় যখন ঢোল বাজছিল তখন বুধো সেখানে হাজির। সে চুপ করে ঢোলওয়ালার দিকে তাকিয়ে রইল। বাজারের বড়ো বড়ো ব্যবসা যাদের—যদু পাল, নিত্যহরি সাধুখাঁ এরা খুশি হল। যারা নিচু অবস্থার লোক তারা চুপ মেরে রইল। শহরের মোড়ে মোড়ে পুলিস দাঁড়াল।

সেদিনই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছিল শিউপূজন। দুব্‌লা পায়ে থামতে থামতে জিরোতে জিরোতে মিলে গিয়ে কাটিকেষ্টর সামনে দাঁড়াল। কাটিকেষ্ট বলল—বাহার নিকালো, আভি নিকালো। অ্যাসটন সায়েব বলল—যাও তোমহারা সতুবাবুকো পাস, উ ক্যা করনে শেকতা হাম দেখনে মাংতা, যাও। মিলফটকের বাইরেও জনাকতক পুলিস লাঠি বন্দুক নিয়ে

দাঁড়িয়েছিল। শিউপূজন টলতে টলতে বুধোর কাছে চলে এসেছিল ইস্টিশনের চায়ের দোকানে।

শিউপূজনের হাতখানা ধরে বুধো চুপ করে দাঁড়িয়েছিল সেদিন। ইস্টিশনের লোকজন, চটকল বাজারের হৈ চৈ তখন জমে উঠেছে। শিউপূজন আর বুধো কোনো রা কাড়ছিল না মুখে। আকাশে ছিল ভাদ্দর মাসের মেঘ—মারপিট, একশ চুয়াল্লিশ, পুলিস—সারা নবগঞ্জে হঠাৎ ভয়ের ছায়া পড়েছে মেঘের মতো। সিঁটে একবার সাইকেল নিয়ে বোঁ করে ঘুরে গেল—জোরে শিস্ বাজাতে বাজাতে। যাবার সময় বুধোকে চোখ টিপে গেল।

বুধো বলেছিল—ঠিক আছে, সব দানেই যে জিতবো এমন কথা মনে করে বসে থাকলে খেলায় নামা চলে না। এখনো অনেক দান হাতে আছে।

কত দান এখানে খেলতে হবে। কত দানের হাত ফেরতায় যাবে আসবে কত কী। দিল বিগড়ে মন উদাস করে দেওয়ানা হলে চলবে না। এ চটকল বাজার। ঝুনো বাঁশের যেমন গাঁটে গাঁটে পাক—এরও তেমনি মোড়ে মোড়ে প্যাঁচ। কতদিন ধরে এই প্যাঁচে পড়ে রয়েছে নবগঞ্জ—আরো কতদিন থাকবে কে জানে সেকথা। রামায়ণ গানে শুনেছি মেঘের আড়াল থেকে সাপ ছুঁড়ে মেরেছিল রাবণের ব্যাটা ইন্দ্রজিত। নাগপাশে পড়েছিলেন দু-ভাই রাম লক্ষ্মণ। কতক্ষণ পরে আকাশে শোনা গেল গরুড় পাখির পাখার ঝাপট। সাপ খসে পড়ল তাঁদের অঙ্গ থেকে। জামতলি আর নবগঞ্জের গায়ে—তামাম চটকল বাজারের গায়ে—সেই নাগপাশের পাক জড়ানো—আকাশের দিকে চেয়েছিল সব, বলছিল—হে দেওতা পাঠাও তোমার বাহনকে, ঝড় উঠুক চটকল তল্লাটে—অনেক দিনের জমানো ধুলো, জমানো ঝুল উড়ে যাক, উড়ে যাক এই ফোরটোয়েন্টির ফরক্কা-বাজি—কাটিকেষ্টদের কুটকচালে ক্যারামতির খেলা।

কিন্তু দেরি ছিল, তখনও দেরি ছিল।

সে রাতের কথাও আমার মনের পাতায় লেখা আছে কড়া হাতে, মুছবে না —মতিচাঁদ বলেছিল। মাঝরাত্তির থেকে ঝুপ ঝুপ করে বিষ্টি হচ্ছিল আর ছুটছিল দমকা হাওয়া। কাদায় পেছল ইস্টিশনের রাস্তায় শেষরাতে গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি—ঢাকা মেলের প্যাসেঞ্জার ধরব। ঘোড়া ছুটো

ভিজছে ঠায় দাঁড়িয়ে। আমি গাড়ির মধ্যে পাল্লা বন্ধ করে বসে আছি কে এসে দরজা খুলে ডাক দিল—এই ওঠ্। ভালো করে চেয়ে দেখি জনাচারেক পুলিস, বড়োবাবু, ছোটবাবু, বন্দুক, পিস্তল। গায়ে বিষ্টির জামা, মাথায় পাগড়ি টুপি। আমি গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতেই ওরা ভেতরে উঠে পড়ল। আমায় বলল—চালা গাড়ি। আমি বললাম—কোথায় যাব, বাবু। ওরা বলল—বাজার পাড়া।

গাড়ি গিয়ে দাঁড়াল বাজার পাড়ায়, সতু বোসের কংগ্রেস আপিসের টিনের চালার সামনে। ওরা সব নামল। তারপর আমাকে হুকুম করল—ডাক্ সতুবাবুকে। আমি বললাম—তা আমি কেন? বড়োবাবু বাঘা ধমক ছাড়লেন—যা বলছি তাই কর, হারামজাদা মুখের ওপর কথা বলতে শিখেছে।

অগত্যে ডাকলাম। সতুবাবু ঘুমোচ্ছিলেন। উঠে দরজা খুলে দিলেন। সতুবাবু একবারের জন্যে যেন হকচকিয়ে গেলেন।

খানাতল্লাশ করা হবে। আপনি এইখানে এসে দাঁড়ান।

বৃথাই খানাতল্লাশি—সে ঘরে একটা মাদুর পড়ে আছে শুধু আর সব ফক্কা। বড়োবাবু মুখখানাকে হুমো মতন করে কী একখানা কাগজ দিলেন সতুবাবুকে—বললেন গাড়িতে উঠুন।

সতুবাবু বললেন—গ্রেপ্তার করছেন তাহলে? চলুন। আমার দিকে একবার তাকিয়ে হাসলেন তিনি তারপর গাড়ির মধ্যে উঠে গেলেন। দমকা হাওয়া হায় হায় করছিল, বিষ্টির ছাঁট ছুরির মতন বিঁধছিল চোখে মুখে।

দুলালচাঁদকে বয়েছিল একদিন আমার গাড়ি। সেদিন কেঁদেছিলাম।

নেপালবাবুকে বয়েছিল একদিন আমার গাড়ি, সেদিন হেসেছিলাম।

সতুবাবুকে যেদিন বাদলা রাতে আমার গাড়ি বয়েছিল, সেদিন কিছু বুঝতে পারিনি গুম হয়ে গিয়েছিলাম।

নবগঞ্জের চটকল বাজারে দোলা লাগল একটা অবশ্যই। কিন্তু মতিচাঁদ বলেছিল—সে নাকি অতি সামান্যই। পরের দিন বুধো আর শিউপূজন মিলগেটের সামনে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে কী সব বলতে গিয়েছিল—তা সে কেউ শোনেনি—এক লরি পুলিস দাঁড়িয়েছিল গেটের সামনে—সবাই হুড় হুড় করে ফটক পেরিয়ে ঢুকে পড়ল মিলে। বুধোর মুখের দিকে কেউ তাকাল না। মাথা নিচু করে বুধোকে সবাই পাশ কাটিয়ে গিয়েছিল

সেদিন। এমনি করে কাটিকেষ্ট মিত্তির কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ খুঁড়ে ফেলল। এমনি করে ফুটবলের ফ্যাসাদ থেকে বাঁচতে গিয়ে ধম্মের কল বাতাসে নাড়িয়ে ফেললো কাটিকেষ্ট। অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি বলতে হলে এখনো নবগঞ্জের লোক কাটিকেষ্টর উদাহরণ দেয়। যাই হোক তখনকার মতো তারপর থেকে মিলের মধ্যে কাটিকেষ্টর দাপট আরো বেড়ে গেল। অ্যাসটন সায়েব লাল টাই ঝুলিয়ে ঘাড় দোলাতে দোলাতে ওভারসিয়ার সায়েবদের নিয়ে ডিপার্টে ডিপার্টে ঘুরে বেড়াতে লাগল। পান থেকে চুন খসলেই বাহার যাও। লাইন সায়েব, সর্দারদের সেলামী, হাজরিবাবুর হিস্যা মিটিয়ে দিয়ে হপ্তাবারের সন্ধ্যেয় টলতে টলতে মজুরের দল বেরিয়ে যেত। তারপর বিন্দির গলির তাড়িখানা কিংবা পঞ্চি পানওয়ালীর পাশের দেশী সরাবের দোকানে আকণ্ঠ পানোন্মত্ততা ক্রয় করে ফিরে যেতো নিজের নিজের মহল্লায়। মদের ঝোঁকে টলতে টলতে রাস্তা হাঁটত আর গালাগাল দিতো প্রাণ খুলে হাজরিবাবুকে, সর্দারকে, বড়োসায়েবকে। সেই মাতাল অবস্থাতেই কোনো কাবলিওয়ালা কি মহাজন যদি তাকে সামনে পেতো একচড় মেরে খাড়া করে দাঁড় করিয়ে দিত। কাপড়ের খুঁট ট্যাঁক, পকেট তালাশ করে যা পেতো উসুল করে নিয়ে আর একবার চড় মেরে খাড়া করে দাঁড় করিয়ে দিত। ঘরে যখন ফিরে যেতো বউ ছেলে মেয়েও একবার তালাশ করত—তারপর যখন কিছু পেত না তারা মুখ ছুটুতো। সে এক জঘন্য হুল্লোড়।

কাটিকেষ্ট মিত্তিরের বাড়িতে উৎসব লেগেই থাকত। ছেলের মুখে ভাত হল। ছেলেকে রাজবেশ পরিয়ে ঘোড়ার গাড়ি করে জল সইতে যাওয়া হয়েছিল। সঙ্গে বিলিতি বাজনা। পাড়ার পাঁচজনে বলেছিল—এমন ঘটাপটা আমরা অনেককাল দেখিনি।

ধীরুবাবু মিলের ঠিকার কাজ সমান তালেই চালাচ্ছিলেন। সে বছর শীত থেকে তাঁর গঙ্গার ধারের ধানকলও খুব জমে উঠল। গাড়ি গাড়ি ধান আসত। ধানকলে মেয়ে পুরুষ, কুলি কামিন কাজ করত। বিরাট চিমনি তুলে দি ব্যানার্জি রাইস মিলের মালিক সেজে ধীরুবাবুর মিল-মিল খেলা বেশ আসর জাঁকিয়ে ফেলল। সাধুখাঁ পাল মশাইরা ধীরুবাবুর সঙ্গে যোগসাজসে পাশেই চালের একটা পাকা বাজার খুলে ফেললেন। কতো চালের আড়ত বসল। লোকজন, পাইকার, খদ্দের মিলে আর এক হাটের পত্তন হল সেখানে।

বিকিকিনির হাটে কখনো ঝাঁপ বন্ধ হয় না। শুধু পসারী পালটে যায় মাঝে মাঝে, পসরা পালটে যায় কখনো সখনো।

রাস্তা পাকা হতে লাগল নবগঞ্জে। ইলেকট্রিক লাইট বসাবার জোগাড় হতে লাগল। শ্যামধারী সেই খোয়া ভেঙেই চলেছে তখনো নবগঞ্জের রাস্তায়। শিকের মাথায় ছাতা আটকে রোদ নেই, বৃষ্টি নেই বসে বসে ক্রাচটা মাটিতে ফেলে রেখে, কাটা পা-খানা মেলে রেখে শ্যামধারী তখনও খোয়া ভাঙছে। চটকলিয়ার দল দেখত, যারা চিনতো তারা হয়তো কথা বলত। যারা চিনতো না তারা দেখে চলে যেত। মতিচাঁদ বলত—কাটিকেষ্টবাবুর বাড়ির সামনের রাস্তা যখন বাঁধানো হচ্ছিল তখনও সেখানে শ্যামধারীই খোয়া ভাঙতে যেত। কাটিকেষ্ট ছাতার আড়াল দিয়ে শ্যামধারীকে পাশ কাটিয়ে চলে যেত। কোনোদিন চোখাচোখি হতে দিতো না। শ্যামধারী মুখ তুলে তাকাতো না। শক্তহাতে ঘা মেরে মেরে ইঁটগুলোকে ভাঙতো বসে বসে।

শুধু ক্ষমাহীন প্রতিঘাতের মতো ঘুরে বেড়াতো বুধো, শিউপূজন। সঙ্গে জুটেছিল শুকুর আলি। অন্ধকারে অন্ধকারে মহল্লায় মহল্লায়, বস্তিতে বস্তিতে, ধাওড়ায় ধাওড়ায় বুধো, শিউপূজন, শুকুর আলি ঘুরতে লাগল। সর্দার, বস্তিওয়ালা, বাবু, পুলিস সবাইকে এড়িয়ে লুকিয়ে সবাইকে ডাক দিচ্ছে—সবাইকে। বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়নের নবগঞ্জের ব্রাঞ্চের ভিত খোঁড়া হচ্ছে তখন বড়ো কষ্টে। কতো ভয়, কতো লোভ, কতো বেইমানি।

বুধো বলছে—পেরিয়ে যাব। যেমন করে সেই ছোটবেলায় গঙ্গা পেরিয়ে যেতাম, তেমন করে পেরিয়ে যাব।

আট

ভস্ম অপমান শয্যা ছাড়ো পুষ্পধনু........:
হে অতনু বীরের তনুতে লহ তনু।

সূর্য প্রদক্ষিণের পথে নবগঞ্জ তবু যে এগিয়ে আসছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

বুধো বলত, জমানা পালটে যাচ্ছে। যদু পাল বলত—দিনকাল আর আগের মতো নেই। ভূষণ মুখুজ্যে বলত—কী দিন যে সামনে আসছে তার ঠিক নেই।

মতিচাঁদ বলত—আমরাই সব থেকে বেশি টের পেতাম দিন বদল হচ্ছে। আগে নবগঞ্জের ইস্টিশনে দশখানা ঘোড়ার গাড়িতেই মনে হত হাট বসে গেছে। যে সময়ের কথা বলছি তখন ঘোড়ার গাড়ি বেড়ে বেড়ে হয়েছে বোধহয় খান তিরিশ। কিন্তু মনে সুখ নেই, ট্যাঁকে টান পড়েছে। সে ফুর্তি সে হুল্লোড় তখন আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যাচ্ছে।

সে বছরের গোড়া থেকেই জোর খবর শোনা গেল যে বড়ো রাস্তাটুকু পাকা হওয়ার ওয়াস্তা শুধু। ধীরুবাবুর চারখানা মোটর বাস তৈরি হয়েই আছে। নবগঞ্জে বাস সার্ভিস চালু হবে। তার মানে হল এই যেমন একটুখানি জলে মাছ কিলবিল করে তেমনি স্রেফ নবগঞ্জের মধ্যেই আমাদের ঘোড়া-গাড়ি কখানা ঠেলাঠেলি করবে। নবগঞ্জের উত্তুরে দক্ষিণে যেতে হলে কেউ আর গাড়ি ভাড়া করবে না—ছ-পয়সা দিয়ে বাসে চড়ে বসবে। আমাদের হুড়োহুড়ি কমে যাবে।

তিরিশখানা গাড়ি, কাজেই মাথা পিছু ভাড়া জুটতোও কম। ইস্টিশনের লোহার রেলিঙের ধারে বসে বসে গুলতানি করতো মতিচাঁদেরা। খাবারের দোকানের ফেলে দেওয়া ঠোঙা নিয়ে কাকে কুকুরে কাড়াকাড়ি করত। মিনসিপ্যালটির ষাঁড় ধীর মন্থর পদক্ষেপে দুলতে দুলতে ঘুরে বেড়াত। দিনে চারবার করে ঢল নামত রাস্তায়—মিলমুখো আর মিলফেরতা মানুষের। সঙ সেজে দাঁতের মাজন বেচতো কেউ, কেউ ডুগডুগি বাজিয়ে ভেল্কি দেখিয়ে মাদুলি বেচত। চটকল বাজারে হুজ্জুতের শেষ নেই।

রেলিঙের ধারে বসে, বেঁটে কাঁচের গেলাসে করে চা খেতে খেতে, কিংবা খৈনি টিপতে টিপতে হীরু, মতিচাঁদ, রাখাল, জটাধর, শিবু, গদাই গুলতানি

করত। কত গল্প নবগঞ্জে-জামতলিতে, কত কেচ্ছা।

নবগঞ্জের চটকল বাজারের ধুলোয় তখন দুটো প্রেমের ফুল ফুটেছে। বাতাসে শুধু ধোঁয়াই নয় একটু করে গন্ধও রয়েছে। নবগঞ্জের জামতলির অবসরের সঙ্গী তখন এই দুটো ফুলের বর্ণ গন্ধ রস।

তার মধ্যে একটা ফুলের রঙ ঢঙ চেনা জানা—সে ফুল দেখেছে সবাই—আগে না হোক পরে।

আর বাকি ফুলটা একেবারেই নাম না জানা—নতুন ফুল। সে ফুল আর এ-মাটিতে ফোটেনি কখনো।

দয়ারাম বাঁড়ুজ্যের মেয়ে শোভা আর বিধু ভটচাযের ছেলে বিকাশের গল্প নবগঞ্জের মানুষের চেনা গল্প। বিন্দির গলির লালমোহন আর বিনির গল্প আকাশ থেকে পড়া গল্প। যদিও সেই তনুহীন দেবতার একই কৌতুকে এই দুটি গল্পের সৃজন—তবু কালের দেবতার পক্ষপাত ছিল বোধহয় বিশেষ কোনো একটার দিকে। তাই সমাপ্তিতে ভিন্ন সুর।

শোভা দয়ারাম বাঁড়ুজ্যের মেয়ে। সেই সূত্রে নবগঞ্জের মেয়ে। দয়ারাম বাঁড়ুজ্যে দিল্লীতে বড়ো চাকরি করতেন। প্রায় সায়েব মানুষ ছিলেন। রিটায়ার করে বাড়ি ফিরলেন সে বছর মাঘ মাসে। সঙ্গে মেয়ে শোভা, দুই ছেলে, কুকুর জ্যাক আর গিন্নী। দয়ারাম বাঁড়ুজ্যে নবগঞ্জেরই ছেলে। কিন্তু প্রথম যৌবনেই নবগঞ্জ পরিহারের ফলে এবং অধিক দিন দিল্লীর জীবন-যাপনে নবগঞ্জের স্মৃতি তার মনে আর তেমন জাগ্রত ছিল না। যখন ফিরে এলেন নবগঞ্জে নবগঞ্জের রীত-নীত সব তখন তিনি ভুলে গেছেন। কেন যে ফিরে এলেন নবগঞ্জে সেটা ঠিক করে কেউ বলতে পারে না। কেউ বলে রেসের মাঠে সর্বস্ব হারিয়ে রিটায়ার করার পর নবগঞ্জকেই সস্তা মনে হয়েছে। যাই হোক অবস্থা যে পড়ে গিয়েছিল সে তো বটেই নইলে নবগঞ্জ কেন? মেয়ে শোভা আর জ্যাক কুকুরকে নিয়ে বেড়াতে বেরুতেন সকালে। প্রথমে মনে করেছিল সবাই মেয়ে বিধবা। পরে মনে করেছিল দয়ারাম ব্রাহ্ম। পরে জানা গেল—না তেমন কিছু নয়, তবে অনাচারী বটে। বোতল থেকে কী খায়।

নবগঞ্জের তখনকার মেয়ে হয়ে যদি শোভা দিন কাটিয়ে দিতে পারত, স্বস্তির

নিশ্বাস ফেলে বাঁচতো তার পরিবারের লোকজন। মুশ্‌কিল হল সে কলকাতার স্কুলে পড়েছিল কয় বছর। পড়ে এসেছিল উঁচু ক্লাস অবধি, শিখে এসেছিল গান। পাস দিয়েছে একটা। ডাগর মেয়ে, ডাগর চোখ, ফরসা রঙ।

তার আগে নবগঞ্জের বড়ো মেয়েরা কি গান গাইত না? মতিচাঁদের সাফ জবাব ছিল—না। অন্তত ডাক ফোকর গাইত না। ভদ্দরলোকদের মিটিনে পুরুষমানুষ বোঝাই সামিয়ানার তলার উঁচু মাচায় বসে দয়ারাম বাঁড়ুজ্যের মেয়ে শোভা যেদিন গান গাইলে হারমনি বাজিয়ে—মতিচাঁদের ভাষায় নবগঞ্জের সেদিন কলি উল্টে গেল।

সত্যি কথাই নবগঞ্জ-জামতলির সামাজিক ইতিহাসে শোভার নামটা লিখে রাখার মতো নাম। সে জুতো পায়ে দিয়ে আঁচল ঘুরিয়ে নবগঞ্জে এপাড়া ওপাড়া ঘুরে বেড়াত—মতিচাঁদ বলত—সঙ্গে পুরুষ কাউকে দেখিনি কোনোদিন অথচ রায়বাড়ির সত্তর বছরের বুড়িমা সাড়ে তিনমনি শরীর নিয়ে গঙ্গাচানে যেতেন—সঙ্গে যেতো নাতি—পাঁচ বছরের রোগা পিকলু ছেলেটা। একা মেয়েমানুষ অতদূর যাবেন?

তখনও নবগঞ্জে মেয়ে ইস্কুল জাঁকিয়ে ওঠেনি। সবে শুরু হয়েছে মাত্র। একটা বিরাট ঘোড়ার গাড়ি পর্দা ঢাকা দিয়ে সকাল নটা থেকে মেয়েদের ইস্কুলে নিয়ে আসতো বাড়ি বাড়ি গিয়ে। দু-খেপেই ইস্কুল ভর্তি হয়ে যেত। যারা দেখতে খারাপ কেবল সেইসব মেয়েরাই তখন নবগঞ্জে ইস্কুলে যাওয়ার কথা ভাবত—তাও যেতো না সকলে, কি দরকার বাবা!

এ হেন নবগঞ্জে শোভা কলকাতা থেকে একটা পাস দিয়ে বাবার সঙ্গে ফিরল। ফরসা লাল টুকটুকে মেয়ে ঝকমকে চোখ।

মতিচাঁদের ভাষায় গোখরো সাপের মতো মস্ত বড়ো একটা বিনুনি ছিল মেয়েটার। ঘুরিয়ে কাপড় পরে, পায়ে জুতো দিয়ে টলে না, আবার মিটিনে গান গাইতে বসে ভয়ে কাঁপে না যে মেয়ে, সেই মেয়ে সেই বিনুনি দুলিয়ে সোজাসুজি কারুর দিকে তাকাতো না, যদি কখনও তাকাত তখন—মতিচাঁদের কথায়—নবগঞ্জে এমন কোনো ভদ্দরলোকের ব্যাটা ছিল না যে চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকবে দু-পলক।

যে তা পারল সেই হল বিকাশ ভটচায, বিধু ভটচাযের ছেলে। বিধু ভটচায ছিল না জামতলিতে যখন শোভা ও শোভার বাবা নবগঞ্জে ফেরত আসেন। বছর কাবারী শিষ্য বাড়ি গেছেন, আদায়ে বেরনোও বলতে পারেন। সে প্রায়

মাস তিনেকের ধাক্কা। সে বছর বি, এ, পাস করেছিল নবগঞ্জে দুটো মাত্র ছেলে, বিকাশ ভটচায আর রমেশ চাটুজ্যে। টিকোলো নাক, চওড়া কপাল, কোঁকড়া চুল ছেলের। যে যুগে বি, এ, পাস হলেই বিয়ে হত সে যুগের গল্প নয় এটা। বিকাশ ভটচাযের বাবা ছিলেন পুরুত মশাই। খাকি হাফশার্ট আর লাল পাড় কাপড় পরা চটি পায়ে দেওয়া বিকাশ ভটচাযের—যে চোখের একদিকে ছিল ইংরেজ রোমান্টিকেরা ইংরেজি লেখাপড়ার দৌলতে আর এদিকে ছিল কালিদাস—বাবার দৌলতে—সে চোখ যখন সেই মিটিঙে হারমোনিয়াম বাদিনী শোভার ওপর পড়ল তখন মনে মনে বিকাশ ভটচায কোন্ কবিকে স্মরণ করেছিল বিকাশ ভটচাযই জানে। তবে তখন বোধ হয় তার আর চটা-ওঠা পুরনো কলাইকরা থালার মতো শতছিদ্র বাবার সংসারের কথা মনে ছিল না।

সেই মিটিঙের পর শোভার সঙ্গে বিকাশের কেমন করে আলাপ হল কেমন করে বিকাশ শোভাকে পড়াতে শুরু করল সাহিত্য, ইংরেজি আর বাংলা শোভার বাবার অনুরোধে, কেমন করে ছেলেটি শোভার বাবার নজরে পড়ল, ভাব জমল দুজনে সে কথা বিস্তারিত বলার দরকার নেই। সে যুগের উপন্যাসের প্রেমকাহিনীর কল্যাণে এ অধ্যায়টুকু সকলেরই মুখস্ত এখন। শুধু মনে রাখতে হবে শোভা বাঁড়ুজ্যের ছিল সেই বয়স যে বয়সে বিকাশ ভটচাযের মতন ছেলের কাছে ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত কবিতা শুনলে বুক দুর দুর করে, মনে হয় বুঝি আমাকে বলছে। আর বিকাশ ভটচাযের ছিল সেই বয়স যে বয়সে শোভার মতন মেয়েদের কাছে কবিতা বলতে গেলে বাছা বাছা লাইনগুলোই মনে পড়ে—যেগুলো শুধু চিরকালের শোভা বাঁড়ুজ্যেদেরই বলা যায়।

কাজেই পর্যাপ্ত পুষ্পস্তবকাবনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার মতো শোভা বিকাশ ভটচাযের কাছে হয়তো ফুটি ফুটি করে উঠেছিল এমন সময়—

মতিচাঁদের ভাষায় এমন সময় সব ফেঁসে যাবার জোগাড় হয়েছিল।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম—কী করে জানলে সব ফেঁসে যাবার জোগাড় হয়েছিল।

মেয়েটাকে আর পথ চলতে দেখা গেল না। বুঝলাম মানা হয়ে গেছে বাড়ি থেকে। কেন মানা হয়ে গেছে? নিশ্চয় জানাজানি হয়ে গেছে সব। নয় বাপ নিশ্চয় কিছু গোলমাল বুঝেছে।

ঠিক কথাই। বিকাশ ভটচায যেতো শোভাকে পড়াতে। বিকাশের মতো শুরু

আর শোভার মত শিষ্যা সে কালে বেশিক্ষণ একাবস্থায় থাকার কথা নয়। একজনের হওয়ার কথা পরম গুরু আর একজনের প্রিয় শিষ্যা। এ সত্য কি তাদের নবগঞ্জীয় অভিভাবকেরা জানত না? জানত। বেদবাক্যের মতো মানত এই তত্ত্বকে যে অনলকুণ্ড আর ঘৃতকলস একত্রে কদাচ রাখতে নেই। কিন্তু নবগঞ্জে তখন সেই যুগ যে যুগে মেয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করলেই আধুনিকা হত, তদুপরি বিকাশ ভটচায যদি বিনা পয়সায় মেয়েটাকে আর বাড়ির ছোট ছেলেটাকে পড়ায় তাহলে আর এক কদম এগিয়ে বিনা পণে শোভাকে যে বিয়েও করবে না একথা ঠিক ঠিক বলা যায় না। কেননা এরকম ছুটো-একটা গল্প তখন কলকাতায় শোনা যাচ্ছে। পড়াতে এসে মেয়ে পছন্দ করে গেছে প্রাইভেট টিউটর। তখন প্রাইভেট ছাত্রী পড়ানো ঈর্ষাউদ্দীপক সুপরিচয়ের মধ্যে একটা। তারপর ছেলের বাবা এসে প্রস্তাব করেছেন উপযাচক হয়ে—এমন স্বর্ণযুগও ছু-এক লহমার জন্যে কোথাও কোথাও ঘটেছে। শোভার বাবার ঝানু পাটোয়ারী বুদ্ধিতে হয়তো এই রকম পরিণতির স্বপ্নই ছিল। সুতরাং প্রথম প্রথম কেউ কোনোদিকেই কিছু বলল না। শোভার মা এবং বাবার নিরাপদ আশ্রয়েই সে প্রেম আলগোছে আলগোছে বেড়ে চলল। রাঢ়ী আর বৈদিক তাতে কী? শোভার বাবা মেয়ের বাপ—কাজেই সুযোগ বুঝে তিনি সেকালের লিবারেল হয়ে গেলেন।

সেই নিয়মতান্ত্রিক প্রেমেই কিন্তু নবগঞ্জ মাত হয়ে গেল। রাঢ়ী বৈদিকের অসবর্ণতার আভাসেই বিবর্ণ হয়ে গেল জামতলির প্রাচীন রাঢ়ী বৈদিক রক্ষণময় আত্মা।

যে ছু-চার দিন গঙ্গার ধারে নবগঞ্জের চটকলিয়া সন্ধ্যায় শোভা এবং বিকাশের যুগলমূর্তিকে দেখা গিয়েছিল তারি স্মৃতিস্বপ্নকে নবগঞ্জ ধরে রেখেছিল অনেক দিন ধরে। সঙ্গে অবশ্য 'মাকে তো ভোলাবে বুলাকে এনে'—ছোট ভাইটাও থাকত। তা থাক। কিন্তু আবার যদি মতিচাঁদের ভাষা ব্যবহার করি তা হলে বলতে হয় মিন্সিপ্যালটিতে গান্ধীবাবার নিশেন উড়ছে এও যেমন নবগঞ্জ বাবার জন্মে দেখেনি, বাইরের পুরুষমানুষের সঙ্গে আইবুড়ো মেয়ে পাশাপাশি হাঁটছে এও কখন নবগঞ্জ দেখেনি। জিজ্ঞেস করেছিলাম—কেন, নবগঞ্জে মেয়ে পুরুষ কি রাস্তা হাঁটতো না একসঙ্গে, সবাই তোমার গাড়ি ভাড়া করত, মতিচাঁদ? মতিচাঁদ বলেছিল—তা হলে তো বেঁচে যেতাম। সে কথা নয়, হাঁটবে না কেন একসঙ্গে—কিন্তু পাশাপাশি নয়। ওই

হোথায় যাচ্ছে কত্তাটি আর পেছু পেছু ওই হোথায় যাচ্ছে ঘোমটা দিয়ে মেয়েটি। মাঝে মাঝে কত্তা থমকে দাঁড়াচ্ছেন, একটু টাইম দিচ্ছেন গিন্নীকে। চেয়ে চেয়ে দেখছেন যে পেছু ফিরে তাতেই বোঝা যাচ্ছে ওনারই বউ। তা নইলে একরশি তফাত।

এ রকম অনুগমনের স্থলে শোভা-বিকাশের সহগমন নবগঞ্জে একটা পরিচ্ছেদ সৃষ্টি করে ফেলবে এ তো স্বাভাবিক।

জামতলি আর নবগঞ্জের বাচ্চা বউয়ের দল জানলার পাল্লা ঈষৎ ফাঁক করে বিকাশ আর শোভার চলমান যুগল যাত্রা দেখত—হয়তো ঈর্ষান্বিত হত।

প্রৌঢ়ার দল হত সশঙ্ক এবং সতর্ক—যদি তাদের বাড়ির মেয়েরা এবম্বিধ আচরণ করে। বৃদ্ধারা বলতেন—ঝাঁটা মারি। মন্দিরের রোয়াকে বসে প্রাজ্ঞ সমাজপতিরা কী রায় দিতেন খবর পাইনি—তবে সেই সুমধ্যমা তরুণীর রাজহংসীর মতো চলা দেখে তাঁদের যৌবনকে স্মরণ করে একটা করে দীর্ঘনিশ্বাস কি তাঁরা ফেলতেন না? যদি বলেন না, তবে বলব বুকটাই তাহলে বাজে ছিল তাঁদের। যা শুনেছি—অমন মেয়ে দেখে যদি একটা দেড়গজী দীর্ঘনিশ্বাস না পড়ে থাকে তাহলে নিশ্চয় বুকের দোষ ছিল।

আর নব্য যুবকের দল স্তম্ভিত বিস্ময়ে চেয়ে থাকত। তখন রিজিয়া পালা অভিনয়ের যুগ। মাঝে মাঝে পেছন থেকে তারা চেঁচাত—শাহাজাদি, বক্তিয়ার আর কতকাল আশা বৃক্ষে সিঞ্চিবে সলিল?

হায়! শাহাজাদি নিজেই সে-কথা জানতেন না।

যখন সমগ্র নবগঞ্জের তুলকালাম আকাশকে ধরি ধরি করছে, মেয়ে স্কুলের কর্তাদের টনক টনটন করছে—এরকম করলে সামনের বার আর মেয়ে ভর্তি হবে না, যখন বিকাশ আর শোভার সম্পর্কের জমজমাট অবস্থা ফ্রিজিং পয়েণ্টের অনেক নিচে নেমে গেছে এবং নবগঞ্জের এই একাকিনী স্বয়ংবরার বর বরণ আর হলেই হয় গোছের অবস্থা ঠিক সেই সময়—মতিচাঁদের ভাষায়, ছেলের বাপ ফিরে এল এবং বেঁকে দাঁড়াল। মানে বিধু ভটচায ফিরে এলেন শিষ্যবাড়ি থেকে।

দেখতে দেখতে নবগঞ্জ-জামতলির পুরনো গ্রামীণ আত্মা মাথা চাড়া দিল। ঘোঁট বসল। ঘোঁট বসল স্নানের ঘাটে। বসল মন্দিরে। বসল ক্লাবে, চায়ের দোকানে। বসল অবসরে, অবকাশে, আড্ডায়। সন্ধ্যেয় সকালে। মেয়েছেলে লেখাপড়া শিখলে এরকম হয়; অথবা সময়ে মেয়েদের বিয়ে

দেওয়া উঠে গিয়েই শহর বাজারে এ সব হচ্ছে। বলা হল মেয়ের বাপ হিসেবে শোভার বাবা কাছাখোলা—নইলে শোভাকে অমনধারা বিকাশের সঙ্গে মিশতে দেওয়া ঠিক হয়নি। একথাও হল—ওদের মধ্যে সবই নাকি হয়ে গেছে শুধু বিয়েটাই বাকি। কেউ বলল—জাত ধম্ম রইল না। কেউ বলল—বিকাশের বাপ কোথায় নাকি ভালো পণ পাবে, তা ছাড়া ওরা ভটচায। ভটচাযদের সঙ্গে বাঁড়ুজ্যেদের বিয়ে থাওয়ার চল নেই।

ভটচাযদের সঙ্গে? হ্যাঁ, ফিরে এসেছেন বিধু ভটচায শিষ্য বাড়ি থেকে। বিকাশ ভটচায ভুলে যেতে পারে। ভুলে যেতে পারে দয়ারাম বাঁড়ুজ্যের দিল্লীওয়ালা বিবেক। কিন্তু বিধু ভটচায বড়ো কঠিন মানুষ। শুধু যজমানি করেই পাকাবাড়ি তুলেছেন নবগঞ্জে, নগদ টাকা জমিয়েছেন, ও শুধু চালকলার বুদ্ধি নয়।

ছেলের বাপ তো ছেলের বাপ বিধু ভটচায। মতিচাঁদ বলেছিল—বিধু ভটচাযের তাল ছিল শোভাকে বিনি পয়সায় পড়ানোর ফাঁকতালে শোভার দিল্লীওয়ালা বাবার মারফত বিকাশের একটা হিল্লে করে নেওয়া। কিন্তু তার জন্যে বিকাশের ছাঁদনাতলার ব্যবস্থাও যে ও বাড়িতেই করতে হবে এমন একটা অবস্থার জন্যে তিনি রাজী ছিলেন না। তিনি যখন আস্তে আস্তে বুঝতে পারলেন যে এ আসলে ছেলেধরার ব্যাপার তখন তিনি অগ্নিশর্মা অবস্থায় ছেলেকে তলব করেছিলেন। যজমানি করে ঘটি বাটি বেচে ছেলেকে যে তিনি বি, এ, পাস করিয়েছিলেন কিসের জন্যে? ওই মাগীর ছায়া যেন বিকাশ আর না মাড়ায়, মাড়ালে ভদ্দরলোক বাবার চূড়ান্ত দণ্ডাজ্ঞা তিনি দিয়ে দিলেন—এ বাড়ির মায়া তাকে ছাড়তে হবে। বিকাশের তখন চাকরি নেই। এদিকে দয়ারাম ভাবলেন মাথার ওপর বাবাও থাকবে না এদিকে চাকরিও নেই—

সুতরাং—

দরকার নেই; মরুকগে যাক।

গোলমাল গোলযোগ ঝগড়া তর্ক ওদিকে যতই চলুক না কেন এইবার শোভার মা শোভার বাইরে বেরুনো বন্ধ করে দিল। দয়ারাম বাঁড়ুজ্যে মনে করলেন ছেলের বাপের এত দর্পের ফলেই দেশটা আর জাগল না। অমন শ্বশুরবাড়ি দরকার নেই মেয়ের। বিধু ভটচায ভাবলেন—যাই হোক তিনি ছেলের বাপ কিনা।

দয়ারাম বাঁড়ুজ্যেকে একদিন প্রকাশ্যভাবেই পথের মধ্যে অপমান করলেন বিধু ভটচায, তাঁর ছেলেকে ভাঙিয়ে নিচ্ছেন দয়ারাম। ম্লেচ্ছাচারী পিতা না হলে কন্যাকে এমন সার্বজনীন দৃষ্টিভোজের সামগ্রী করে তুলে পথচারিণী করতে পারতেন না দয়ারাম বাঁড়ুজ্যে। দিল্লীর সায়েবী মেজাজ এবার খাঁটি বাঙালীর পাড়াগেঁয়ে ঘেঁাটের মাতব্বরে রূপান্তরিত হল। পাণ্টা অপমান করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন বিকাশ ভটচাযকে দয়ারাম বাঁড়ুজ্যে। —ক্লিয়ার অফ ফাজিল ছোকরা, ওল্ড ফুল বাপকে সামলাতে পারো না তুমি এসেছ 'লভ' করতে?

শোভাকে বলেছিলেন বিকাশের সঙ্গে আর মিশো না—যেন ঝানু আপিস মাস্টারের অতি সাধারণ একটা হুকুম এটা।

এর পরের রিপোর্ট মতিচাঁদের রিপোর্ট। তার মুখেই শোনা যাক।—

মতিচাঁদ বলেছিল—রোজ দুপুরবেলায় চুটিয়ে মজলিস বসত বিন্দির গলির বিনির ঘরের রোয়াকে। মতিচাঁদ তখন খেতে যেত।— খেয়ে দেয়ে বিড়ির বাণ্ডিল দেশলাই নিয়ে, মাছুর বগলে বিনির রোয়াকে গিয়ে গড়াতাম। বিনি বসতো, বসতো লালমোহন, ক্ষান্ত, সুরো, হীরু এবং আরো অনেকে। দুপুরবেলার গুলতানি ওখানেই হত। ক্ষান্ত আগে বিন্দির গলির মেয়েই ছিল। যখনকার কথা তখন আর সে মেয়েটি নয়—বয়স হয়েছে। কাজ করে বাবুদের বাড়ি। শোভাদের বাড়ি বাসন মাজতো, কাপড় কাচতো, ঘর সাফ করতো। মতিচাঁদ বলেছিল—শোভা-বিকাশের আসনাইয়ের গল্প আমি অর্ধেক যোগাড় করেছিলাম ক্ষান্তর মুখ থেকে।

বেলা দুটো নাগাদ ও বাড়ির কাজ কাম সেরে ক্ষান্ত মুখে গুল্ ঠেসে এসে বসতো বিনির রোয়াকে। বিনি তখন পান চিবোতে চিবোতে রোদে মাথা দিয়ে চুল নেড়ে দিচ্ছে। শোভার গল্প শোনবার জন্যে মন ছটফট তখন নবগঞ্জের সকল মানুষেরই করত। বিন্দির গলির কাজ ফুরোনোর গল্পেও তখন শোভার কথাই আসল কথা।

মতিচাঁদ বলেছিল—শোভার গল্প তারপরে হয়তো অনেকবার ঘটেছে নবগঞ্জে, সে সব সময় এ গল্পের শেষ কি হবে আমাদের জানা হয়ে গিয়েছিল। হয় এই নয় এই। কিন্তু শোভার গল্প যখন প্রথম নবগঞ্জের মানুষের মুখের আহার রাতের নিদ্রা হরে নিল—তখন এ গল্প একেবারে আনকোরা —কেউ জানতো না কী হবে এর শেষে।

সবাই হাঁ করে তিথী কাকের মতন বসে থাকতাম দুপুরটা। আমার বেশিক্ষণ বসার উপায় ছিল না, ওদিকে আবার ট্রেনের সময় পেরিয়ে যাবে, তবু যতটা পারতাম বসতাম। এখান থেকে সব গল্প মাথায় পুরে নিয়ে চলে যেতাম ইস্টিশনে। সেই রেলিঙের পাশে বসে বেরাদারদের কাছে দুপুরের ঝিমধরা মৌতাতে ছাড়তাম শোভার গল্প।

মুখিয়ে থাকত সবাই। দর্জি কল চালাতে চালাতে, চাওয়ালা চা ছাঁকতে ছাঁকতে, বিড়িওয়ালা বিড়ি বাঁধতে বাঁধতে, কান খাড়া করে থাকত শোভার গল্পের জন্যে। হাতের কাজ থামিয়ে ফেলত সবাই শোভাকে যখন দেখা যেত রাস্তার মোড়ে। এ ওকে জিজ্ঞাসা করত—কী হল তারপর? ও তাকে জিজ্ঞেস করত—কী হবে তারপর?

কিন্তু সব থেকে বেশি মুখিয়ে থাকত লালমোহন আর বিনি।

বিনি বলত—ওরা কিচ্ছু মানবে না। এই বলে রাখলাম, বিনির কথা সত্যি হয় কিনা দেখো। অল্প বয়সের পিরিত, এর টান বড়ো সাংঘাতিক টান। ঠিক চলে যাবে।

লালমোহন বলত—আমি হলে এতদিন কবে ভেসে পড়তাম।

বিনি বলত ঠোঁট টিপে—তুমি যা ডুবেছ, ভাসা আর তোমার হবে না এ জন্মে। লালমোহন বোকা হয়ে চুপ করে যেত। বিনির মনের মানুষ ছিল লালমোহন। বিনি আর লালমোহনের গল্পটা বিন্দির গলিতে পুরনো হয়ে গিয়েছিল। অনেক রাতে বিনির ঘর থেকে লোক চলে গেল বিনি বিন্দির পুকুর থেকে চান করে আসত। যারা আসত তার ঘরে তাদের দাগ মুছে ফেলে দিয়ে বিনি এসে বসত কোনো কোনোদিন লালমোহনের পাশে, তার রোয়াকের পইঠার ওপর। বিনি আর লালমোহনের রকম সকম একটু কেমন কেমন ছিল। পইঠার ওপর দুজনে পাশাপাশি বসে গল্প করত। কী হানাই ধানাই বক বক করতো ওরাই জানতো—কিন্তু লালমোহন বলত—আমি বিনির হাতটা ধরেও কোনোদিন দেখিনি। ছড়াদার লালমোহন, ওর ভাবগতিক বোঝাই দায় ছিল। বেশি কথা বললে হয়তো গান ধরে দেবে।

এই বিনি আর বিনির মনের মানুষ হাঁ করে গিলতো শোভা আর তার মনের মানুষের গল্প। সেদিন ক্ষান্ত এসে বলল, ও যেমন করে বলে—কাল কী কাণ্ড মা। মাগো মা যাবো আর কোথায়, আমাতে আমি নেই।

আহা মরে যাই আমি। ভটচাযিদের ছোঁড়া বই বগলে করে বার বাড়ি থেকে 'শোভা' বলে চেঁচিয়ে যেই ডেকেছে, অমনি বাপ আর মা দুজনে বেরিয়ে ছোঁড়াকে মারতে বাকি রাখলো শুধু। সে কী হম্বিতম্বি মা, যাবো কোথা মা, ছেলেটাকে কী অপমান করলে মাগ ভাতারে মিলে—বলল—ফের এসেছ তুমি, তোমায় না মানা করে দিয়েছি। গিন্নী বলল —যাও, চলে যাও। তোমার বাবা ভদ্দরলোক নয়। তুমি খবরদার এ বাড়ির তিরিসীমানায় আসবে না। কত্তা বলল—এলে কুকুর ছেড়ে দোব। ছোঁড়া মুখখানা পাঙাশপানা করে দাঁড়িয়ে রইল।

বিনির মুখ চুন। লালমোহন শুধুলো—ছুঁড়ী তখন কোথায়? কী করছিল? ক্ষান্ত বলল—আমি ঘরে কাপড় কুঁচোচ্ছি। ছুঁড়ী কী বুনছিল—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে গঙ্গা যমুনা বইয়ে দিল খাটের বাজু ধরে। আমি তো হতভম্ব।

বিনি একগাল হেসে ফেলল শোভার কান্নার খবরে, বলল—আমি বললাম দেখো গরিবের কথা—ওরা মানবে না কিছু, ঠিক চলে যাবে।

আমি হয়তো ঠাট্টা করে বললাম—তা যাক না যাক তোর কী? তোর তো যে ঘাসজল সেই ঘাসজলই থাকবে। তুই কি পারবি লালমোহনকে নিয়ে কেটে পড়তে এখান থেকে। সদু ঠোঁট উল্টে বলল—পঞ্চিমাসি শুনলে খেংরিয়ে রসের বিষ ঝেড়ে দেবে একেবারে। বিনির বাড়িউলি মাসি পঞ্চি পানউলি। বিনি থতমত খেয়ে বলত—আহা আমি কি তাই বলছি, তা নয় তবে যদি ওরা চলে যায় তো বেশ হয়। লালমোহন বলতো—তুই চুপ কর। বিনি বলত—পিরিতের টান বড়ো টান, রাধিকে কুলই বড়ো মানল, এ তো বাপের ঘর।

ওদিকে শোভার বাড়ি থেকে বেরুনো বন্ধ হয়ে গেল।

দয়ারাম বাঁড়ুজ্যে প্রথমটা ভেবেছিলেন যে ছেলেটা হা-ঘরের ঘরের। কাজেই সে-ই লোভাত্তি হবে বড়োলোকের ফরসা মেয়ে দেখে, সেই আকুলি-বিকুলি করবে। কিন্তু শোভার ভাবগতিক দেখে তিনি ঘাবড়ে গেছেন। শোভা যেমন নাক বরাবর ডুব মেরেছে বিকাশের ভালবাসায় তাকে এখন কি করে টেনে তুলবেন সে কথাই তিনি ভাবছেন। ভাবছেন, কিন্তু দিল্লীর আধা-সায়েবী বুদ্ধিতে এর কোনো কিনারা হবে না এও বুঝছেন। অগত্যা এখানকার নবগঞ্জী প্যাঁচের দোর ধরেছেন তিনি।

অখানশাম ফুলে। কত্তারা শিখিয়ে দিয়েছে তাকে—বাঁড়ুজ্যে, ও তোমার কেতাবী বুদ্ধির কম্ম নয়। কড়কে দাও মেয়েকে আচ্ছা করে। মুখে যদি না শোনে কান ধরে শোনাও, তাতে না হলে আরো কড়া ওষুধ দাও। ভূত দু-দিনে নেমে যাবে। দয়ারাম বাঁড়ুজ্যে গড়িমসি করতে লাগলেন। এত তাড়াতাড়ি ওসব দরকার হবে না বোধ হয়। তবে এ কথাটা তিনি পাড়ার পাঁচজনের কাছে কবুল খেলেন—নাঃ, মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে নেই।

মতিচাঁদের রিপোর্ট—ক্ষান্ত এসে সেদিন দুপুরে বিনির রোয়াকের মজলিসে বললে—ওমা, কোথা যাব মা, হাত পা কেঁপে মরি আমি আজ। সক্কাল বেলায় বাবুদের বাড়ি কাজে যাচ্ছি, দেখি মোড়ের মাথায় পাঁচিলের কাছে একটা সুন্দরপানা ছোঁড়া। বুড়ো হয়েছি ঠাওর তো হয় না আজকাল তেমন, দু-পা এগিয়ে দেখি, ঠিক তাই যা ভেবেচি—ভটচায্যিদের ছোঁড়াটা। ছোঁড়া বলে কি মাসি তোমার পায়ে পড়ি একটা উবগার করতেই হবে আমার। আমি বললাম—ছি ছি ছি বামুনের ছেলে ওকি কথা। তা কী কাজ? না এই নেকাটুকু তোমার শোভাদিদিমণিকে দিতে হবে। আমি তো ভয়ে কেঁপে মরি। ছোঁড়া নাছোড়। তা না হলে স পায়ে হাত দেবে। মহাপাতকী হব শেষটা। কী করি নিলাম। ছোঁড়া বলে—দেখো মাসি, কারুর চোখে পড়ে না যেন। মুখে কিছু বললাম না, মনে মনেই বললাম—চোখে পড়লে তোমার আর কী করবে বাবুরা, আমার ছেরাদ্দের চাল আগে চড়াবে, তারপর আঁশবটি দিয়ে কাটবে।

বিনি হাঁ করে শুনছিল। ওর ডাগর চোখ, কাঁচপোকার টিপ চক্‌চক্ করছিল শুনতে শুনতে। জিজ্ঞাসা করল—তা হাঁ মাসি চিঠি দিলে শোভার হাতে? ক্ষান্ত বলল—দিলাম বৈকি। ছুঁড়ি তো প্রথমটা ভয়ে ছাই হয়ে গেল, তারপর এদিক ওদিক চেয়ে দেখে নিয়ে টপ করে কলঘরে ঢুকে গেল। সবাই খুব চোখে চোখে রাখে কি না আজ কাল। তাই বলছিনু কোথা যাব মা, কী পাহাড়ে পব্বতে সাহস মা ওইটুকু মেয়ের।

বিনি হেসে ফেলল, বলল—ও ঠিক চলে যাবে, দেখো বলে রাখলাম। এ বয়সের পিরিত ও যত চোট খাবে তত বেড়ে উঠবে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আর তোর লালমোহনের মতো বেশি বয়সের

পিরিতে কী হয়? হাঁরে বিনি? ও হাসতে গিয়ে হঠাৎ চুপ করে গেল। ঠোঁটে একটু ঢেউ খেলে গেল বিনির। লালমোহনের বিনোদিনীর।

সন্তু বলল—ওদিকে যাই হোক তোরা বড়ো বাড়াবাড়ি করছিস কিন্তু।

লালমোহন বললে—কেন, কিসের বাড়াবাড়ি?

সন্তু বলল—কাল নাকি তোরা রাত্তিরে তিনটের সময় কোথায় দুজনে চলে গিয়েছিলি। পক্ষিমাসি বলছিল আর গাল পাড়ছিল—তোকে আর লালমোহনকে।

হঠাৎ ঝেঁজে উঠে বিনি জবাব দিল—গিয়েছিলাম। বেশ করেছিলাম গিয়েছিলাম। মাসির সব তাতেই দাপাদাপি।

মতিচাঁদ জিজ্ঞাসা করেছিল পরে লালমোহনকে—কোথায় গিয়েছিলে ভায়া? লালমোহন বলেছিল—ও বলল শরীলটা কেমন করছে একটু, হাওয়ায় চলো। তাই মুক্তোর ঘাটের নিচেয় গিয়ে দুজনে খানিক বসেছিলাম। মতিচাঁদ লালমোহনকে সাবধান করে দিয়েছিল—পক্ষি বড়ো ঠ্যাঁটা মেয়েমানুষ। হুঁশিয়ার লালমোহন!

একদিন দু-দিন করে হপ্তা দুয়েক কেটে গেল। শোভার গল্পে একটুখানি ভাঁটা পড়ল।

সেদিন দুপুরে ক্ষান্ত বলল—আর কী বলবো মা, আহা, ছুঁড়ীর দুর্দশা দেখে কেঁদে কূল পাই না। আজ সকালে চিঠি লিখছিল দিদিমণি, মা দেখে ফেলেছে। রায় বাঘিনী মা—কী নিকছিলি দেখা, দেখা শিগগির নয়তো খুন করে ফেলব, বলতে বলতে নিজেই হাত মুচড়ে লেকা কাগজটুকু কেড়ে নিলে—পড়েই তো আগুন হয়ে উঠল মা। ঘরের দরজা বন্ধ করে ছুঁড়ির পরনের কাপড়ের অর্ধেক দিয়ে হাতটাকে মোরম্বা করে বাঁধল, বেঁধে মাটিতে ফেলে দিদিমণি আগে বিকেলবেলা দড়ি লাপাতো যে দড়িটা দিয়ে সেই দড়ি দিয়ে কী ঠেঙানিটাই ঠেঙাল মা—আর গর্জাচ্ছে কী, মা যেন খয়ে গোখরা সাপ রে। কিন্তু আশ্চয্যি মেয়ে বলতে হবে, একটি রা কাড়ল না মুখে, এক ফোঁটা চোখের জল ফেললে না। ওদিকে রান্নাঘরে এক কড়া দুধ উথলে পুড়ে গেল যে, কে হুশ রাখে কে দেখে।

সবাই চুপ করে গল্পটা শুনল। কেউ কোনো কথা বলল না।

কেবল বিনি বলল—ওতে কিছু হবে না, ও আটকানো যাবে না আর।

এরি বোধ হয় দিন তিনেক বাদে ক্ষান্তর কাছে মতিচাঁদেরা এমন একটা

রিপোর্ট পেল আপাত দৃষ্টিতে যার সঙ্গে গল্পের কোনো সম্বন্ধ নেই।

ক্ষান্ত বলেছিল—আজ বাড়িতে সেকি হাঙ্গামা মা, বেরুতে পারিনে বাড়ি থেকে বেলা তিন প্রহর পর্যন্ত। খিদেয় ভুঁচকি নেগে মরি আর কি!

কেন, কী বিত্তান্ত? সবাই হাঁ করে উঠল গল্প হবে মনে করে।

ক্ষান্ত ধমক দিয়ে বলেছিল—অত হাঁ করতে হবে না। রসের গল্প কিছু নয় এটা। শোভা দিদিমণির মাথার কাঁটা হারিয়ে গেছে একটা, সকাল থেকে খুঁজে পাচ্ছে না। সে গিন্নীমা বোধহয় সারা বাড়ি খুঁড়ে ফেলে। তোষক বিছানা সব উলটাল। ঝি-চাকরদের কাপড় ঝাড়া, পুঁটলি তল্লাশ, শেষে এই এখন ছাড়া পেলাম, ভদ্দরনোকের বাড়ির চাকরির মুখে তিন ঝাঁটা মারি।

সদু জিজ্ঞাসা করল—তা পাওয়া গেল কাঁটাখান?

কোথায় আর পাওয়া গেল? পাড়ার গিন্নীরা সব নলচালা, চালপোড়ার কথা বলছে।

আমি বনমু যা হয় কোরো এখন মা, এখন আমায় ছেড়ে দাও।

সেদিনের মজলিস তেমন আর ভালো জমল না তখন। কেননা শোভার যে গল্প শোনার জন্যে ক্ষান্তকে সবাই ঘিরে ধরত ক্ষান্ত ও বাড়ি থেকে এলেই, এ সোনার কাঁটা হারানোর গল্প সে গল্প নয়। এক দুই করে যে যার কাজে চলে গেল।

মতিচাঁদ বলেছিল—সবাই চলে গেছে। আমিও উঠি উঠি করছি এমন সময় বিনি বলল—ক্ষান্ত মাসি, একটু দাঁড়াও তো। বলে ঘরের মধ্যে চলে গেল। হাতের মুঠোয় কী একটা এনে ক্ষান্তর সামনে মেলে ধরল হাত—দেখো তো এটা তোমার দিদিমণির মাথার কাঁটা?

ক্ষান্ত তো লাফিয়ে উঠল—ওমা, কোথায় যাব মা। হ্যাঁলা, এ কোথায় পেলি আবাগীর বেটি? হ্যাঁ, এই তো সেই কাঁটা। এর জোড়াটা তো আমি আজই দেখনু। ওমা কী হবে মা।

বিনি বলল, সে আমি পেয়েছি এক জায়গায়। তা এই নাও না। তুমি নিয়ে গিয়ে তোমার দিদিমণিকে দিও। আড়ালে আমার নাম করে বোলো আমি পেয়েছি।

দাঁত খিঁচিয়ে উঠল ক্ষান্ত—আহা হা মরে যাই আর কী! তারপরে সবাই বলুক আর কি যে নলচালার ভয়ে এখন স্বীকার পাচ্ছে, নইলে

এ মাগীরই কাজ। মরগে যা তুই। আমি এখন চনমু খিদেয় মরছি বলে। ক্ষান্ত মাসি চলে গেল।

মতিচাঁদ জিজ্ঞাসা করল—বিনি কোথায় পেলি এটা?

বিনি একটুখানি চুপ করে থেকে জবাব দিল—কাল রাতের বেলা গঙ্গার ঘাটে। শোভাদের বাড়ির নিচেয় যে ঘাট সেই ঘাটের পইঠায় আমি আর ও বসেছিলাম। অনেক রাতে চাঁদ উঠল। দেখি আমি যেখানটায় বসে আছি তার পাশেই কী একটা চক্‌চক্‌ করছে। তুলে দেখি কি এই সোনার কাঁটাখান। কার না কার বলে সঙ্গে করে নিয়ে এলাম। ও বলল—তুই পর। তাই পরতাম হয়তো। কিন্তু না—দিয়ে দোব যার জিনিস তাকে।

মতিচাঁদ জিজ্ঞাসা করল—ও কে?

বিনি বলল—তোমাদের দেখনহাসি। আমার মনে হয় কী জানো দাদা। মনে হয় কাল সন্ধ্যেয় নিশ্চয় শোভা আর বিকাশ গঙ্গার ঘাটে ঐখানটায় বসেছিল। অন্ধকার। সন্ধ্যের পর লোক থাকে না নিশ্চয়, ওরা দেখা করেছিল লুকিয়ে লুকিয়ে। দেখেছ, তোমায় বলেছি ওরা বিয়ে করবেই, আটকানো যাবে না ওদের।

বলতে বলতে বিনির চোখ চক্‌চক্‌ করে উঠল, বলল—বোধহয় বিকাশ ওকে আদর করার সময় ওর মাথার কাঁটাখানা খুলে গেছে। দেখেনি খোঁপা থেকে পড়ে গেছে কখন।

মতিচাঁদ বলেছিল—আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—তুই কেন যাস? যদি পক্ষি টের পায়?

বিনি বলেছিল—কী আর হবে, না নয় দু-ঘা ঝাঁটার বাড়ি মারবে। মারুক কে যাক্‌।

কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর সময় ধীরুবাবুর ধানকলে গণেশ অপেরা পার্টির যাত্রা গান হত। একদিন হত রামলীলা। রামলীলা হত অবাঙালীদের জন্যে। আর একদিন হত যাত্রাগান বাঙালীদের জন্যে। সেবারেও হচ্ছে। লোকে লোকারণ্য। রাত্রি প্রায় নটার মধ্যেই দোকান পাট বন্ধ করে, রান্নাবাটি সেরে মতিচাঁদের ভাষায় মেয়েমদ্দ সবাই ধীরুবাবুর ধানকলে ধান শুকুনোর শান বাঁধানো চত্বরে গিয়ে জড়ো হত। সে রাতের জন্যে মেলা বসে যেত।

পরোটার দোকান বসত, বিড়ি সিগারেটের দোকান বসত। সে এক ইলাহী কাণ্ড।

মতিচাঁদ বলেছিল—কী পালা হচ্ছিল ঠিক মনে নেই আজ, অনেকদিন হয়ে গেল। তবে খুব জমে উঠেছে পালা, সকলের এক্টোতেই হাততালি পড়ছিল রাজপুত্তুর সন্নেসি হয়ে যখন রাজ্য ছেড়ে বনবাসে যাচ্ছে তখন সবাই কোঁচার খুঁটে চোখ মুচছে। খুব জমে উঠেছে পালা। দুটো সিনের মাঝে বিড়ি ফুরিয়ে গেছে, বিড়ি কিনতে বেরিয়েছি। ওখানটায় তত আলো নেই, বড়ো বড়ো চালের আড়তের মধ্যে গলি, গলির মধ্যে আলো আঁধারি জায়গা। বিড়িটা মুখে দিয়ে দড়ির আগুন থেকে বিড়িটা ধরিয়ে নিয়ে ফিরছি এমন সময় পেছন থেকে কে ডাকল—তুমি একটু দাঁড়াবে ভাই? কে ডাকে? পিছু ফিরে তাকিয়ে দেখি সেই ভটচায্যিদের ছেলেটা --বিকাশ ভটচায। প্রথমটা বুঝতে পারিনি, জিগ্যেস করলাম—আমায় ডাকছেন দাহু? বলল—হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে দুটো কথা আছে, একটু তফাতে চলো। পালাটা বেশ জমে উঠেছিল গো—যাই হোক এদিকেও তো আর এক পালা, কাজেই টান কিছু কম ছিল না। পিছু পিছু ছোঁড়ার সঙ্গে গেলাম।

ধীরুবাবুর ধানকল গঙ্গার ধারেই। ঘাট নেই বনবাদাড়। নেমে গেলাম একেবারে জলের কাছটিতে, দেখি হ্যাঁ—মতিচাঁদ কখনো ভুল ভাবে না—মেয়েটাও সেখানে। ভাবুন, সেই রাত দুপুর, জনমানব নেই গঙ্গার ধারে আর সেই মেয়েটা একা দাঁড়িয়ে আছে। ওর বুকে কি ভয় ডর নেই? কী বলব আপনাকে, কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর রাত—নিঝুম শোনশান আসমান জমিন। জ্যোছনায় ফটিক ফুটছে চারিদিকে—গঙ্গার জলে ভরা জোয়ার আর গঙ্গার দিকে পিছু ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে লক্ষ্মী পিতিমের মতো সুন্দরী সেই মেয়ে। একে ঐ রূপ, তায় যাত্তারা শুনতে এসেছে—নিশ্চয় তাই এসেছে বাড়ির কি পাড়ার কারুর সঙ্গে তারপরে দুটিতে কেটে এসেছে—সেজেছে গুজেছে, চাওয়া যায় না, বাবু।

যাকগে রূপ দেখার সময় নেই আমার। কী ব্যাপার এখন তাই শুনি।

আমতা আমতা করে একবার ছেলেটা একবার মেয়েটা যা বলল শুনে ক্ষ্যাস্তর মতন আমারও বলতে ইচ্ছে করল আমাতে আর আমি নেই।

মোদ্দা কথা হানাই ধানাই বাদ দিয়ে হচ্ছে এই যে—আমরা দুটিতে পালাবো

ঠিক করেছি। তুমি মতিচাঁদ, তোমার মতো ভালো লোক আর হয় না, তোমাকে একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

আমি কেন?

আর কাউকে চিনি না আমরা।

কী করতে হবে আমায়?

তোমার গাড়ি করে আমাদের নবগঞ্জের পরের ইস্টিশন দাসপুকুরে পৌঁছে দিতে হবে।

কেন, এখাকার ইস্টিশন দিয়ে যাবেন না কেন?

কড়া চোখ রাখছে সবাই চারদিকে জানাজানি হয়ে যাবে। তক্ষুনি ধরা পড়ে যাবো।

আমার দ্বারা এ কম্ম হবে একথা আপনাদের কে বলেছে?

ক্ষান্তমাসি বলেছে ওকে।

কী করে জানল যে আপনারা এমন ধারা লোক খুঁজছেন?

তা জানি না, হয়তো ভাবগতিকে বুঝেছে। ক-দিন আগে সে উপযাচক হয়ে আমার কাছে গিয়েছিল। আড়ালে ডেকে নিয়ে অনেক কথা বলেছে; আমি প্রথমটা বিশ্বাস করিনি। সে-ই বার বার বলেছে তোমাকে বলতে। আর সবাই ভয় খাবে। ভড়কে গিয়ে পাঁচ কান করে ফেলবে, তুমিই এক পারো সে বলেছে, বলেছে তুমি খুব ভালো লোক।

মেয়েটা বলল—মতিচাঁদ, আমাদের টাকা নেই তাতে কিছু না, আমি আমার সমস্ত গয়না দিয়ে দেব তোমায়। এটা করে দাও তুমি।

আমার হাসি পেল। বললাম—তারপর সেই গয়না বেচতে গিয়ে যখন পুলিসে হাতে দড়ি দেবে তখন দিদিমণি কী বলব আমি সেটাও বলুন। আপনাকে পাবোই বা কোথায় খুঁজে তখন? আমি চুপ করে রইলাম। মেয়েটাও চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। তারপর গঙ্গার জলের দিকে তাকিয়ে মেয়েটা বলল—তা হলে এই গঙ্গার জল ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই। ঠোঁট ফুলতে লাগল মেয়েটার, তার বুকের ঢেউ স্পষ্ট হল।

মতিচাঁদ বলেছিল—বাবু, আমার হঠাৎ বকুলবালার কথা মনে পড়ে গেল। রূপ দেখলেই চিরকাল আমার তার কথাই মনে পড়ে। মনটা কেমন হয়ে গেল যেন। সেই গঙ্গার ধার, ফটিক-ফোটা জ্যোছনায় মনে হচ্ছিল আকাশ থেকে যেন পরী নেমে এসেছে—ডানা হারিয়ে ফেলে কাঁদছে পরীটা, তার

ঠোঁটে ফুলছে, তার বুক ঢুলছে। হ্যাঁ, আমার লজ্জা নেই বলতে এসব জায়গায় মতিচাঁদের মাথা ঘুরে যায়। বললাম—থাক ও গয়নাগাঁটি রেখে দিন। ছোঁড়াটাকে বললাম আপনি কাল বিকেলে আমার সঙ্গে এখেনেই দেখা করবেন। দেখি একটু ভেবে।

মতিচাঁদ বলল—পরের দিন দুপুর বেলা বিনিকে বললাম—হ্যাঁরে বিনি ক্ষান্তর কিত্তি শুনেছিস?

কী কিত্তি?

বললাম এই ব্যাপার।

বিনি হেসে জবাব দিল—জানি, আমিই তো ওকে পাঠিয়েছিলাম বিকাশ ভটচায্যির কাছে।

মতিচাঁদ বলেছিল—শুনে আমি তো হাঁ হয়ে গেলাম। জিগ্যেস করলাম—কেন রে?

কী জানি। ক্ষান্তর কাছে শুনে শুনে আমার কেমন মনে হল ওরা নিশ্চয় সরবার মতলব করছে কিন্তু তেমন যুত করতে পারছে না। মতলব আমার মাথায় আছে। তুমি না হলে দাদা কেউ পাববে না।

মতিচাঁদ বলেছিল—এ যে হাতে দড়ি পরাবার জোগাড় করছিস তোরা হ্যাঁরে?

বিনি আমার হাতখানা ধরে বলল—তুমি কিচ্ছুটি মনে কোরো না দাদা, আমার মনের বড়ো সাধ যে ওরা বেশ চলে গিয়ে বিয়ে-থা করে—বেশ হয় তাহলে?

মতিচাঁদ জিজ্ঞাসা করেছিল—তাতে তোর কিরে পোড়ারমুখী?

মতিচাঁদের হাতখানা ছেড়ে দিয়ে বিনি বলল—তাতে আমার আর কী! আমার কিছু না। মনের মানুষকে নিয়ে ঘর বাঁধার সাধ যাদের তাদের আমার ভালো লাগে। আমার আর কী আছে বলো, জানোয়ারের মতন যার তার কাছে যখন তখন শরীল তুলে দেওয়া আর পক্ষিমাসির ঝাঁটা লাথি। তা আমার এ জীবনের কোনো সাধই মিটবে না, কখনো না। যাদের মিটতে পারে তারা মেটাক। তাদের বাড়বাড়ন্ত হোক। তারা সুখী হোক।

বলতে বলতে বিনি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে থেমে গেল।

গলাটা ঝেড়ে নিয়ে মতিচাঁদ বলল—বুঝতেই পাচ্ছেন এক আচ্ছা ফইজতে পড়লাম।

যাই হোক বিনির মাথা বেশ সাফ। বিনি বুদ্ধি দিল দুজনকে এক জায়গা থেকে গাড়িতে তুলবে না। ছুঁড়ীকে তুমি ইদিকে ধারে-কাছে কোথাও

গাড়িতে ওঠাবে না। ছোঁড়া উঠবে বদ্দিপাড়ার ওই পুকুরপাড় থেকে। দুপুর বেলা বেশ নিঝঝুম থাকবে—ওখানে উঠবে ছোঁড়াটা। ছুঁড়ীকে বলতে বলবে সে যেন কুমোরতলির বটতলায় দাঁড়ায়, ওদিকটায় ইদিশি লোকের বাস নেই, সবই উড়ে মেড়ো তারা তখন মিলে থাকবে, নির্জন জায়গা, ওখান অবদি ও হেঁটে যাবে। ততক্ষণে তোমার গাড়িও ওখানে পৌঁছে যাবে। চোখ বড়ো বড়ো করে আমি শুনছিলাম। বিনির মতলব শেষ হতেই বলে উঠলাম—ক্যা বাত বিনি, বলে বিনির বিনুনিটা টেনে দিলাম।

মতিচাঁদ বলেছিল—ও ছোঁড়াটাকে প্রথমে আমি কিছু বলিনি। ও কী বলে দেখছিলাম। দেখি ওর মাথায় কিছু নেই। লেখাপড়া জানলে কি হবে পিরিতের রসে ভোম মেরে গেছে। এ আমি বরাবর দেখে আসছি যে চালাকগুলো পিরিতে পড়লে বোকা মেরে যায়, আর বোকাগুলো হয়ে ওঠে তুখোড়। ও কি সব হালতু ফালতু বকছিল। আমি বললাম ও সবে ফায়দা নেই কিছু, করতে হবে এই। বলে বিনির মতলবটা বললাম। ছোঁড়া একটা কান-এঁটো-করা হাসি হাসল।

দিন পনেরো শোভা আর বিকাশ চুপ মেরে রইল। কোনো বেচাল দেখাল না। দিন পনেরো ধরে বাড়ির লোক দেখল আর কোনো ছটফটানি নেই মেয়েটার। দয়ারাম বাঁড়ুজ্যে ভাবল যাক রোগ সেরে গেছে তাহলে। সবাই স্থস্থির হল। যাক্ আর তাহলে কোনো ভাবনা নেই।

তারপর একদিন দুপুরবেলায় মতিচাঁদ বদ্দিপাড়ার পুকুরপাড় থেকে গাড়িতে তুলে নিল বিকাশকে। মতিচাঁদ বলেছিল—আগেই বলেছি বাবু কত প্যাসেঞ্জার বইল আমার গাড়ি। কত কিসিমের প্যাসেঞ্জার কত ধরনের। বিকাশ ভটচাযের মতন প্যাসেঞ্জার আমার এই প্রথম।

প্রথম শীতের হাওয়া বইছিল। রোদ মিঠে হয়ে এসেছে। দুপুর গড়িয়ে গেছে। নবগঞ্জের রাস্তাঘাট তখন নিঝুম। দোকান বাজার দুপুরের মতো বন্ধ। লোকজন যে যার কাজে গেছে। গাড়ি ছুটিয়ে চলল মতিচাঁদ কুমোরতলির বটগাছের দিকে।

মতিচাঁদ যাবার সময় বিনিকে একবার খুঁজেছিল, পায়নি।

কুমোরতলির বট গাছতলায় ঠিক দাঁড়িয়েছিল শোভা। ভয় ভয় মুখে। সাদা-মাটা একখানা শাড়ি পরে। গাড়ির রাস্তার দিকে চেয়ে স্থির চোখে

দাঁড়িয়েছিল সে।

গাড়ি থামতেই বিকাশ লাফিয়ে গাড়ি থেকে নামল। শোভা বলে ডাকল একবার। বিকাশের মুখের দিকে উদ্‌ভ্রান্তের মতো কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল শোভা তারপর গাড়িতে উঠতে যাবে এমন সময় বটগাছটার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল দুজন লোক—লালমোহন আর বিনি।

বিনি চেঁচিয়ে শোভাকে বলল—দাঁড়ান একটুখানি।

শোভা চমকে উঠে ঠায় দাঁড়িয়ে গেল। বিকাশও থতমত খেয়ে ঘাবড়ে গেল। দুজনেরই মুখে শীতের হাওয়াতেই জমে উঠল ঘাম। ওরা ভাবছে তাহলে কি ধরা পড়ে গেলাম। বিকাশ শোভার হাতখানা শক্ত করে চেপে ধরল।

লালমোহন তফাতে দাঁড়িয়ে রইল। বিনি এগিয়ে এসে শোভাকে বলল—আপনার মাথার কাঁটাখানা দিদিমণি, গঙ্গার ধারে ফেলে এসেছিলেন যেটা, সেটা আমি পেয়েছিলাম। এই নিন্। শোভা কলের মতো হাত বাড়িয়ে সেটা নিল। তখনো তার ভয় যায়নি, নিশ্চয়ই সব জানাজানি হয়ে গেছে তাহলে?

তারপর ভ্যাবাচাকা ভাবটা একটু কাটিয়ে জিজ্ঞাসা করল বিনিকে—তুমি কে ভাই?

বিনি একটু হেসে বলল—চিনবেন না আমায় আপনি। ঐ দিকে থাকি আমি।

শোভা একটুখানি ঠোঁট টিপে হেসে জিজ্ঞেস করল—সঙ্গে কে তোমার?

বিনি চুপ করে রইল।

শোভা বলল—বুঝেছি, লজ্জা করছে তো, তাহলে আর বলতে হবে না, বর তোমার না?

বিনি মাথা নিচু করে ফেলল। শোভা জিজ্ঞেস করল—তা তুমি আমায় চেন? বিনি বলল—হ্যাঁ চিনি। কোথায় যাচ্ছেন আপনারা তাও জানি। শোভা বলল—কী করে চিনলে? গাড়ির মাথা থেকে মতিচাঁদ বলল—সে অনেক কথা, অত কথা কইতে গেলে দাসপুকুরে ট্রেন ফেল হবে কিন্তু। ও সব জানে আপনাদের।

বিকাশ বলল—সে কী? মতিচাঁদ বলল—হ্যাঁ, তবে কোনো ভয় নেই।

বিকাশ বলে উঠল—থাক থাক, ওসব কথা থাক এখন। চালাও মতিচাঁদ, চলো শোভা।

শোভা আমাকে বলল—একটুখানি দাঁড়াও। তারপর বিনিকে জিজ্ঞাসা করল, কী নাম তোমার?

আমার নাম বিনি।

তোমাকে বড্ড ভালো লাগল আমার। যাবার সময় কারুর সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। মায়ের দিকে তাকাতে গেলে চোখে জল আসে, ভায়ের দিকে তাকাতে গেলে চোখে জল আসে, চোখের জল লুকিয়ে আমাকে চলে যেতে হচ্ছে। তুমি নবগঞ্জের মেয়ে, তোমার সঙ্গে কথা কয়ে বড়ো ভালো লাগল। এই কথা বলে—সেই সোনার কাঁটাখানা বিনির হাতে তুলে দিল শোভা—বলল, তুমি এটা নাও। আমি দিলাম নাও, তোমার কোনো লজ্জা নেই। অনেক চুল তোমার, মস্ত খোঁপা করে বরকে বোলো পরিয়ে দিতে, ভারী সুন্দর মানাবে। যাই ভাই বলে চোখের জল মুছতে মুছতে গাড়িতে উঠে বসল শোভা। ওদিকে বিনিরও চোখের পাতা ভারী। বড়ো বড়ো জলের ফোঁটা তার গালে। সে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে গাড়িখানার দিকে।

মতিচাঁদ বলেছিল—যতক্ষণ তার চোখের দৃষ্টির মধ্যে গাড়িখানা ছিল, ততক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে ঠায় দাঁড়িয়েছিল বিনি—সঙ্গে লালমোহন।

তারপরের সকাল থেকে নবগঞ্জের কেচ্ছালোভী মন গুন গুন করে উঠল। ফুসফুস-ভরা রটনার বাতাস ভারী করে তুলল আকাশ। প্রথমটা শোভার বাবা লুকোতে চেয়েছিলেন। পাড়ার শুভাকাঙ্ক্ষীরা যখন শোভার খোঁজ করলেন, দয়ারাম বাঁড়ুজ্যে বলেছিলেন—শোভা মামার বাড়ি গেছে।

শুভাকাঙ্ক্ষীর দল শুনে বললেন—বিকাশ বুঝি, ওর বাবা বলছিল, খুড়োর বাড়ি গেছে। খুড়োর বাড়ি আর মামার বাড়ি কাটাকুটি হয়ে যে বাড়ি বেরুলো তাতে নবগঞ্জের, জামতলির চৌমাথা চনমন করে উঠল।

পুলিসে গেলে কেলেংকারী বাড়বে। মেয়ে যায় যাক, কেলেংকারীটা না ফেরত আসে আবার। সবচেয়ে ভয় খেয়েছিল নবগঞ্জের নতুন মেয়ে স্কুলের হেড মিস্‌ট্রেস। সামনের বার আর মেয়ে ভর্তি হবে না—চাকরি খতম। বিধু ভটচায দয়ারাম বাঁড়ুজ্যের মধ্যে আবার এক পশলা হয়ে গেল। তারপর নবগঞ্জের সব কিছুর মতন আবার নতুন হুজুগে মেতে উঠল লোকে।

ছড়াদার লালমোহনকে নিয়ে কে এবার ছড়া বাঁধবে নবগঞ্জে ?

চড়কের সঙের যাত্রার নায়ক সবচিন্ লালমোহনের চটুল ছড়ার সকল উৎস এবার বুঝি বন্ধ হয়ে যাবে।

নাকি নতুন করে বাঁধবে ছড়া, নতুন নেশার ছড়া, ছড়াদার লালমোহন।

লালমোহনকে শুধিয়েছিল মতিচাঁদ, শোভা আর বিকাশ চলে যাওয়ার দিন চারেক বাদে—শোভা আর বিকাশকে নিয়ে নয়া পিরিতের ছড়া বাঁধবি না লালমোহন ?

লালমোহন জবাব দিয়েছিল—আমাকে নিয়েই কে ছড়া বাঁধে এবার তার ঠিক নেই আবার নয়া ছড়া ?

মতিচাঁদ জিজ্ঞাসা করেছিল—কেন ?

লালমোহন বলেছিল—কাল ঘরে লোক বসাতে চায়নি বিনি, চেঁচামেচি করে একসা, তারপর হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। পঞ্চি এসে এই আমার ওপর চড়াও। বলে আমি পঞ্চি পানউলি, অনেক ব্যাটাছেলের নাক কেটেছি, তুই লালমোহন আমার বাঁ-পায়ের ধুলোর যুগ্যি নোস্, তোকে এই আমি সাবধান করে দিলাম ফের যদি বিনির সঙ্গে গা শোঁকাশুঁকির চেষ্টা দেখি, তোর একদিন কি আমারই একদিন।

বিনি। যে বিনির মুখখানার মায়া-মায়া ভাবের জন্যে সবাই বলত বিন্দির গলির সেরা মেয়ে সে-ই বিনি। বিন্দির গলির মেয়ে হয়েও বিন্দির গলির হুল্লোড়ে আর মদে ডুবতে ডুবতেও ডাঙার দিকে যদি কেউ কখনো চেয়ে থাকে তবে সে হল বিনি। কবে সতের বছর বয়সে বিকিকিনির হাটে শরীর বেচতে এসেছিল বিনি এখন তার এই চব্বিশ বছরে সেকথা কেউ মনে করে না আর। বিনির কদর ছিল এই শরীরের হাটে। বাবুদের জন্যে তুলে রাখা জিনিস ছিল সে—তার বাড়িউলি পঞ্চি পানউলির আয়ের জিনিস ছিল বিনি। পঞ্চি বলত—বিনির সব ভালো কেবল ভালো না ঐ মাঝরাতে কি শেষ-রাতে উঠে লালমোহনের সঙ্গে গুজগুজ ফুসফুস। পঞ্চি বলত—রসের গা শোঁকাশুঁকি আমি দেখতে পারি না। সেই বিনি কাল ঘরে লোক বসাতে চায়নি।

কে বিনি, কে লালমোহন ? কে তাদের মা, কে বাবা, কোথা থেকে ওরা এল নবগঞ্জের বিন্দির গলির হাটে—বিকিকিনির হাটে মেলা লোক, কে তার খবর রাখে।

শুধু এইটুকু মতিচাঁদ বলতে পারে যে অনেক দিন ধরেই বিনিকে বিন্দির গলির মেয়েরা ঠাট্টা করত লালমোহনকে নিয়ে। বিন্দির গলির ছেলেরা ঠাট্টা করত লালমোহনকে বিনিকে নিয়ে। শোভা আর বিকাশের ভালবাসার নেশা আজ তাদের পুরনো নেশাকে আবার নতুন করে দিয়েছে।

মতিচাঁদ জিজ্ঞাসা করেছিল—বিনি কী বলছে?

লালমোহন বলেছিল—বিনি কী বলবে আবার, আচ্ছা করে ঝাঁটার বাড়ি গরম গরম সকালবেলা হয়েছে ক-ঘা, কী যেন আবার বলতে গিয়েছিল। খায়নি দায়নি। চুপ মেরে বসে আছে রোদের মধ্যে।

মতিচাঁদ জিজ্ঞাসা করেছিল—তুই গিয়েছিলি বিনির কাছে—কী বলে যে শুধিয়েছিলি না এখান থেকেই ফপরদালালি করছিস্।

কী যে বলো দাদা। গিয়েছিলাম বইকি। বলবে কী। আর যা বলে তা কি বলার কথা, না শোনার কথা?

কী কথা?

কী কথা মতিচাঁদ?

মতিচাঁদ গম্ভীর হয়ে আমায় বলেছিল—সে যা কথা সে কথা নবগঞ্জের বিন্দির গলিতে কেউ কখনো শোনেনি।

দুলালচাঁদ যে কথা বলতে গিয়েছিল বিকিকিনির হাটে এ কথা তারও বাড়া।

শিউপূজন যে কথা বলতে চাইছে এ কথার কাছে তা কিছু না।

বিনি বলেছে লালমোহনকে ধারালো চোখে শুকনো মুখে—দেখনহাসি, চল, আমরাও এখান থেকে চলে যাই। নিদেনের বিদেন তুই আমাকে বিন্দির গলির ভেতর থেকে নিয়ে চল। তুই কিছু একটা উপায় দেখ, আমিও দেখি। চল বেরিয়ে যাই, লালমোহন।

বলে কী?

তাজ্জব হয়ে গেছে বিন্দির গলি। একগাল মাছি হয়ে গেছে গাড়োয়ান পটিতে সকলের।

বলে কী? চায়ের দোকান বলছে—বাঃ, মদের দোকান বলছে—বেড়ে, বাড়িউলিরা বলছে—ইল্লি?

ভদ্দরলোকের পাড়ায় যখন ডালপালা সমেত কথাটা পৌছল তখন গল্পটা দাঁড়াল এই—বিনি বলে একটা নষ্ট মেয়েমানুষ বায়না ধরেছে তার মনের মানুষকে বিয়ে করবে। জামতলির পুরুত মশাইদের বিয়ের মন্তর পড়তে হবে। আর একচোট চোকো হাসির হরির লুট হয়ে গেল নবগঞ্জে।

ক্ষান্ত চুপিচুপি বলল—ঐ বাবুদের বাড়ির ব্যাপার দেখেই বিনির মাথায় ঘুণ লেগেছে গো।

লালমোহন বলল—কিন্তু এ যে চাঁদে হাত দিতে যাওয়া।

ক্ষান্ত বলেছিল—তা রোজ চাঁদ দেখাবে গঙ্গার ধারে নে গিয়ে দেখনহাসি, এখন চাঁদ চাইলে ব্যাজার হলে হয়?

অনেক ভেবে চিন্তে রায় দিল বিন্দির গলি—বিনির মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

কিন্তু মাথা খারাপ নয়। কেননা একটু মাথা খারাপ অমন অনেকরই হয় বিন্দির গলিতে। সেবার পাখি সন্ধ্যেবেলায় সেজে গুজে দাঁড়িয়েছিল দরজায় হঠাৎ ওর বাপের বাড়ির দেশের লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল। সে খানিক কথা কয়েছিল ওর বাপের বাড়ির কথা। ক-দিন মাথা খারাপ ছিল পাখির। তারপর বাড়িউলির ঝাঁটায় পাগলামি সেরে গেল আবার।

কিন্তু ঝাঁটাতেও সারে না এ কেমন মাথা-খারাপ?

মতিচাঁদ বলেছিল—আমি জানতাম এমনটা হবে। ঐ যখনি শুনেছি লাল-মোহনের কাছে যে ওরা পাশাপাশি বসে থাকে গায়ে হাত দেয় না তখনি বুঝেছিলাম গোলমাল করে ফেলবে। লালমোহন বলেছিল যে সে যদি বিনির বুকের দিকে তাকাত বিনি বুকে আঁচল টেনে দিত। বিনি বলেছিল লালমোহনকে—তুমি তাকালে আমার লজ্জা করে। এসব কথাই তো গোলমেলে কথা, বাবু। এসব কথা বিন্দির গলিতে কেউ কখনো শোনেনি।

দুপুরবেলায় আর নিঝুম রাতে লালমোহনকে পাওয়া যেত না। বাকি সময়টা সে তখন আর বিন্দির গলিতে থাকত না। ইস্টিশনের রেলিঙের ধারে ঘোড়ার গাড়িগুলোর পাশে এসে জমত। সারাদিন এর গাড়িতে ওর গাড়িতে কোচবাক্সে উঠে কাটিয়ে দিত। কখনো কখনো দেখা যেত লাগাম চাবুক নিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে। নকুলে ছিল তো খুব, আমরা ভাবতাম রগড় করার জন্যে করছে।

তবে লালমোহন যে তখন আস্তে আস্তে গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে এটাও সবার

নজরে পড়েছে। লালমোহন ছিল দেখনহাসি। যে দেখনহাসি লালমোহন মুড়ি-মুড়কির মতন হাসি বিলিয়ে যেত কোনো বাছবিচার করত না, ক-দিন ধরে সবাই লক্ষ্য করেছিল সে দেখনহাসি আর দেখলেই হাসে না।

দেখনহাসি লালমোহনকে বিন্দির গলির ছেলেরা শুধু ছড়াদার বলেই জানত না। বিনির মনের মানুষ বলেও তার পরিচয় ছিল। লালমোহনের ছড়ার জন্যে লালমোহনকে ভালবাসত বিন্দির গলি। কিন্তু বিন্দির গলির ভালবাসা কোনোদিন এ কথা জিজ্ঞাসা করেনি লালমোহনকে—লালমোহন তোর চলে কী করে? কখনো এ দোকানে, কখনো ও দোকানে বিড়ি বেঁধে, কোনো গাড়োয়ানের অসুখ করল তো তার গাড়িখানা দু-দিন চালু রেখে অথবা ঐ জাতীয় কিছু করে তার চলত। কোনোদিন বিনির ওখানে খেত, কখনো পাখির ওখানে। রইস আদমি যখন পাখি, বিনি কি কাউকে নিয়ে নৈশ লীলায় মত্ত থাকতেন তখন দেহের মত্ততাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে কিছু বাইরের মত্ততার জোগাড় করতে হত। কে দেবে জোগাড় করে—লালমোহন। এটাই ছিল লালমোহনের প্রধান উপায়। পুলিসের চোখ ঢাকা দেওয়ার জন্যে দিনের বেলায় এটা ওটা সেটা করত। অবশ্য লালমোহন বলত পুলিসের চোখ ওতে ঢাকা পড়ত না, ঢাকা পড়ত সিপাইজীর হাতে দুটো আধুলি দিলে। সেই লালমোহন তখন ভাবছে অন্য কথা। এখন উড়নচণ্ডে হয়ে থাকলে চলবে না। লালমোহনের বাঁকা ছড়া আর নেই তখন, তখন সে ভাবছে অন্য কথা, বলছে অন্য কথা, শুনছে অন্য কথা।

বিকাশ আর শোভার কথা বলে বিনি বলেছে লালমোহনকে—দেখনহাসি, ওরা ভদ্দরলোক, ওদের প্রাণের চেয়ে মান বড়ো। কিন্তু দেখো প্রাণ আর মান দুয়ের চেয়েই বড়ো করেছে ওরা মনকে। মনকে চোখ ঠেরে কিছু হয় না রে!

বিনি তারপর বলেছে এক মোক্ষম কথা—ওরা যদি কূল ভাসিয়ে দিয়ে ভেসে পড়তে পারে অকূলে, দেখনহাসি তুই আমায় অকূল থেকে কূলে টেনে তুলতে পারবিনে?

মতিচাঁদ বলেছিল—সেদিন দুপুরবেলায় লালমোহন আড়ালে ডেকে নে যেয়ে আমায় বলল—দাদা, আমি সব ঠিক করে ফেলেছি এখন তুমি একটু মদত্ দাও।

কী ব্যাপার? না, আমি গাড়ি কিনবো ঠিক করেছি আর এক জোড়া

ঘোড়া। কোথা থেকে? না রামদেও বুড়ো মুলুক চলে যাচ্ছে সব বেচে-বুচে, ওর কাছ থেকে কম দামে পুরনো গাড়িখানা আর ঘোড়া দুটো কিনে নিচ্ছি—একটা ঘোড়া বেশ মজবুত আছে।

মতিচাঁদ জিজ্ঞাসা করেছিল—টাকা পেলি কোথা?

বিনির কাছে জমানো কিছু ছিল। আর মাধো সাহুর কাছে হাওলাত করলাম কিছু টাকা। তাতেই হয়ে গেল।

মতিচাঁদ বলেছিল তা আমাকে কি মদত দিতে হবে?

যাতে একটু দূরের ভাড়া-টাড়া পাই বেবস্তা করে দিতে হবে। তোমার কথা তো শোনে সবাই, দাদা।

সেদিন বিকেলবেলা বিন্দির গলিতে রাও হয়ে গেল একটা।

না, লালমোহন ঘোড়ার গাড়িওয়ালা হল বলে রাও হল না। লালমোহন যা খুশি হোক তাতে কিছু যাচ্ছে আসছে না কারুর। রাও পড়ে গেল পঞ্চির গলাবাজিতে। রাও পড়ে গেল লালমোহনের যারা সাঙ্গপাঙ্গ তাদের হল্লায়, রাও পড়ে গেল বিন্দির গলির মেয়েদের মধ্যে।

মতিচাঁদ বলেছিল, বাবু, সেদিন ভয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল বিন্দির গলির মাসির দল, আমোদে চেঁচিয়ে উঠেছিল বিন্দির গলির মেয়েরা, নতুন মজার নিশানা পেয়ে হুল্লোড় করে উঠেছিল বিন্দির গলির ছোঁড়ারা। দুলালচাঁদ একদিন বেরিয়ে যেতে চেয়েছিল এই বিন্দির গলির আঁধার পাঁচিল ডিঙিয়ে, পারেনি। কত মেয়ের মনে যে সাধ জাগে চলে যাই—কিন্তু পারে না কেউ।

যেদিন বিকেল বেলায় দেখা গেল বিনির ঘরে বিনি নেই, বিন্দির গলিতে সে একটা দিন। বিনি কি আর চুল বাঁধবে না? বাঁধবে বৈকি, তবে সে এখানে নয়, বিনি কি ভাবন করে কাপড়ে পরবে না আর? পরবে বৈকি তবে সে এখানে নয়। বিনি কি সাধু হয়ে গেল, সে কি আর কারুর সামনে বেরুবে না? বেরুবে বৈ কি তবে সে এখানে নয়—সবার সামনে নয়।

লালমোহনের গাড়িতে করে বিনি চলে গেছে। এক কাপড়ে চলে গেছে। নিধুরামের মোড়ের কাছে যে নতুন খোলার বস্তি হয়েছে সেখানে গেরস্থালি পেতেছে বিনি আর লালমোহন।

নবগঞ্জের চটকল বাজার আর এক কেচ্ছায় মসগুল হয়ে রইল দিনকতক।

বিনির গেরস্থালি ভালো করে পাতা হলে পর একদিন রাত্রে গাড়োয়ান পটির সবাইকে রেঁধে খাইয়েছিল ওরা ওদের বাড়িতে। ভাত, ডাল, মোচার ঘণ্ট, ডুমুরের ডালনা, খয়রা মাছ ভাজা আর আমড়ার টক। পরিতৃপ্ত হয়ে সবাই খেয়েছিল। খাওয়ার পরে ঠাট্টা করেছিল কেউ কেউ—বিনি আমরা আজ তোর বৌভাত খেলাম, খুব ভালো খেয়েছি। বিনির লজ্জা করে সে শুধু লালমোহন জানত—মতিচাঁদেরাও সেদিন প্রথম দেখল যে বিনির লজ্জা করে। বিনিকে খুব চমৎকার দেখাচ্ছিল।

লালমোহনের কাছে শুনেছিল মতিচাঁদ—সেদিন অনেক রাত্রে ঘরের কাজকর্ম সব সেরে ধোয়া মোছা নিকোনো শেষ করে মস্ত এক খোঁপা বেঁধেছিল বিনি। তারপরে লালমোহনকে বলেছিল সেই সোনার কাঁটাখানা বার করে দাও, এটা তুমি আমায় পরিয়ে দাও। ব্রাহ্মণের মেয়ে বলে গেছে—ও আমার আশীর্ব্বাদ। লালমোহন পরিয়ে দিয়েছিল।

রাত্রির আকাশে নক্ষত্রের মতো বিনির বিরাট কালো খোঁপায় সেই সোনার কাঁটা নিশ্চয় খুব সুন্দর মানিয়েছিল—এই কথা ভাবতে ভাবতে আমি মতিচাঁদকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—তাহলে মতিচাঁদ, অন্তত দুটো গল্প নবগঞ্জের থলিতে রয়েছে যেখানে গল্পের শেষে আমাদের মন খুশিই হয়ে যায়। বিকি-কিনির হাটে অন্তত দুটো পসারী রয়েছে যেখানে লোকসান হয়নি লাভই হল বরং।

মতিচাঁদ তার বাতগ্রস্ত পাটায় হাত বুলাতে বুলাতে বলেছিল—আগে শুনুন সবটা বাবু। নবগঞ্জের বাজার বড়ো আজব জায়গা।

একদিন দু-দিন করে মাস দুয়েক কেটে গেল।

লালমোহন আর বিনির ঘর বাঁধা অভ্যেস হয়ে এল নবগঞ্জের মানুষের। লালমোহনের গাড়ি চালানোও সয়ে গেল লোকের চোখে।

লালমোহন আর বিনির বোধ হয় তখনও সয়ে যায়নি। ভোর চারটের ঢাকা মেলের প্যাসেঞ্জার ধরতে যায় যখন, তখনো বিনি খুঁত খুঁত করে। এত সকালে! অনেক রাত্রে যখন লালমোহন ফিরত—অভ্যেস ছিল না হাঁপিয়ে পড়ত—বিনি বলত, এত দেরিতে! লালমোহনের হাসি আবার ফিরে এসেছিল। দেখনহাসি আবার দেখলেই হাসত।

শুধু ছড়া বাঁধল না আর সেবার চড়কের সময় লালমোহন। বলল, না, গাড়ি চালাই আর ছড়ায় দরকার নেই।

ওদিকে নবগঞ্জের পুরনো কাল শেষ হয়ে আসছিল।

বড়ো লোহার লাইটপোস্ট বসানো শেষ হল। তার টাঙানো হল। লাইট-পোস্টে আলো লাগানো হল। অনেকগুলো রাস্তা পাকা হয়ে গেল।

মতিচাঁদ বলেছিল—আমরা বলাবলি করতাম নবগঞ্জকে আর চেনা যাবে না। বাস চালু হবে তারি কালো মেঘখানা তখন উঠছে আকাশে। থেকে থেকে তারি ছায়া পড়ছিল মতিচাঁদের মনে।

শোভা বিকাশ আর বিনি-লালমোহনের এই কাব্যসুলভ প্রেমকাহিনীর স্থান কোথায় নবগঞ্জের চটকল বাজারের ইতিহাসে—এমন ধরনের একটা প্রশ্নের অবকাশ হয়তো আছে। সে প্রশ্নের জবাব এইখানে যে, আমি নবগঞ্জের ধারানিবদ্ধ ইতিবৃত্তের সংগ্রাহক নই। আমি ইতিকথার সেই সমস্ত ঘটনার এবং চরিত্রের স্মৃতিলিপিগুলোকেই ব্যবহার করছি যাতে নবগঞ্জের কাল এবং কালান্তরকে আভাসিত করতে পারি।

শোভা-বিকাশ আর বিনি-লালমোহনের গল্প সেই কাল প্রতিবিম্বনের বহু মুকুরের দুটি বিভিন্ন মুকুর মাত্র।

নয়

সহসা এ জগৎ ছায়াবত হয়ে যায়
তাহারি চরণের শরণের লালসে।

গৌরবাবুর সঙ্গে বাস চালানো নিয়ে তুলকালাম হাঙ্গামা-ফইজৎ হয়েছিল নবগঞ্জে। সে মারামারির কাছে গণেশ পুজোর মারামারি ছেলেখেলা। কিন্তু সে মারামারি দাঙ্গা ফ্যাসাদে আর সিঁটে গুণ্ডাকে পাওয়া গেল না। চটকলের হাঙ্গামা তো পরের কথা।

সে বছর ফাল্গুন মাস নাগাদ সিঁটে গুণ্ডা আর কার্টিকেষ্টর জোড় ভেঙে গেল।

কত গল্প বিকিকিনির হাটে। কতরকমের মানুষের মেলা এই চটকল বাজারে। অহরহ গড়ে উঠছে কত গল্প। প্রতিদিন কত নতুন গল্পের ভূমিকা গড়া হচ্ছে—উপসংহার টানা হচ্ছে কত পুরনো গল্পের। বুড়ো নবগঞ্জের ঝুলি ঝাড়লে যে ধূলিকণার রাশ উড়বে—তার প্রতি রেণুকণায় গল্প। তা নইলে আর সিঁটে গুণ্ডাও একটা গল্প হয়ে ওঠে নবগঞ্জের বাজারে! যে সিঁটে গুণ্ডাকে গুণ্ডা ছাড়া আর কিছু কেউ মনে করত না --থুথু ফেলত যার নাম করলে, সেই সিঁটে গুণ্ডা।

মতিচাঁদ বলেছিল—গল্প মানুষ গড়ে না বাবু, গল্প গড়ে মানুষের অদেষ্ট, মানুষের আহিস্কে। তাই সিঁটে গুণ্ডার অদৃষ্ট সিঁটে গুণ্ডার আকাঙ্ক্ষা তার জীবনে যে গল্প রচনা করল তার কথাও নবগঞ্জের ইতিহাসে স্মরণীয়।

মানুষের জীবনে গল্প যখন গড়ে ওঠে—মতিচাঁদ বলেছিল যে, তখন তাকে গল্প বলে চেনা যায় না। অনেক সময় গল্পের মাঝপথে গিয়ে—কখনো কখনো গল্পের শেষ অধ্যায়ে গিয়ে বোঝা যায় যে জীবন দেবতা অমুক দিন অমুক সময় আমার জীবনের এই গল্পটার মুখপাত করেছিলেন। মানুষ যদি আগে থেকে জানতে পারত তাহলে কত গল্প মানুষ আগে থেকে এড়িয়ে যেত, কত গল্পের অর্ধপথেই ঘটিয়ে দিত সমাপ্তি। সিঁটে গুণ্ডার গল্প শুনতে শুনতে এই কথাটাই মতিচাঁদকে বুঝিয়ে বলেছিলাম।

মতিচাঁদ বলেছিল—ঠিকই বলছেন আপনি, কিন্তু তাই যদি পারবে মানুষ

তবে অদেষ্টটা কপালের মধ্যিখানে আঁকা রয়েছে কেন? গল্প যখন শুরু হয় তখন সবাই ভাবে এ গল্পের নিশ্চয় হাসিখুশি শেষ হবে। কিন্তু যখন খানিকটা এগোয় তখন দেখে পেছুবার উপায় আর নেই।

মতিচাঁদ বলেছিল—হুঁ:, সামলাতে যদি পারতো তবে সিঁটে গুণ্ডা যেদিন কাটিকেষ্টর বোনের হাত থেকে এক গেলাস জল খেতে গিয়ে বিষম খেয়ে জল উল্টে ফেলেছিল সেদিনই সে সামলে যেত। কিন্তু পারল কি?

সিঁটে গুণ্ডা ছিল জামতলির ভটচায্যি বাড়ির ছেলে।

বাপ-মরা ছেলে সিঁটের ভালো করে ছোট বেলা কাটতে না কাটতেই মাও মরে গিয়েছিল—তারপর আর বাপু বাছা করার কেউ ছিল না তার। বিরাট একান্নবর্তী পরিবারের সকলেই যে যার নিজের ছেলের কোলে ঝোল টানত। টানাটানি আঁচড়া-আঁচড়ি করে বাড়ির আর সব ভাই বোনের মায়েরা ভালো আমটা, জামটা, মেঠাইটা, সন্দেশটা নিজের নিজের ছেলের জন্যে টেনে রাখত, সবাই সম্মিলিতভাবে শুধু ভুলে যেত সিঁটের কথা। সিঁটে গুণ্ডা বলত—আমি উজবুকের মতো তাকিয়ে থাকতাম। যখন দেখতাম অন্য সব ভাইগুলোর বাবারা তাদের ছেলেদের পড়া বলে দিচ্ছে, গল্প বলছে আর আমাকে গাই দোয়া হবে বলে বাছুর ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। সন্ধ্যে হলে বিষ্টি পড়লে যে যার ছেলের খোঁজ করে নিজের নিজের ঘরে টেনে নিত—শুধু তাকে কেউ ডাকত না।

সিঁটে গুণ্ডা নিজেই বলত সব কথা চায়ের দোকানে বসে বসে—বাড়িতে একবার জামাই এল। অনেক বিদ্বান আর বড়োলোক জামাই। বাড়ির ছেলেমেয়েরা ক-দিন ধরে ভালো ভালো জামাকাপড় পরে জামাইকে ঘিরে বসে থাকল। জামাই বাজার থেকে মিষ্টি আনিয়ে আনিয়ে বিলি করল। সিঁটের জামাকাপড়ে আর উজবুকের মতো চাউনিতে জামাইবাবু বুঝতেই পারেননি যে ও এ বাড়িরই একজন। তাকে দিয়ে শুধু সিগারেট কিনিয়ে আনাতেন। সেবারে বাড়ি থেকে যাবার সময় চাকরবাকরকে বখশিশ দিতে গিয়ে টের পেয়েছিলেন জামাইবাবু সিঁটে এ বাড়ির ছেলে।

একদিন বিকেলবেলায় বাড়ি ফিরে দেখেছিল যে ক্ষীর কাঁটালের বাটি নিয়ে বসেছে বাড়ির ভাইবোনেরা—তার কথা কারুর মনে ছিল না। সিঁটে গুণ্ডা বলেছিল—সেদিনই যদি গোটাকতক ক্ষীর কাঁটালের বাটি লাথি দিয়ে

ছুড়ে ফেলে দিতে পারতাম তাহলে তারপর থেকে আমার কথা কেউ ভুলতো না—কিন্তু তখনো সে কায়দা শিখিনি।

বাড়ির একটা ছেলে পরীক্ষায় পাস দিল। ভালো করে পাস দিয়েছিল বলে বাড়িতে খাওয়া দাওয়া হল। সেই যে জামাইবাবু—খুব বিদ্বান আর খুব বড়োলোক তিনিও এসেছিলেন। অবশ্য সেবারে তাকে বাড়ির ছেলে বলেই বুঝতে পেরেছিলেন। সবায়ের সঙ্গে হেসে হেসে লেখাপড়ার কথা কইতে কইতে তার কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন জ্যাঠাইমাকে—এ কী করে?

ও কী করবে? ও সস্তায় কপি কেনে, গোরুর বিচুলি জোগাড় করে, জামাইবাবু এলে পুকুরে মাছ ধরাতে যায়। জ্যাঠাইমা বলেছিলেন—অনেক চেষ্টা করা হয়েছে ওর জন্যে, তা তোমার শ্বশুর মশায় বললেন ওর মাথায় গোবর ওর কিছু হবে না। তা সবায়ের মাথা তো ভগবান সমান দেন না।

বিদ্বান জামাইবাবু একটু হেসেছিলেন—তারপর সিগারেট আনতে দিয়েছিলেন। সে যখন ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল তখন জামাইবাবুকে মন্তব্য করতে শোনা গিয়াছিল।—যাক্ চোর ছ্যাঁচোড় না হলেই হল—লেখাপড়া না শেখে কিছু না।

পিসিমা বলেছিলেন—এখনও তো হয়নি, তবে হতে কতক্ষণ বাবা। আরও বলেছিলেন…এমনিতেই তোমার শ্বশুরমশায় রাগ করেন, বলেন গোপীনাথ স্মৃতিরত্নের বংশধর, কয়ের আঁকড়ি ডানদিকে না বাঁদিকে বলতে পারে না—ওঁর তো লজ্জায় মাথাকাটা যায় ভাইপো বলে পরিচয় দিতে।

জামাই সান্ত্বনা দিয়েছিল—যাক আপনার কৃষ্ণসহায়; আপনাদের মুখ রাখবে এখন।

চায়ের দোকানে বসে বসে তর মেজাজ হলেই সিঁটে গুণ্ডা এই গল্প সব ছাড়ত। কে বুঝি জিজ্ঞাসা করেছিল—গোপীনাথ স্মৃতিরত্ন কে?

জবাব দিয়েছিল সিঁটে—সে এক মাল ছিল আমাদের বংশে, খুব সমোসকৃত জানত। সে ব্যাটা আবার ষাঁড়কে ষাঁড় বলত না কী যেন একটা বলত—আহা হা কী যেন কথাটা গো, পেটে আসছে মুখে আসছে না।

জামতলির ভটচায্যিরা নিশ্চয়কে নিশ্চিত বলতেন। আপনি যদি জিজ্ঞাসা করেন—এটা আপনি করবেনই তাহলে। তাঁরা বলবেন—নিশ্চিত।

সিঁটে গুণ্ডার সঙ্গসাথী ধীরে ধীরে এমন সব হল যে সে আর নিশ্চিত

বলত না। সে বলত—জরুর। যদি বলা হত, জরুর বলছিস ভটচায্যির ছেলে? সে বলতে শিখল—জরুর বলবে, কাহে বলবে নারে?

বাড়িতে এমন ধারা হলে পাড়াতে এর চেয়ে বেশি হয় না আদর। সিঁটে গাই দোয়, বাজার করে, বিচুলি কুচোয়। সিঁটে শুনতো কারুর মাথায় গোবর পোরা আছে বুঝলেই তার বাড়ির লোক তাকে বলত—তোর অবস্থা সিঁটের মতো হবে বলে দিলুম। সিঁটের মাঝে মাঝে মনে হত নিজের মাথাটা ঠুকে ভেঙে একবার দেখে সত্যিই ভেতরে কী আছে—আর নয়তো ওদের মাথাগুলো একবার ফাটিয়ে দেখে সত্যি সত্যি কতটা ঘি আছে। শুধু বিন্দির গলির বৃদ্ধা দেহজীবিনীর দল বামুন নামাঙ্কিত কিছু একটা দেখলেই প্রণাম করত যখন—তখন সিঁটেকেও করত। এই সম্মানটুকুর লোভে সিঁটে বারবার বিন্দির গলি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তার ইয়ার দোস্ত সব বিন্দির গলিতেই জুটিয়ে ফেলল।

গোপীনাথ স্মৃতিরত্ন? ও সব ইয়ার্কি কথা সিঁটে গুণ্ডা অনেক শুনেছে। নামটা তার কাছে কোনোদিনই গুজব ছাড়া আর কিছু নয়। গোপীনাথ স্মৃতিরত্নের আত্মা বলে যদি কিছু থাকে তো স্বর্গ থেকে তিনি 'নিশ্চিত' সুখী হতেন না মাত্র এইটুকু দেখে যে সিঁটে আর কিছু শিখুক আর না শিখুক কাশীর পণ্ডিতদের কায়দায় 'স' উচ্চারণ করতে শিখেছে খুব। বলাবাহুল্য গোপীনাথ স্মৃতিরত্নের বাড়ির লোকেরা এই সংস্কৃত-ঘেঁষা উচ্চারণ শুনেই ঠিক করে ফেলল ছোঁড়ার হয়ে গেছে।

মতিচাঁদ বলেছিল—বলব কী বাবু, সিঁটে তো আমাদের চোখের সামনে গুণ্ডা হল। সেবার লাহোর থেকে এসেছিল মুহব্বত সিং। নবগঞ্জে তার নাম হয়েছিল লাহোরী গুণ্ডা। কানপুর থেকে জেলা-খারিজ হয়ে ব্যাটা এসে জুটেছিল নবগঞ্জের বিন্দির গলিতে। লাল টকটকে চেহারা, পাঞ্জাবী দাড়িগোঁফ। যা খুশি তাই করে বেড়াত। বিন্দির গলির মেয়েরা পর্যন্ত দরজায় খিল দিত মুহব্বত সিং-এর দাড়ির আঁচ পেলে। মদের দোকানে পয়সা দিত না। নবগঞ্জের মদের দোকানে মুহব্বত সিং-এর আমলের পর থেকেই নিয়ম হল যে আগে পয়সা দিয়ে তারপর মদ খেতে হবে। শহরের পাতি মাতালরা এর জন্যে অনেক দিন দুঃখ্য করেছিল।

এসেই মুহব্বত সিং পক্ষি পানউলিকে মুখ খিস্তি করে গালাগাল দিল। তখন পাখির ঘরে আসত হারাণবাবু। মাঝ রাত্তিরে হারাণবাবুকে ঘর থেকে বার করে দিয়ে মুহব্বত সিং পাখির ঘরে ঢুকেছিল। হারাণবাবুর এমন অপমান জগু কৈবর্তের মেয়েকে হাতছানি দিয়ে ডাকার সময়ও হয়নি। বিন্দির গলির আইনে এর চেয়ে বড়ো অপরাধ আর হয় না। মদের দোকানের মালিক রাধু সাকে একটা চড় হাঁকিয়েছিল এর ঠিক হপ্তাখানেক বাদেই।

এর পরের পর দিন মদে চুর চুর হয়ে লাহোরী গুণ্ডা মুহব্বত সিং ফিরছিল বিন্দির গলির দিকে। বকুলবালার পোড়া দালানটার সামনে এসে সেই অশথগাছটার তলায় শুয়ে পড়ল মুহব্বত সিং। চোরা কোকেনের ব্যবসা করত হোমিওপ্যাথ ডাক্তার বামাচরণ শীল। তাকে ফাঁসিয়ে দোব বলে শতখানেক টাকা আর দু-বোতল মদ আদায় করেছিল সে। বোতল দুটো দু-দোস্তে খালি করে, দোস্তকে সেখানেই শুইয়ে রেখে সে ফিরছিল—পাখির কাছে।

শুয়ে পড়ল মুহব্বত সিং। রাত তখন বারোটা।

সিঁটে ফিরছিল বিন্দির গলির ভেতর থেকে, ওখানে সে খেলতে যেত তিন-তাসের খেলা। পরপর দু-দিন ধার করে হেরেছে খেলায়—মেজাজ খারাপ। ভটচায্যি বাড়ির ছেলে বলে ওখানে তাকে খাতির করত গাড়োয়ানেরা, বিন্দির গলির ছোঁড়ারা। বিন্দির গলির মেয়েরা কখনো কখনো যোগেযাগে তাকে পেন্নাম করত—এর আগে কমবয়সী মেয়ের পেন্নাম সে কখনো পায়নি। সেইজন্যে নিজের পাড়া থেকে বিন্দির গলি তার ভালো লাগল। জুয়ো খেলায় ধার চাইলেই ধার পাওয়া যায় যেখানে সিঁটের কাছে সেটা খাতিরের শ্বশুরবাড়ি। সিঁটে দেখলে মুহব্বত সিং শুয়ে। জ্ঞান আছে কি সেই। সিঁটে দেখল বুকপকেট থেকে পেটমোটা মনিব্যাগটা উঁকি দিচ্ছে। রাস্তা ফাঁকা। যে লোকটা বসে রয়েছে, গান গাচ্ছে অশথগাছটার ওধারে, সেও এখন আর তাতে নেই। আগে ব্যাগটা বার করে নিয়েছিল সিঁটে। তারপর মাতাল লাহোরী গুণ্ডাকে একটা কচার ডাল জোগাড় করে সেই অজ্ঞান অবস্থাতে উত্তম মধ্যম পিটিয়ে দিল সিঁটে। মারের আওয়াজ আর সিঁটের তর্জন গর্জন শুনে যারা বেরিয়ে পড়েছিল ঘর থেকে—তারা অবাক। দেখে সিঁটে পিটোচ্ছে লাহোরী গুণ্ডাকে আর তড়পাচ্ছে।—ব্যাটা ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখোনি। আমার গায়ে হাত ?

লোকজনে জিজ্ঞাসা করেছিল, কী ব্যাপার, কী ব্যাপার?

সিঁটে গুণ্ডা বলেছিল—আমি আসছি, ব্যাটা আমার কলার চেপে বলে কিনা রূপেয়া নিকালো।

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—মতিচাঁদ, তুমি কি করে জানলে এমনধারা ঘটেছিল?

সেই অশথতলার মাতালটা বলেছিল বাবু, তবে সে মাতাল বলে তার গল্প আর কেউ বিশ্বাস করেনি।

বিন্দির গলিতে গাড়োয়ান পটিতে তার পনের দিন থেকে একটা অন্যরকম কদর হয়ে গেল সিঁটের। লাহোরী গুণ্ডাকে পিট্টি দেওয়ার পরের দিন দাপটের সঙ্গে চায়ের দোকানে সিঁটে তার নতুন নাম হেঁকে দিল—হাম সিঁটে গুণ্ডা। আমার সঙ্গে চালাকি নয়।

মতিচাঁদ বলছিল—বলব কি আপনাকে, সবাই মেনে নিল সিঁটেকে গুণ্ডা বলে। লাহোরী গুণ্ডাকে যে অমনিধারা ঠেঙিয়ে ধরাশয্যা ধরিয়ে দিতে পারে, নবগঞ্জের লোকে বলল সে আলবৎ গুণ্ডা। রাধু সার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে শিখল—পয়সা দাও। রাধু সাও দেখল যে হ্যাঁ, নবগঞ্জের বাজার এ লোক হাতে থাকা ভালো। রাধু সা পয়সা দিল সিঁটেকে।

ভেক না নিলে ভিখ মেখে না কথাই আছে দেশে। সিঁটেও দেখল পোশাকটা পাল্টিয়ে ফেলা দরকার। হাফ শার্ট, একখানা লুঙ্গি আর একটা হাণ্টার জোগাড় করে নিল। সাইকেলখানা ওকে কাটিকেষ্ট মিত্তির কিনে দিয়েছিলেন পরে।

সিঁটে দেখল এ ভারী মজা। তাকে কিছু করতে হয় না। সে হাজির শুনলেই লোকে ভয় পায়। হারাণকে পাখি বলল—তোমার ঠাকুর ল্যাঠা বড়ো। তুমি আসবে সেই রাত দুপুরে তখন আবার তোমার জন্যে গঙ্গায় চান করে সুদ্ধু হতে হবে রোজ। আমি পারবনি ওসব, নিলমণি হয়ে মরব শেষটা। হারাণ শুনে রেগে কাঁই হয়ে গেল। খবর দিল সিঁটেকে। হাতে কিছু গুঁজেও দিল। সিঁটে পাখিকে শুধু ডেকে বললে—মেয়েমানুষের বেশি তেজ ভালো নয়। সিঁটের চেহারা আর হাতের হাণ্টারখানাতেই কাজ হয়ে গেল। বিন্দির গলির মাসিদের কাছে সিঁটের একটা বরাদ্দই হয়ে গেল তারপর থেকে।

নবীন দাস নতুন পরোটার দোকান খুলল মদের দোকানের পাশে। নবীন

দাস নতুন লোক, অত শত জানত না। সিঁটে চারখানা চাটাই পরোটা আর দুটো লাল টকটকে ডিমের ডালনা খেয়ে উঠে যাচ্ছে। নবীন বলল—বাবু দাম? মুখ মুছতে মুছতে অবাক হয়ে গেল সিঁটে, তারপর হো হো করে হেসে ঘর ফাটিয়ে ফেলার জোগাড়।—তুম নয়া আদমি হ্যায়। বলে রাধু সা-কে পাশের দোকান থেকে ডেকে নিল সিঁটে—দেখুন দাদা কি দেয়লা দেখছে সব, আপনাদের ভাই বেরাদার একটু বলে দিন। রাধু সা বলে দিয়েছিলেন।

এই হল সিঁটে গুণ্ডার গুণ্ডা হয়ে যাওয়ার গল্প। বাড়ির সঙ্গে সম্বন্ধ আর রইল না। লাহোরী গুণ্ডাকে যেদিন ধরে ঠেঙিয়েছিল সেইদিনই বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হয়ে গিয়েছিল সিঁটের। যখন বাড়ি ফিরেছিল তখন জ্যাঠাইমা ওর গায়ে মদের গন্ধ পেয়েছিলেন। পিসিমা চেঁচিয়ে কেঁদে উঠেছিলেন—গোপীনাথ স্মৃতিরত্নের নাতি তুই, তুই মদ খেয়ে এলি বাজার থেকে। কৃষ্ণ-সহায় আর একটু হলে অজ্ঞান হয়ে যেত। সিঁটে বোঝাতে চেষ্টা করেছিল যে সে মদ খায়নি, গুণ্ডাকে ঠেঙিয়েছে শুধু। তাই শুনে আরো চিৎকার—কি হবে মা, মাতাল হয়ে গুণ্ডার সঙ্গে মারামারি করে আবার নিজের মুখে এসে বলছে। সেদিনই জ্যাঠামশাই বলেছিলেন—তোমায় আমি এক্ষুনি কিছু বলছি না তবে তোমার পথ তুমি এবার দেখো।

পকেটে লাহোরী গুণ্ডার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া করকরে একশ টাকা। সিঁটে সেই রাত্রেই পথ দেখল।

কাটিকেষ্ট মিত্তির নিজের তাগিদেই এ হেন লোককে জুটিয়ে নিলেন নিজের সঙ্গে।

চটকল বাজার। কাটিকেষ্ট মিত্তিরের জমিদারী। এ জমিদারী রক্ষা করতে গেলে পাইক পেয়াদা দরকার। যেমন সব জমিদারীতে দরকার। শিউপূজনের মতো ঠ্যাটা মজুর, বেয়াড়া, বে-আক্কেলে—কাটিকেষ্টর ভাষায় নিমকহারাম—কখনো কখনো জুটে যায়—তাদের টিট্ করা দরকার। সর্দারদের সঙ্গে হিস্তার গোলমাল নিয়ে বচসা হলে একটা সাহস থাকা দরকার। সিঁটে গুণ্ডা কাটি-কেষ্টর সেই সহায় ভরসা হল।

অনেকবার কাটিকেষ্টর মাসকাবারী নিমকের ইজ্জত রেখে সিঁটে মজুর ঠেঙিয়েছে। শিউপূজনকে রাতদুপুরে ঠেঙিয়েছিল যখন সিঁটে তখন তার হাত পাকা। হাণ্টার নিয়ে সাইকেল নিয়ে মিলরাস্তার মোড়ে সে শিস্ দিতে দিতে

ঘুরে বেড়াত। অসংগঠিত মজুরের ত্রাস আর ভয়।
সেবার গণেশ পুজোর হাঙ্গামায় কাটিকেষ্টর মতলব হাঁসিল করেছিল সিঁটে গুণ্ডা। কাটিকেষ্টর অনেকগুলো পাখি এক ঢিলে মারার জন্যে

সেদিন দুপুরবেলায় কাটিকেষ্ট বাড়ি ছিল না। কতকগুলো খবর নিয়ে সিঁটে গিয়েছিল কাটিকেষ্টর কাছে। বুধো ভয়ানক গোলমাল করছে। কালও তিন নম্বর লাইনে মিটিং করেছে বুধো। বিন্দির গলির মধ্যে একটা চায়ের দোকান ছিল সেখানে বসে বসে সিঁটে নিজেই তার গল্প বলত। মতিচাঁদ শুনেছিল যে সেদিন সন্ধ্যেয় সিঁটে খুব রোয়াবের সঙ্গে তার দুপুরবেলার গল্প বলেছিল। যারা শুনেছিল তারা বলেছিল যে, সিঁটে নিজের পেয়ারের গল্প বলতে বলতে সেদিন ঘেমে উঠেছিল। কাটিকেষ্ট বাড়ি ছিল না। দরজা খুলে দিয়েছিল কাটিকেষ্টর বোন গৌরী। বলেছিল—দাদা নেই, আপনাকে বসতে বলেছে মা। খানিকক্ষণ বসে বসে সিঁটের মনে হয়েছিল একবার তেষ্টা পেলে মন্দ হয় না। চেঁচিয়ে বলেছিল—একটু খাবার জল দেবেন।
জল নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল আবার সেই মেয়েটি। সঙ্গে একটা রেকাবিতে দুটো নাড়ু। এবার মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখেছিল সিঁটে। ষোলো-সতেরো বছরের ফুটন্ত মেয়ে। সেই কমবয়সের ঢেউ সবে লেগেছে তার শরীরে—যে বয়সে মেয়েদের দেহটা হয় ফুটিফুটি পদ্মকলি আর মনটা পদ্ম-পাতার জল। ডুরে শাড়ির লম্বা লম্বা দাগ সেই ঢেউগুলোকে পষ্ট করে তুলেছে—সিঁটের ভয়ানক গরম বোধ হচ্ছিল। নাড়ু দুটি খেয়ে জলের গেলাসে হাত দিয়েছে সিঁটে। হঠাৎ সেই মেয়েটি জিজ্ঞাসা করেছিল—আচ্ছা আপনার ভালো নামটা কী বলুন তো?
ভালো নাম? বিষম খেয়ে কেশে জলের গেলাস উল্টে জল ঘরময় ছড়িয়ে ফেলেছিল সিঁটে। ভালো নাম? চায়ের দোকানে বসে বসে সিঁটে বলেছিল—সে শালা কবে ভুলে গিয়েছি আমি। সিঁটে বলতেই সিঁটিয়ে ওঠে সবাই—আমাকে কি কেউ কখনো জিগ্যেস করেছে ভালো নাম। না জিগ্যেস করলে বলেছি?
চায়ের দোকানের কোনো ফক্কড় জিজ্ঞাসা করেছিল—যদি অমন ভালো মুখ করে কেউ জিজ্ঞেস করে ভালো নাম তাহলে?
তাহলে—হেসে হেসে সিঁটে জবাব দিয়েছিল—ভালবেসে বেসে আমি

বলব আমার নাম সিরি নবকিশোর ভট্টাচার্য।

চায়ের দোকান হেসে উঠেছিল। বলেছিল—বাহবা, তা বলেছিলি নাম অমনি করে?

সিঁটে একটা দেড়গজী হ্যাঁ বলে শেষে একটা বিসর্গ দিয়েছিল।

সেদিন তাস খেলায় সিঁটে জোর জিতেছিল; ছোঁড়াগুলো বলেছিল আজ ও লক্ষ্মীমন্ত হয়ে এসেছে।

বিন্দির গলির চায়ের দোকানের গল্প বিশ্বেস করুন চাই না করুন সে রাতে হারাণ মুখুজ্যে সিঁটের কাছে এসে আবার নালিশ করেছিল—দেখ্ বাবা পাখি আবার গোলমাল করছে।

সিঁটে নাকি ভাগিয়ে দিয়েছিল, বলেছিল—মুখুজ্যে একটু ভালবাসার কথা-টথা বলো গে যাও। ও তোমার কেবল টাকা আর দাপটের কম্ম নয়। হারাণ মুখুজ্যে বিষম খেয়েছিল কিনা সে খবর কেউ জানে না।

সিঁটে আবারও গিয়েছিল কাটিকেষ্টর বাড়ি।

নানান তালে নানান মতলবে ওকে প্রায়ই যেতে হত। কখনো বুধোর খবর নিয়ে, কখনো কোনো সর্দার বড়োবাবুর সঙ্গে কি লাইন-সায়েবের সঙ্গে কি গুজগুজ ফুসফুস করছে সেই সংবাদ নিয়ে। কাকে কড়কে দিতে হবে, কার গলায় একবার গামছা দেওয়া দরকার এই সব সলাপরামর্শ করতে প্রায়ই যেতে হত তাকে।

তবে এবার যেদিন গিয়েছিল সেদিন লুঙ্গি ছেড়ে ধুতি পরেছিল। হাফ শার্টটা কেমন যেন বেআব্রু ঠেকেছিল, পুরো হাতার শার্ট পরেছিল। সাইকেলটা ছিল—হাণ্টারখানা রেখে গিয়েছিল।

চায়ের দোকানে সেদিন গল্প করেছিল সিঁটে—আজ কাটিকেষ্টর বোন জিজ্ঞাসা করছিল হাণ্টার আনেননি?

সিঁটে আমতা আমতা করে বলেছিল—কেন, আমি কি রাতদিন হাণ্টার নিয়েই ঘুরি?

মেয়েটা বলেছিল—না, তা নয় তবে হাণ্টার না থাকলে আপনাকে ভয় করে না।

সিঁটে জিজ্ঞাসা করেছিল—ভয়ই যে করতে হবে এমন কি কথা আছে কোনো?

এর যে জবাব দিয়েছিল মেয়েটা তার হাতামাথা কিছুই সিঁটে গুণ্ডা বোঝেনি। মেয়েটা বলেছিল, ভয় না করলে আপনাকে ঠিক চেনা যায় না।

গল্প ভালো করে শেষ না করেই উঠে পড়েছিল সে। রসের গল্প—সবাই হাঁ হাঁ করে উঠেছিল, রসভঙ্গ হবে কোথা যাস।

একটু গঙ্গার ধারে গেল সে—মাথায় হাওয়া লাগাতে।

তা ছাড়া একটু তাড়াও ছিল তার। কাটিকেষ্ট বলেছিল তার মা, বোন আর বউকে নিয়ে একটু নবদ্বীপে রাস দেখিয়ে নিয়ে আসতে হবে। কাটিকেষ্ট বড়ো ব্যস্ত। সিঁটের চেয়ে বিশ্বাসী লোক পাবে কোথায়? যদিও তার পরের দিন, তবু সেই রাত্তির থেকেই সে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

সেদিন সমস্ত রাত্তির বোধ হয় সিঁটে গুণ্ডা ঘুমোয়নি। লালমোহন আর বিনি ওকে দেখেছিল গঙ্গার ধারের রাস্তায় পায়চারি করতে।

মতিচাঁদ বলেছিল—তা আপনার হবারই কথা। নবগঞ্জের বউ-ঝিউড়ির দল জানালা বন্ধ করত সিঁটেকে দেখলে। গঙ্গার ধারের মেয়েরা কাপড় সামলে ঘরমুখো হাঁটা দিত।

কাটিকেষ্টর বোন যদি একবার হেসে কথা কয়ে থাকে তো সিঁটের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেয়ার পক্ষে তাই যথেষ্ট।

তারপরে তার পরের দিন আবার নবদ্বীপে রাস দেখতে যাওয়ার কথা—সিঁটের ঘুম আসা উচিত নয় তখন।

একদিন বাদেই নবদ্বীপের রাস দেখে সিঁটে ফেরত এল।

সিঁটে আর সে সিঁটে নেই। বিলকুল পালটে গেছে সে। সারাদিন এলোমেলো ঘুরে বেড়াল। সন্ধ্যেবেলায় বিন্দির গলির সেই চায়ের দোকানে ওখানকার চ্যাংড়াদের নিয়ে বসেছিল আড্ডায়। সিঁটে বলেছিল—নবদ্বীপের মেলায় রাত্তির বেলায় গৌরী হারিয়ে গিয়েছিল। সিঁটে তাকে এক ঘণ্টা ধরে খুঁজে তবে বার করতে পেরেছিল। তারও এক ঘণ্টা বাদে ডেরায় ফিরেছিল তারা। রসের গল্পের খদ্দেররা জিজ্ঞাসা করেছিল—ঐ এক ঘণ্টা কী করলি তোরা?

কী আবার করবো বলে একটা কান-এঁটো-করা হাসি হেসে সিঁটে বুক পকেট থেকে বার করেছিল একটা মেয়েদের কপালে লাগানো টিপ। সিঁটে বলল—খসে ওইখানেই পড়ে গিয়েছিল। বিন্দির গলির চায়ের দোকান উলু দিয়ে উঠেছিল।

সেদিন মস্ত বড়ো চাঁদ মাথার ওপর নিয়ে সাইকেল করে সিঁটে ঘুরে বেড়াল—যেন উড়ে বেড়াল।

কাদের আলি একদিন এসে খবর দিল মতিচাঁদদের—তোদের সিঁটে যে চাকরি খুঁজছে রে।

কী রকম ?

কাল রাত্তিরে অ্যাসটন সায়েবের সঙ্গে মোলাকাত করেছে সিঁটে। সায়েবকে হাত জোড় করে নাকি খুব বলেছে। হানাই ধানাই সে। যার মোদ্দা কথা হল—সায়েব, আমাকে একটা চাকরি করে দাও। হেসে অ্যাসটন সাহেব বলেছিল—ভটচায্যি হঠাৎ তোমার এ মতলবের মানে কী ?

সিঁটে জবাব দিয়েছিল—চিরকালই এমনি কাটালে চলে সায়েব ? ঘর সংসার বিয়ে সাদি করতে হবে না ?

অ্যাসটন সায়েব হেসে খুন হবার জোগাড় হয়েছিল।

বহুত আচ্ছা, ভটচায্যি, সাদি করা বহুত ভালো বাত। কিন্তু তাহলে তোমার হাণ্টারের কী হবে ? কাটিকেষ্টর ফইজত সামলাবে কে ?

সিঁটে ওসব বাজে কথায় ভোলবার ছেলেই নয়। তখন বলেছিল—না সায়েব তোমাদের জন্যে আমি এত করি তুমি একটুখানি করবে না আমার জন্যে ?

সায়েব বলেছিল—তা তুমি কেষ্ট মিত্তিরকে পাকড়াচ্ছ না কেন ?

ওইখানটাতেই তো লুকোতে চায় সিঁটে। বলেছিল—না সায়েব, ধরলে একেবারে বড়ো গাছ ধরাই ভালো।

শিস দিতে দিতে অ্যাসটন বলেছিল—চাকরি তোমায় আমি করে দিতে পারি ভটচায্যি, করে দোবও। চাই কি কামারহাটিতে তোমায় আমি হাজরিবাবুর পোস্টই দিতে পারি, কতদূর লেখাপড়া করেছ তুমি।

সিঁটে বলেছিল—ফোর্থ কেলাস অবদি।

সায়েব বলেছিল—ঠিক হ্যায়, লেকিন আভি নেহি। থোড়া বাদ।

কেন ?

তোমার বুধনাথ গোলমাল একটা এখানে চটকলে করবেই। ইউনিয়ন সে বানিয়ে ফেলেছে। রোজ বৈঠক করছে ধাওড়ায়। এই সময়টা তোমার মতো একটা খলিফা আদমি আমি ছাড়তে পারি না। এই গোলমালের ধাক্কাটা সামলাতে পারলেই চটকলে আর এখন হুজ্জুত হবে না। এই

সময়টুকু তোমায় থাকতে হবে এখানে।

সিঁটে বলেছে—আমি থাকব। জান দিয়ে তোমার হল্লা ঠেকাব। কিন্তু তুমি ওয়াদা দাও, সায়েব।

কাদের আলি বলেছিল—সায়েব ওয়াদা দিয়েছে কাল রাতে।

মতিচাঁদের বক্তব্য ছিল যে এ পর্যন্ত সিঁটে গুণ্ডা ঠিক চলছিল, এইবার একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলল। সেও সর্দারদের নিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে কাটিকেষ্টর বাসায় রোজ বৈঠক বসাতে লাগল। সে দোসাদদের সঙ্গে কুর্মিদের লড়িয়ে দেবে ঠিক করল। মাধো সাহুর ধাওড়ার সঙ্গে ত্রিভুবনের ধাওড়ার অনেক দিনের রেষারেষি। সেটাকে সে কাজে লাগাবে ঠিক করল। বুধোর সমস্ত কেরামতির মূল হাভাত করিয়ে দেবে সে। বুধোর সব থেকে কমজোর জায়গা ছিল মাগী ডিপার্ট। কড়া করে সেখানে সে ভয় ছড়াতে লাগল। অ্যাসটন সায়েবকে পরামর্শ দিল—ওড়িয়া মজুররা সবচেয়ে ডরপোঁক, ওদের আগে কব্জা করে ফেলতে হবে।

সিঁটে গুণ্ডার কাজ দেখে কাটিকেষ্ট তাজ্জব। অ্যাসটন সায়েবও অবাক।

এদিকে সন্ধ্যে বেলায় চায়ের দোকানে গৌরীর গল্পে রোজই একটু একটু করে নতুন রঙ লাগছে। ফাল্গুন মাসে গাছে যেমন নতুন নতুন পাতা গজায়, বাহার খোলে নতুন নতুন, সিঁটে গুণ্ডার সন্ধ্যে বেলার গল্পেও তেমনি ডালপালা, পাতা-ফুল গজাতে লাগল হররোজ।

মতিচাঁদ বলেছিল—ঐ যে আপনি বললেন যে মানুষ যদি জানত যে এই গল্পের শেষটা আমার মনে ধরবে, এই গল্পের ধরবে না তাহলে অনেক গল্প মানুষ তার অদেষ্টে ঘটতে দিত না—যথাযথ কথা বলেছেন। কিন্তু আমিও যা বললাম সেটাও নির্ভুল—মানুষ তা জানতে পারে না। সিঁটে গুণ্ডা মনে মনে যখন ডানা মেলে উড়ছে তখন তার কপালে যে শিগগিরই ডানা ঝটপটিয়ে আছড়ে পড়া আছে এ আপনার আমি ঠিক বুঝেছিলাম।

তখন আর বিন্দির গলির চায়ের দোকানে সিঁটের রসের গল্প ভালো উতরোচ্ছে না। শোভা-বিকাশের গল্প আর লালমোহন-বিনির গল্প তখন সব শেষ হয়েছে, রসের গল্প জমানো তখন ভারী মুশ্‌কিল। তবু নবগঞ্জ—হুজুগ এখানে থুথু ফেললে পয়দা হয়—কাজেই সিঁটের খবরাখবর কিছু না কিছু পাওয়া যেতই। একদিন সন্ধ্যেবেলায় চায়ের দোকানের ছোঁড়াগুলো সব বসেছিল সিঁটের জন্যে—এলে একটু ফষ্টি-নষ্টি হবে। সন্ধ্যে

পেরিয়ে গেল। রাত গড়িয়ে গেল—সিঁটে ফিরল না। অনেক রাতে চা খাবার জন্যে মতিচাঁদ গিয়েছিল যখন, তখন দেখেছিল আর সবাই চলে গেছে, কেবল এককোণে টেবিলের ওপর মাথা রেখে লোহার চেয়ারে বসে রয়েছে সিঁটে। মতিচাঁদ তখনই বুঝেছিল সে ব্যাটার ওদিকে কিছু গড়বড় হয়েছে।

কানাকানি ফিসফাসের ভেতর দিয়ে সিঁটের ইয়ার দোস্তদের মারফত মতিচাঁদের কানে খবর এসে পৌঁছল। মতিচাঁদের সাঙ্গপাঙ্গরা কোনোদিনই সিঁটের ওপর খুশি নয়। মতিচাঁদ বলেছিল—বিশেষ সেই গণেশ পুজোর জলুসে সোডার বোতল হাঁকড়ানোর পর থেকেই লোকটার ওপর আমাদের ঘেন্না হয়ে গিয়েছিল। সিঁটে গুণ্ডার খবর যখন এরা সবাই শুনল—সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল—ভোঃ কাটা, ভারসা। মানে ঘুড়ি কেটে গেছে প্যাঁচ খেলতে গিয়ে।

কাটিকেষ্ট মিত্তির নাকি 'থ' হয়ে খানিকক্ষণ সিঁটের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। তিনিও বিষম খেয়েছিলেন কিনা সে খবর অবশ্য কেউ বলতে পারে না।

কাটিকেষ্টর চুপ করে থাকা দেখে সিঁটেও ভড়কে গিয়ে চুপ করে গিয়েছিল। অবশ্য ততক্ষণে তার যা বলার ছিল তা বলা হয়েছে—সে গৌরীকে বিয়ে করতে চায়। সে হাজরেবাবু হবে কামারহাটিতে। কাটিকেষ্ট গুম হয়ে বসেছিল। এর মধ্যে গৌরী একবার ঘরের মধ্যে কি একটা কাজে ঢুকে পড়েছিল। কাটিকেষ্ট ষাঁড়ের মতো ধমকে উঠেছিল তাকে—এ ঘরে কী দরকার রে, ডানা গজিয়েছে তোর?

বোনকে ধমক দিয়ে মনটা একটু হালকা করে কাটিকেষ্ট জিজ্ঞাসা করেছিল সিঁটেকে, তোমার মাথা খারাপ নাকি? তোমাকে আমি ভায়ের মতো দেখি আর তুমি এইসব আবোল তাবোল বকছ?

সিঁটে নাছোড়। সে তর্ক করেছিল কাটিকেষ্টর সঙ্গে—আপনার অমতটা কোন্‌খানে? কাটিকেষ্ট প্রথমটা এসব আনতাবড়ি কথা এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু সিঁটে গোঁয়ারের মতো তর্ক শুরু করে দিল। তখন কাটিকেষ্ট আর উপায় না দেখে নিজ মূর্তি ধারণ করেছে। কিংবা বলা ভালো সিঁটেকে সিঁটের নিজ মূর্তি দেখিয়ে দিয়েছে। কাটিকেষ্ট বলেছে—তুমি ক্যা হ্যা, নিজের

ওজনটা নিজে একবার বুঝে কথা বলতে পারো না? তা ছাড়া কার সঙ্গে কিসের কথা বলছ তুমি?

সিঁটের রাগ হয়ে গিয়েছিল শুনে, বলেছিল—কেন, আমি তোমার চেয়ে কমটা কিসে হলাম, দাদু। তুমি শালা মিত্তির, কায়েত বাচ্চা আর আমি হলাম গিয়ে ভটচাযি্য, গোপীনাথ স্মিতিরত্নের নাতি, আমি যদি পারি এ কথা পাড়তে তুমি ব্যাটা পারো না কেন?

কাটিকেষ্ট বলেছিল—গোপীনাথ স্মিতিরত্ন গোপীনাথ স্মৃতিরত্ন। কিন্তু তুমি কে, তুমি তো সিঁটে গুণ্ডা নাকি?

এই সময় বোধহয় একবার হাণ্টারখানা সঙ্গে করে কেন নিয়ে যায়নি বলে আপসোস হয়েছিল সিঁটের। কাটিকেষ্ট স্বগতোক্তি করেছিল চেঁচিয়ে—পয়সা দিয়ে কড়ি দিয়ে এ তো আচ্ছা কালসাপ পুষলাম আমি।

সিঁটে গুণ্ডাকে বসিয়ে রেখেই হঠাৎ হনহন করে ভেতরে চলে গিয়েছিল কাটিকেষ্ট মিত্তির। তারপরেই ছাতাব বাড়ি ধুপধাপ পিটুনির আওয়াজ শোনা গিয়েছিল। কাটিকেষ্টর সেকেলে নবগঙ্গী সৌজন্যে বোনকে রেগে গেলে হারামজাদী বলা চলে; সিঁটে গুণ্ডা শুনেছিল আওয়াজ আসছে—বল্ হারামজাদী, নাক খত দে, বল আর কোনোদিন ঐ গুণ্ডাটার সঙ্গে কথা বলবি, বড্ড রস তো·········

সিঁটে গুণ্ডা ওখান থেকে বসে বসেই শুনেছিল বোন কাঁদতে কাঁদতে প্রতিজ্ঞা করছে, না—সে আর কোনোদিন সিঁটের সঙ্গে কথা বলবে না এবং সে কোনো-দিনই বলতে চায়নি, ওই মুশ্‌কো লোকটাই ওকে ডেকে ডেকে কথা বলে।

সিঁটে আর বসেনি।

কাটিকেষ্ট পরে নাকি ওর বন্ধু-বান্ধবদের কাছে খোসগল্প করেছিল—দেখুন দিকি আমি কোথায় বারাসাতের কেষ্টকান্ত উকিলের ছেলে, গর্মেণ্টে ভালো চাকরি করে সেখানে বোনের বিয়ের ঠিক করছি, পুরো সাতটি হাজার আমার খরচ হবে—আর ও ব্যাটা······বামুন হয়ে চাঁদ ধরতে যাওয়া আর কাকে বলে? কাটিকেষ্টর বিদ্বেয় বামুনকে বামুন বলা স্বাভাবিক (এটা মতিচাঁদের ভুল নাও হতে পারে) আরো স্বাভাবিক কেষ্টকান্ত উকিলের সঙ্গে কুটুম্বিতে পাতানোর সখ। কাটিকেষ্টকে ভদ্দরলোক হতে হবে—সেকালে চটকলের হাজরিবাবু হলে শিক্ষিত মহলে পাত্তা পাওয়া যেত না—এ তো সে জানতই।

তার পরের দিনও সিঁটে গুণ্ডা গুম হয়ে বসেছিল।

বিন্দির গলির চায়ের দোকানের রসের গল্পের খদ্দেররা সিঁটেকে দু-একবার খুঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করল—কিন্তু না, ছোঁড়া তখন একেবারে মিইয়ে গেছে। মাঝে মাঝে জিইয়ে উঠে একবার করে শিস দিয়ে টেবিলে তবলা বাজিয়ে উঠছে সিঁটে—তারপরে আবার যে-কে-সেই।

একদিন গেল, দু-দিন গেল, চার দিন গেল।

দিন ছয়েক বাদে বিন্দির গলির চায়ের দোকানে সন্ধ্যেবেলায় শোনা গেল সিঁটে গণ্ডা চেঁচাচ্ছে। দেখেই বোঝা গেল প্রচুর টেনেছে—

বিন্দির গলির চ্যাংড়ার দলের মাঝখানে বসে মদের ঝোঁকে পাঁড় মাতাল সিঁটে হাণ্টার ঠুকতে ঠুকতে যা মুখে আসছে তাই বলে চলেছে।

ভদ্দরলোক—তোর চোদ্দপুরুষে কেউ ভদ্দরলোক ছিল—ব্যাটা কুলির পকেট কেটে রোয়াবি ফলাচ্ছিস। জানিস তোর হাঁড়ির খবর রাখি—আমি গোপীনাথ স্মিতিরত্নের নাতি—তুই আমাকে ছোটলোক বলিস্—ব্যাটা জানে না হাতি নাদলেও দশ সের—গোপীনাথ স্মিতিরত্নের পা ধোয়া জল খেলে উদ্ধার হয়ে যেত লোকে। আমি গুণ্ডো, ভদ্দরলোক নই—আর তুমি শালা মদের পিপে তুমি হলে ভদ্দরলোক—ঘুষের পয়সায় তুমি নবগঞ্জে নবাবী মারবে……গিছলাম আজ…শালী জানলার ধারে বসে বসে মৌজ করে স্যাকরার দোকানের গয়নার নমুনোর ছবি দেখছে, বে হবে……ঝাড়ে গুষ্টিতে শয়তান। নবদ্বীপে গঙ্গার ঘাটে সোহাগ কাড়াবার সময়ে ছাতার বাঁটের কথা মনে ছিল না।

বলতে বলতে দেখে পাখি যাচ্ছে ওর ঘরের দিকে—সিঁটে ডাকল—অ্যাই, ইদিকে, বলে তুড়ি দিয়ে ডাকল পাখিকে। —মুখুজ্যের সঙ্গে ধ্যাষ্টামো করিস আর? পাখি ভয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

সিঁটে খিঁচিয়ে উঠল– বল হারামজাদী, করিস ধ্যাষ্টামো?

তারপরে টলতে টলতে উঠে পাখিকে জড়িয়ে ধরে পাখির কানে মুখ রেখে জড়িয়ে জড়িয়ে বলতে লাগল সিঁটে– চল্ পাখি তুই আর আম্মো লালমোহনের মতো ঘর বাঁধিগে। তুইও নষ্ট মেয়েমানুষ, আমিও বয়ে যাওয়া ছেলে, একেবারে রাজযোটক হবে। বলেই হুড় হুড় করে বমি করে পাখির গা ভাসিয়ে দিলে।

পাখি তো চেঁচিয়ে পাড়ামাত—ওমা আমি কোথা যাব গো—আমার ঘরে যে লোক বসে রয়েছে গো, মদ কিনতে বেরিয়েছিনু আমি, এখন আমি কি করি? বমিটা একটু সামলে নিয়ে সিঁটে জিজ্ঞেস করেছিল—মদ কিনেছিস?

পাখি বলেছিল—হ্যাঁ, এই তো বোতল, বলে কাপড়ের ভেতর থেকে বোতলটা বার করে দেখিয়েছিল। হাত মুচড়ে বোতলটা কেড়ে নিয়ে সিঁটে বলেছিল—যা বল গে যা খদ্দেরকে, মদ পাইনি দোকানে—সিঁটে গুণ্ডা সব খেয়ে ফেলেছে।

রোশনচৌকি বসেছিল কাটিকেষ্টর বোনের বিয়েতে। উকিল তালুইমশাইকে কী করলে লেখাপড়া জানা লোকের মতো খাতির করা হবে বুঝতে না পেরে কাটিকেষ্ট হিমসিম খেয়ে গিয়েছিলেন। চটকলের সায়েব-সুবো, বাবু ওভারসিয়ারদের ভিড়ে, বাজনায়, আলোয়, খাবারে, খাতিরে—নিজের ছেলের ভাতের চেয়েও এক ঘটার মতন ঘটা করলেন কাটিকেষ্ট। মিলের কুলিকামিন আর সর্দারদের ডালা দেওয়া পুরনো জমিদারদের নজর নেওয়াকেও ছাড়িয়ে গেল। সর্দাররা সব দল বেঁধে দিয়ে গেল টাকার তোড়া। অ্যাসটন সায়েব আবার এক বাক্স মদ পেলেন। আর একবার বুধো আর শিউপূজন মাথা চাড়া দিল।

মিলগেটের সামনে দাঁড়িয়ে শিউপূজন সেদিন সকালে চেঁচাচ্ছিল, সঙ্গে ছিল বুধো। শিউপূজন বলছিল—ইস্‌কা জওয়াব মাঙ্গো সবকোই মিলকে, বোলো কাটিকেষ্টর বহিনকো সাদিমে এতনা জলুস কাঁহাসে নিকলা—কাঁহাসে রূপেয়া মিলা। খানা বেগর, দাওয়াই বেগর হামলোগকা বালবাচ্চা মর যাতা আর শালা হাজরিবাবু রেশনাই করতা, অ্যাসটন সায়েব দেখতা লেকিন চুপসে বৈঠা রেহতা।

ইয়া ভুঁড়িদার দালাল সর্দার ছুটো ভিড় হটাতে হটাতে শিউপূজনকে বলেছিল—তুমারা হাড্ডিসে ফিন একরোজ ছাতু বানায়গা।

ভিড়ের মধ্যে সিঁটে গুণ্ডা ছিল। এগিয়ে গিয়ে সর্দার দুজনকে বলেছিল—মু সামালকে বাত করো, নেহি তো ফ্যাসাদ হোগা। তারপর শিউপূজনকে বলেছিল—ঠিক হ্যায় শিউপূজন, নাম বাতাও সব শালা বদমাশকো—কুছ ডর নেহি হ্যায়। উ শালা লোগ দালাল হ্যায়—। চটকলে দালাল হ্যায় বড়ো সাংঘাতিক কথা। শিউপূজন আর বুধো ভেতরের কথা তত জানত না, অবাক হয়ে গিয়েছিল ব্যাপার দেখে।

ওখান থেকে চলে এসে সিঁটে সেদিন সারা সকাল ইস্টিশনের মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে রইল। সেই পুরনো সিঁটে। পরনে লুঙ্গি, গায়ে হাফ-

শার্ট, ডানহাতে হাণ্টার আর সাইকেল।

রোশনচৌকি বাজিয়ে পটকা ফাটাতে ফাটাতে বোন ভগ্নিপতিকে রেল গাড়িতে তুলে দেওয়ার জন্যে আসছিলেন কাটিকেষ্ট মিত্তির। বরযাত্রীরা রাতে কেউ কেউ ছিল।

বারাসাতের সেই বাঘা উকিল কেষ্টকান্ত বোস ছিলেন সারারাত—তখন ছেলে বউ নিয়ে ফিরছেন। চটকলের দৌলতে কাটিকেষ্ট একধাপ ওপরে উঠল সেদিন। দাঁত আর সেদিন তার ঢাকছিল না।

কিন্তু অতি হৈ হৈ-এর মধ্যেও কাটিকেষ্টর দাঁত ঢেকে গেল—যখন সিঁটে গুণ্ডা তার দিকেই সাইকেল ফেলে এগিয়ে আসছে সেদিকে তার নজর পড়ল। সিঁটে গুণ্ডা সটান কাটিকেষ্টর সামনে এসে থামল। কাটিকেষ্টর জামার কলার একহাতে মুঠো করে ধরল সে আর এক হাতে হাণ্টারকে সাপটে ধরে হাঁকলো—আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে মিত্তির মশাই।

সবাই হাঁ হাঁ করে উঠেছিল। এক দাবড়ানি দিল সিঁটে—চুপ রও কুত্তা সব, হাম সিঁটে গুণ্ডা, কলজে ফেড়ে প্রাণপাখি বার করে নোব টেরটি পাবে না।

ঠিক কথা। সবাই সরে দাঁড়িয়েছিল। কেষ্টর মতন কালো মিত্তিরমশাই তখন বেগনে হয়ে গিয়ে কাটির মতন রোগা চেহারাটা নিয়ে ভুলছেন।

সিঁটে গর্জে উঠল—আপনাকে এখানে এই পাঁচ আদমির সামনে একটা কথা কবুল খেতে হবে।

একটু অমায়িক হাসি হাসতে গিয়ে কাটিকেষ্ট বলেছিলেন, কি কথা ভাই?

কবুল খেতে হবে যে আপনি ভদ্দরলোকের বাচ্চা নন—বলুন, বলে সিঁটে হাণ্টার আপসাতে লাগল। ইস্টিসন সুদ্ধু লোক বোবা মেরে গেছে তখন। মতিচাঁদ বলেছিল, ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান, দোকানদার, ফড়ে যে যেখানে ছিল থ হয়ে গিয়ে দেখতে লাগল কি হয়।

সিঁটে আপনি ছেড়ে তুইয়ে নামল। আর একবার তড়পাল—বল্ তুই ভদ্দরলোকের বাচ্চা নোস।

মতিচাঁদ বলেছিল, সেদিন কাটিকেষ্টকে ঐ কথা কবুল খাওয়াত সিঁটে গুণ্ডা ঐ রাস্তা বোঝাই লোকের মাঝখানে। আর একটু হলেই সিঁটে হয়তো হাণ্টার হাঁকড়ে বসত কি করত কে জানে। কিন্তু কিছু হল না।

ঘোড়ার গাড়ির মাথা থেকে মতিচাঁদেরা দেখেছিল—সিঁটে তাকিয়ে আছে কাটিকেষ্টর বোন গৌরীর দিকে। গৌরীর চন্দনের ফোঁটা দিয়ে সাজানো

মুখখানা তখন ভয় মাখানো, গয়নাগাঁটি আর বেনারসী পরা শরীরখানা কাঁপছে—বড়ো বড়ো চোখ মেলে সিঁটে গুণ্ডার মুখের দিকে সে তাকিয়েছিল। এতক্ষণ কাঁদছিল, সিঁটের মূর্তি দেখে কান্না শুকিয়ে গেছে তখন। বাজনা বাদ্যি সব থেমে গেছে। সেই মেয়েটার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সিঁটের হাত আলগা হয়ে গেল। তার চোখে পলক পড়ছিল না। যেন ঘুম ভেঙে উঠল সে, বলল—ঠিক আছে চলে যান মিত্তিরমশাই, ভুল হয়ে গেছে, চলে যান, বলে চলে গেল।

কেষ্টকান্ত বোস জিজ্ঞাসা করলে—কে ও, পাগল নাকি ?

সিঁটেকে বিন্দির গলির ছেলেরা জিজ্ঞেস করেছিল—তুই ছেড়ে দিলি কেন ?

সিঁটে বলেছিল, নবদ্বীপের গঙ্গার ঘাটের কথা মনে পড়ে গেলে তার আর সাড় থাকে না।

মতিচাঁদের টিপ্পনি ছিল এই—বাবু, আর যাই হোক এ থেকে একটা সুবিধে হল এই সিঁটে আর গুণ্ডামো করেনি। নবগঞ্জের বাজারে কিছুদিনের মধ্যেই জুতোর দোকান খুলল সে। জামতলির লোক অবশ্য বলেছিল প্রথমটা—গোপীনাথ স্মৃতিরত্নের নাতি চামড়ার ব্যবসা করছে ; তা ও গায়ে মাখেনি। বছর খানেকের মধ্যে দোকানটা বেশ গুছিয়ে নিল সিঁটে। সেই এক পিরিতের থাপ্পড়ে মানুষ হয়ে গেল ছোঁড়া।

মতিচাঁদ বলেছিল—নবগঞ্জের কেচ্ছাদার গল্পের ঝুলি এখানে শেষ হল। সত্যিকার গল্প নবগঞ্জের হয়তো এর পরে—সে গল্পের আসল কথা বুধো, শিউপূজন, শুকুর আলি। আরো কত গল্প আছে যা আমি জানি না। ছিল কত গল্প যা বলা গেল না। হাওয়ায় এখানে গল্প ভাসে, তার কটাই বা বলতে পারলাম, বাবু।

এর পরে মতিচাঁদ আর গল্প বলেনি। শুধু দুটো-একটা ঘটনার কথা বলেছিল, নবগঞ্জের নতুন দিনের সূত্রপাতের দুটো ইঙ্গিত মাত্র।

সে বলেছিল, বাবু এর পরে যা ঘটল তারপরে গল্প শোনার, কেচ্ছার দিকে মন দেবার মতো মন আমাদের হারিয়ে গেল। পেটে দানা না থাকলে মনে ফুর্তি থাকে না, ফুর্তি না থাকলে কেচ্ছায় রসান দেবার মতো মসলা পাব কোথায় বলুন।

সে বছরের শেষ দিকে আমাদের সেই ফুর্তির দিন শেষ হয়ে গেল।

দশ

ঘোর কুটিল পন্থ তার, লোভ জটিল বন্ধ

নতুন ইলেকট্রিক লাইট সেদিন থেকে নবগঞ্জের রাস্তায় জ্বলল।

সেদিন মতিচাঁদকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন ধীরুবাবু।

সন্ধ্যের পর নবগঞ্জের রাস্তায় রাস্তায় কাজ না থাকলেও বেড়াতে বেরিয়েছিল লোকে সেদিন। ছোট ছেলেপিলেদের নিয়ে বয়স্করা বেরিয়েছেন, ছেলেরা বেরিয়েছে বন্ধু বান্ধব নিয়ে—সেদিন পড়ার ছুটি। দোকানীরা সেদিন দোকানের টাটে দোকানের বালক চাকরটাকে বসিয়ে সামনে দু পাক ঘুরে আসতে চাইছে। বিরক্ত হচ্ছিল নতুন মাতালের দল—কটকটে আলোটা চোখে লাগে—চক্ষুলজ্জা বাড়ায়। তবু—বেশ দেখাচ্ছিল বড়ো রাস্তার মোড়, খেয়া ঘাটের রাস্তার দু-ধার।

ফরসা দেখাচ্ছিল নবগঞ্জকে। নতুন ইলেকট্রিক লাইট সেদিন থেকে জ্বলছে শহরের বড়ো বড়ো ছটা রাস্তায়। কেরোসিনের টিমটিমে আলোর আলো-আঁধারি থেকে মুক্তি পেল সেদিন থেকে নবগঞ্জ। যদিও তখন শহরের অর্ধেকেরও বেশি রাস্তায় কেরোসিনের সেই পুরনো আলোই রইল তবে তা যে আর বেশি দিন থাকবে না এটা নিশ্চিত। এর অনেক আগেই এ আলো জ্বলা উচিত ছিল—জ্বলেনি মিউনিসিপ্যালিটির দলাদলির জন্যে।

বড়ো রাস্তায় আর বাজার রাস্তায় আলোটা বেশ খোলতাই হয়নি। কেননা ওখানে বড়ো বড়ো দোকানগুলোর পেট্রোম্যাক্স রাস্তাটাকে সন্ধ্যের পর আলোয় ভরে রাখত। কিন্তু দেখবার মতো আলো হয়েছিল সেনপাড়ায়। ও পাড়ায় তিন তিনটে কমিশনার। ওপাড়ায় আলো তাই আগে গেছে। চমৎকার দেখাচ্ছিল সেনপাড়ার সমৃদ্ধ বাড়িগুলোর মাঝে মাঝে নতুন বসানো ইলেকট্রিক আলো।

তখন স্বপ্ন কিংবা দুঃস্বপ্ন নবগঞ্জের সেই আদিম দিন যখন ডেন পর্তুগীজদের কোশা, সাম্পান, বজরা এসে ভিড়ত ঘাটে, যখন বিদেশী নাবিকের দল দেহের হাটের খদ্দের হয়ে অন্ধকার রাস্তাকে সচকিত করে মশাল জ্বালিয়ে বিন্দির গলিতে গিয়ে উঠত, যখন জামতলির মন্থর শাস্ত্রচর্চায় নবগঞ্জের হেটো-বুদ্ধি বাঁড়ুজ্যেদের কুলগর্ব কোনো ছায়া ফেলেনি। সেনপাড়াকে সুন্দর

দেখাচ্ছিল। মাতাল ছোটবাবুর সে রাত্রে আর ড্রেনে পড়ার কথা নয়। শুধু বিদঘুটে দেখাচ্ছিল রাস্তার দু-পাশের বড়ো বড়ো নর্দমাগুলোকে। শুয়োরের কর্দমকেলির অবাধ এলাকাগুলোকে। আর বিদঘুটে দেখাচ্ছিল সেনপাড়ার তেমাথার নিকিরি গিন্নীর জ্বেলে দেওয়া মস্ত বড়ো রেড়ির তেলের প্রদীপটাকেও। নতুন ইলেকট্রিক আলোয় সেটা যেন কেমন ম্যাড়মেড়ে হয়ে পড়েছিল। সেদিন আর সেটার দিকে কেউ ফিরে তাকাচ্ছিল না। সে তো পরের কথা, সেদিন থেকে পূর্ণিমার চাঁদও বাতিল হল নবগঞ্জে।

কত দিকে নবগঞ্জের রূপ পাল্টাচ্ছে কত ভাবে।

আলো জ্বালানো বড়ো রাস্তা ছেড়ে গঙ্গার ধারের চালের আড়তে গলির মধ্যে ঢুকল মতিচাঁদ। ধীরুবাবুর চালকলের আপিস ঘরে কেরোসিনের ডিজ লণ্ঠন জ্বলছিল। ধীরুবাবু প্রতীক্ষা করেছিলেন মতিচাঁদের জন্যে।

বকুলবালার ভাশুর ধীরুবাবুর বয়স হয়েছে তখন। কতদিন আগে বকুলবালার মেয়েলী তাগদ আর পুরুষালি জেদের সঙ্গে পাঞ্জা লড়েছিলেন ধীরুবাবু। কলঙ্কের সেই জয়ের ইতিকথা তখনো ছড়িয়ে আছে নবগঞ্জের মজলিসে আড্ডায়। মিলের ঠিকাদারি, চাল কলের মালিকানা, বাজারের স্বত্ব সব মিলিয়ে তখন নবগঞ্জের সবচেয়ে বড়া আদমি তিনি। ধাপে ধাপে অনেক দূরে উঠেছিলেন। হয়তো সব ধাপগুলো সমান প্রশস্ত নয়। হয়তো কতকগুলো সংকীর্ণ, কতকগুলো পিচ্ছিল। কিন্তু উঠেছেন তিনি। অ্যাসটন ম্যাকফারসন থেকে শুরু করে মাধো সাহু ত্রিভুবন সবাইয়ের কাছে তাঁর যে সমান কদর এর জন্যে মেহনত করতে হয়েছে তাঁকে।

তখন নবগঞ্জের কলকাতামুখো রাস্তা পাকা হয়ে গেছে। নবগঞ্জ থেকে মহকুমা পর্যন্ত বাস সার্ভিস চালু হবে। চারখানা বাস সারাদিনে যাতায়াত করবে। নবগঞ্জের স্টেশনের উত্তর দিকে ঘোড়ার গাড়িগুলো দল বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে, ঘোড়াগুলো পা ছোঁড়ে। গাড়োয়ানেরা গান গায়। হল্লা করে। আর দক্ষিণদিকে চারখানা মাঝারি সাইজের বাস দাঁড়িয়েছে এসে সেদিন সকাল থেকে। রাত্রে দুখানা চলে যাবে মহকুমা শহরে। পরের দিন সকাল থেকে নবগঞ্জে বাস সার্ভিস শুরু হবে। বাসের মালিক ধীরুবাবু।

চারখানা বাসের জন্য বারো পাঞ্জাবী আর বাঙালী ড্রাইভার আর সহিস

বাসা নিয়েছে নিধুর মোড়ের কাছে নতুন খোলার বস্তিতে। আগের দিন তাদের সঙ্গে একটা ছোটখাট মারামারি হয়ে গেছে—ঘোড়ার গাড়িওয়ালাদের। যেদিনের কথা বলা হচ্ছে সেদিন সকালে অবশ্য সব জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। তবে ভেতরে ভেতরে একটা চাপা রাগ গুমরে গুমরে উঠছিল —মতিচাঁদ তার সাক্ষী।

ধীরুবাবু ডেকে পাঠিয়েছিলেন মতিচাঁদকে।

মতিচাঁদ বলেছিল, সেদিন আমারও মনমেজাজ ভালো নয় একদম। আমি এ চটকল বাজারের রক্ত চিনি। আমি জানতাম যে আগের দিন যে রক্ত পড়েছে হীরু গাড়োয়ানের মাথা ফেটে সে রক্ত বদ্‌লা না নিয়ে থামবে না। থামার কথা নয়। এই জন্যে থামার কথা নয় যে, রক্ত যখন পেট আর পিরিতের দোহাই দিয়ে ঝরে তখন তা একজনের রক্ত শেষ না হওয়া ইস্তক থামে না। লালমোহনকে নিয়ে তিরিশ ভাই গাড়োয়ানের রুটিতে রুজিতে তখন হাত পড়তে যাচ্ছে। মাথার ঠিক নেই কারুর। মতিচাঁদ বলেছিল মাথা-ফাটা হীরু থেকে শুরু করে কানা শিবু পর্যন্ত সবাই সে রাতে পঞ্চির দোকানের পাশে দেশী সরাবের দোকানে ভিড় করেছিল। চড়া মদের রঙ মাথায় যত চড়ছিল মন তত কড়া হচ্ছিল তাদের।

ধীরুবাবুর লোক গিয়ে মতিচাঁদকে ডেকে নিয়ে এসেছিল।

যেতে যেতে মতিচাঁদ ভাবছিল ধীরুবাবুর ভাইয়ের কথা। বকুলবালার কচিবাবুর কথা। অনেক দিন হয়ে গেল।

অনেক দিন মতিচাঁদ গাড়োয়ানী করল। মতিচাঁদ চিরদিনই ভাবে যদি বকুলবালার ঘটনা অমন ধারা না ঘটত তাহলে কখনো কি সে গাড়োয়ানি করত।

ধীরুবাবুর সঙ্গে মতিচাঁদ কখনও কথা বলেনি। ধীরুবাবুর বোধহয় মনে মনে একটা অপরাধ বোধ ছিল। হয়তো ধীরুবাবু ভাবতেন যে এ লোকটা বাড়ির কেচ্ছা সবটাই জানে।

মতিচাঁদ বলত—আমিও কোনোদিন কথা বলিনি ধীরুবাবুর সঙ্গে। লোকটাকে দেখলে কেমন যেন একটা রাগ হত আমার।

তবে মতিচাঁদ সব কেচ্ছা জানুক আর নাই জানুক বকুলবালার ভাশুর বলে ধীরুবাবুর যে পরিচয় নবগঞ্জে চালু ছিল সে কথা কেউ তখনো ভোলেনি। কোনো কারণে রাগ হলেই ধীরুবাবুর ওপর, নবগঞ্জের লোক

প্রয়োগ করত সেই মোক্ষম গালাগাল অবশ্য আড়ালে—ব্যাটা বকুলবালার ভাশুর এই কথা বলল।

বেশ্যার সম্পত্তি মেরে বড়োলোক ধীরুবাবুর এ কলঙ্কও কোনোদিন ঘুচল না।

হ্যাঁ, মতিচাঁদ ভাবতে ভাবতে রাস্তা হাঁটছিল—অনেকদূর উঠেছেন ধীরুবাবু, কিন্তু সেই চড়াই রাস্তার দু-ধারে কত বকুলবালা, কত শ্যামধারী পড়ে আছে ধীরুবাবু নিজেও বোধহয় তার হিসেব রাখেননি।

একটা সাদা শার্ট, ধুতি আর কেড্‌স জুতো পরা ধীরুবাবুকে সমীহ করে না এমন বুকের পাটা কারুর ছিল না নবগঞ্জে। কুলির ঠিকাদারি করে করে কথাবার্তা সাধারণ লোকের চোয়াড়ে হয়ে যায়। ধীরুবাবুর মুখ ছিল মিষ্টি। এত মিষ্টি যে লোকে বলত, ধীরুবাবু মধু দিয়ে মুখ ধোন সকাল বেলায়। কারুর সাতে-পাঁচে তিনি অকারণে কোনোদিন থাকেননি।

কেবল টাকার অঙ্কের সঙ্গে টাকার অঙ্ক যোগ করা ছাড়া জামতলির বাঁড়ুজ্যেদের সেই তদানীন্তন কুলতিলক আর কোনো কাজকেই কাজ বলে মনে করতেন না।

কাঁচা টাকা লাখ টাকা কে গুনে দিতে পারে হাতে করে নবগঞ্জে? সেকালে যদি নবগঞ্জের বাজারে গিয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন সেকথা, নবগঞ্জের বাজার সমস্বরে জবাব দিত—ধীরুবাবু। তারপরেই গলা নামিয়ে চাপা স্বরে বলত—বকুলবালার ভাশুর।

ধীরুবাবু বসেছিলেন মতিচাঁদের জন্যে।

মতিচাঁদ গিয়ে দাঁড়াতে ধীরুবাবু সাদরে অভ্যর্থনা করেছিলেন তাকে।

আরে এসো এসো মতিচাঁদ, তোমার জন্যেই উঠতে পারছি না এখান থেকে। তারপর—শরীর যে কাহিল কাহিল দেখাচ্ছে একটু—খবর সব ভালো তো?

এমন ভাবে কথা শুরু করলেন ধীরুবাবু যেন মতিচাঁদের সঙ্গে দু-বেলাই দেখা হয় তাঁর।

মতিচাঁদ বলেছিল, আমিও কম যাই না, জবাব দিলাম—আছি একরকম আপনাদের পাঁচজনের আশীর্ব্বাদে।

মতিচাঁদ ঘরের মেঝেয় বসল। ক্যাশবাক্সের সামনে, তোষক আঁটা জলচৌকিতে বসলেন ধীরুবাবু।

তারপর উশখুশ শুরু করলেন, কী করে কথাটা পাড়বেন বুঝতে পারছিলেন না।

মতিচাঁদ বলেছিল—আমার ব্যাজার লাগছিল, আগের দিন থেকেই মন মেজাজ খারাপ, তখন আর ওসব ঝুটো আমড়াগাছি শোনার সখ ছিল না, ফুরসতও ছিল না।

মতিচাঁদ নিজেই শুরু করেছিল—আপনি আমাদের রুটি মেরে দিলেন, বাবু।

একটু নড়েচড়ে ঠিক হয়ে বসলেন ধীরুবাবু। পানের বাক্স্ থেকে একটা পান বার করে গালের মধ্যে ঠেলে দিলেন। তারপর একটা কাশীর জর্দার কৌটো থেকে একটিপ জর্দা নিয়ে মুখের মধ্যে ছেড়ে দিলেন। গম্ভীর হয়ে শুরু করলেন ধীরুবাবু—দেখো মতিচাঁদ, রুটি তোমাদের মারা যাচ্ছে বা খানিকটা যাবে একথা আমি যে জানিনে, তা নয়। কিন্তু আমি বাস সার্ভিস চালু না করলে নবগঞ্জের রাস্তায় বাস চলত না কোনোদিন? তুমি জানো দাসপুকুরের রামেশ্বরপ্রসাদ আজ ছ-মাস ধরে চেষ্টা করছে? তাকে ফাঁসিয়ে আরো কাঠ খড় পুড়িয়ে আমি আর মাধো সাহু দুজনে মিলে এই বাস কোম্পানি খুলেছি। আমি না খুললে ত্রিভুবন খুলত, ত্রিভুবন না খুললে নিত্যহরি খুলত। কাজেই তোমরা ঝুটমুট গোলমাল করছ কেন?

হাত জোড় করে ধীরুবাবুকে বলেছিল মতিচাঁদ—বড়োবাবু, আমার বালবাচ্চা নেই, আজ এখানে খাই কাল ওখানে খাই—আমার জন্যে নয়। কিন্তু গণ্ডাকতক করে কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে যারা কেবল এই ঘোড়ার গাড়িখানার মুখ চেয়ে বসে থাকে, আপনি তাদের কথা ভাবুন।

কামানো-গোঁফ মুখখানায় হাত বুলোতে বুলোতে জিজ্ঞাসা করলেন ধীরুবাবু—তাদের কথা ভাবলে নবগঞ্জের রাস্তায় বাস চালানো হবে কোনোদিন, মতিচাঁদ?

মতিচাঁদ জবাব দিয়েছিল—নাই চালানো হল বড়োবাবু, কী খেতি হবে তাতে? আপনার তো ওপরওলার দয়ায় অভাবই নেই কিছুর।

ব্যাপারটা অভাবের নয়। ব্যাপারটা জেদের। তুমি জানো মতিচাঁদ অ্যাসটন সায়েবের একটা দুখ্যু আছে। তার দুখ্যু এই যে সে তার মিলের মালিক নয়। যাদের টাকায় কারখানা তারা জানেও না কোথায় কোন্ কারখানায় কোন্ দেশে তাদের টাকা খাটছে। অ্যাসটন সায়েব শুধু সেই টাকার খিদমদগার। জানো মতিচাঁদ, আজকাল অ্যাসটন সায়েবও আমাকে হিংসে করে। সে চাকরি করে—সাদা চামড়া হলেও চাকরির জ্বালা আছে তার। কিন্তু আমি মালিক।

মতিচাঁদ বলেছিল—বড়োবাবু, মালিক বলেই তো আপনার কাছে ভিক্ষে চাইছি।

আপনি আমাদের বালবাচ্চা বউগুলোর দিকে তাকান।

তাকালে বাস চালাতে পারব না, মতিচাঁদ।

নাই চালালেন আপনি—

রামেশ্বরপ্রসাদ চালাবে তাহলে। কথা তো একই।

আমাকে মতিচাঁদ বলেছিল—বাবু, সাধারণত আমার মাথা গরম নয়। কিন্তু আগের দিন থেকে মনমেজাজ বিগড়ে রয়েছে আমার। মাথাফাটা হীরুর মাথায় হাত দিয়ে চুপ করে বসে থাকার ছবিটা থেকে থেকে মনে পড়ছিল। মনের মধ্যে একটা দুর্ভাবনাও রয়েছে।

বলে ফেলালাম—তা হলে রামেশ্বরপ্রসাদ চালালে যা হবে আপনি চালালেও তাই হবে। কিন্তু ধীরুবাবু রাগ জানতেন না। কচর মচর করে পান চিবুতে চিবুতে একটু উঠে বাইরে গেলেন। পিক ফেলে এসে বসলেন আবার। পা দিয়ে পা ঝেড়ে আস্তে আস্তে বললেন—কী হবে মতিচাঁদ?

মতিচাঁদ বলেছিল, কথাটা মুখ দিয়ে বার করেই বুঝেছিলাম—একটু বেছুট কথা হয়ে গেছে। কাজেই একটুখানি চুপ করে রইলাম।

আমি কথা বলার আগেই ধীরুবাবু কথা বললেন।

বললেন—আমি বলব মতিচাঁদ কী হবে? মারামারি হবে। তোমরা নবগঞ্জে ড্রাইভার সহিসদের টিঁকতে দেবে না। বাসের ইঞ্জিন নষ্ট করার তাল করবে। নবগঞ্জের বড়ো রাস্তা সরু রাস্তা ব্লক করে বদমায়েশি করে আস্তে আস্তে গাড়ি চালাবে। আরো অনেক রকম গোলমাল হবে। আরো দিনকতক হয়তো বিন্দির গলির ছেলেরা বকুলবালার ভাশুর বলে চেঁচাবে। তাতে কিছু যাবে আসবে না। কিন্তু আমি কি করব জানো, মতিচাঁদ?

মতিচাঁদ বলেছিল, পুলিস ডাকবেন।

জিভ্ কেটেছিলেন ধীরুবাবু—ছি ছি ছি মতিচাঁদ, তুমি আমাকে পুঁটি মামলাবাজ ভাবলে শেষটা, আমি পুলিসে যাব? রামোঃ।

তবে?

গোঁফ-কামানো মুখটায় হাত বুলুতে বুলুতে বললেন ধীরুবাবু—তোমাদের বাঁচবার রাস্তা আমি এখনো একটুখানি খোলা রেখেছি, সেটা বন্ধ করে দোব।

রগটা টিপ টিপ করছিল মতিচাঁদের, টিপে ধরে কপালের দু-পাশ চুপ করে তাকিয়েছিল মতিচাঁদ ধীরুবাবুর দিকে।

ধীরুবাবু জিজ্ঞাসা করেছিলেন—মতিচাঁদ, বাস কোথা থেকে কতদূর যাবে?

নবগঞ্জ থেকে মহকুমা পর্যন্ত যাবে। নবগঞ্জ বড়ো ইস্টিশন। সব গাড়ি থামে এখানে। সব সময় ট্রেন থাকে না। তখন ঘোড়ার গাড়ি ভরসা।

এবার থেকে বাস ভরসা হবে। কিন্তু নবগঞ্জের কোন্ দিকটায় বাস ভরসা?

দক্ষিণ দিকটায়।

শোনো মতিচাঁদ, উত্তর দিকটায় দাসপুরের দিক খোলা রেখেছি এখনো তোমাদের জন্যে। আমার অসুবিধে আছে বলে। যদি বেশি ট্যাণ্ডাই ম্যাণ্ডাই করো তা হলে নবগঞ্জ থেকে বাস না চালিয়ে আমি দাসপুকুরের ওধারে বাস স্ট্যাণ্ড খুলব, ওখান থেকে বাস চালাব। উত্তর দিকও বন্ধ হয়ে যাবে তোমাদের।

মতিচাঁদ বলেছিল, আমার মাথা ঘুরে গেল সব শুনে। বললাম—কী বলছেন, বাবু?

এখনো সব বলিনি। যদু সাধুখাঁ আর নিত্যহরি পাল মানুষটানা রিক্শা কিনেছেন নবগঞ্জের বাজারে চলবে ভালো বলে।

অস্ফুট স্বরে মতিচাঁদ বলেছিল—বাবু।

হ্যাঁ। কাজেই বুঝছ মতিচাঁদ ব্যাপারটা খুব গুরুতর। যাও এখন, কখনো দরকার পড়লে আসতে পারো। তবে সবাইকে বলে দিও যা বললাম।

মতিচাঁদ গুম হয়ে ফিরে গিয়েছিল বিন্দির গলির মোড়ের মাথায়। পঞ্চি পানউলির পাশের মদের দোকানের পিছনে। নতুন জ্বলা ইলেকট্রিক আলোর তলায় ওরা সব বসে জটলা করছিল।

হীরু, শিবু, গদাই, লালমোহন সেখানে সবাই ছিল। যেতেই ছেঁকে মেকে ধরল ওকে সবাই মিলে। কোথায় ছিলে দাদা? ব্যাটাদের রোয়াব দেখলে এতক্ষণ মাথার ঝিঁটকি নড়ে যেত। বাস চারটে নিয়ে একবার রাস্তার এদিক একবার ওদিক করছে আর ভেঁপু বাজাচ্ছে যত ইচ্ছে। হীরু প্রত্যেক কথায় জোর দিয়ে দিয়ে বলল—মনে হল মারি শালা একখানা ইঁট ছুঁড়ে। তা ভাবলাম উঠে আবার যাব?

গদাই ধমক দিল হীরুকে, হাতখানাকে তুলে ধরে অনেক চেষ্টা করে বলল—তুই থাম দিকি, মারপিটের তুই কি বুঝছিস রে? ও থান ইঁট মারলে কি হবে, এ কি খেঁকি কুত্তা তাড়াচ্ছিস নাকি? থান ইঁট শিখেছিস ভারী রে!

হীরু রেগে গিয়ে জবাব দিল—তবে কি বিল্বিপত্তর ছুঁড়তে হবে। বলেই

হেসে হেঁচকি তুলে একাকার।

গদাই মাথা ঝাঁকানি দিল। দিয়েও যখন কথাটাকে টেনে বার করতে পারল না পেট থেকে তখন আর একবার মাথা ঝাঁকানি দিল, বলল—সের পাঁচেক চিনি জোগাড় কর, ও বাসের ছেরাদ্দের চাল চড়িয়ে দিচ্ছি।

শিবু বসে বসে আঙুল দিয়ে আকাশে কি আঁকছিল, বলল—চিনি দিয়ে চাট হবে এ যে নতুন কথা বাবা।

গদাই যেন ভারী দুখ্যু পেয়েছে এমন ধারা মুখ করে বলল—লে হালুয়া, আমি চাট হবে বললাম?

মতিচাঁদ সবাইকে থামিয়ে দিয়েছিল, বলছিল—ফক্কুড়ি পরে করিস, কথা শোন্।

গদাই খপ্ করে মতিচাঁদের হাতখানা ধরে ফেলল—একটা বিচার না করে দিলে আত্মঘাতী হব, দাদা।

কিসের বিচার?

আমি চাট হবে বলেছি নিজের মুখে?

শিবু ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়ে বলল—আহা সেই কথাই তো বলছি চিনি দিয়ে কি চাট হয়?

মতিচাঁদ দেখল শুধু লালমোহন বসে আছে দলছাড়া হয়ে—একলা।

লালমোহন মতিচাঁদকে জিজ্ঞাসা করল—আমাদের কী হবে, দাদা?

আমাদের মানে—

মানে এই সবায়ের—

সকলের যা হবে তোরও তা হবে?

কিন্তু বিনির কী হবে তা হলে? পঞ্চিমাসি যে পুলিসকে মিনসিপ্যালটিকে উস্‌কোচ্ছে।

কী বলছে?

বলছে বিন্দির গলির মেয়ে পাড়া ছেড়ে দিয়ে বে-পাড়ায় বসত করছে কোন্ সাহসে? এখন যদি ধীরুবাবু বাস চালিয়ে দেয় সবচেয়ে আগে চোট খেয়ে যাব আমি, ধার কর্জ করে নেমেছি, পুঁজিপাটা কিছু নেই—বিনিকে নিয়ে দাঁড়াব কোথায়? এই অবধি বলে একটু দেঁতো হাসি হেসে লালমোহন বল—লমুশ্‌কিলে পড়ে গেলাম।

মতিচাঁদ একটু হালকা করার জন্যে বলল—মুশ্‌কিল আর পিরিত পাশাপাশি

থাকে, জানিসই তো সে কথা ?
এই অবধি বলে মতিচাঁদ বলল—যাক্ এখন চল একবার বুধোর কাছে। একটু পাকা মাথার পরামর্শ নেওয়া যাক।
ওরা যাচ্ছে দেখে গদাই কোনো রকমে মাথাটা তুলে বলল—চিনি এনো তা হলে পাঁচ সের।
শিবু বলল—চিনি দিয়ে চাট হয় না ভাই।

বুধোকে খুঁজতে খুঁজতে মতিচাঁদ হাজির হয়েছিল ত্রিভুবনের ধাওড়ার একটা লাইনে। সেখানে ইলেকট্রিক নেই এমন কি কেরোসিনের আলেয়া বাতিও জ্বলে না। অন্ধকার কুলি মহল্লার মাঝখানে রাস্তা। সরু রাস্তা। রাস্তাকে মাঝে রেখে মুখোমুখি সারি বাঁধা ঘর। ঘরের সামনে সারি দিয়ে পড়ে আছে খাটিয়া, ঘরের মধ্যে একটা করে তেলের কুপি জ্বলছে। রেলের ওয়াগন থেকে চুরি করা কাঁচা কয়লা কেউ কোথাও গাদা করে জ্বালিয়ে দিয়েছে—তারি একটু আলো হয়তো ভরসা।
বুধোর তালাশ করতে করতে মতিচাঁদ আর লালমোহন হাজির হল একটা খাটিয়ার মেলার কাছে। খাটিয়াগুলো বোঝাই করে চারদিকে পা ঝুলিয়ে লোকগুলো বসে আছে। বুধো বসে রয়েছে একধারে। শুকুর আলি আর শিউপূজন গেছে মহাবীরপ্রসাদ জুট মিলের লাইনে।
কলকাতা থেকে এসেছেন কে একজন বাবু। বিলেতে থেকে লেখাপড়া শেষ করেছেন তিনি। তিনি কি সব বলছেন হিন্দিতে। ইউনিয়ন, একাই, মোর্চা, জুলুম—এইসব কথা বলে যাচ্ছেন। শ্রোতার দল উশখুশ করছে —খৈনি টিপছে, বিড়ি টানছে। হয়তো কিছুই বুঝছে না। কিন্তু কিছুই জিজ্ঞাসা করছে না। এখন করবে না। বুধোকে জিজ্ঞাসা করবে—পরে। ত্রিভুবনের ধাওড়ার সেই সবচিন অধিবাসী শ্যামধারী একটা পা নিয়ে একধারে বসেছিল। মাঝে মাঝে ভ্রু কুঁচকে তাকাচ্ছিল সেই ভদ্রলোকটির দিকে। যার সব কথা সে ঠিক ঠিক বুঝতে পারছিল না।
অন্ধকারে যতদূর চোখ চলে দেখা যাচ্ছিল কেবল কুলিপাড়ার খোলার চালের উঁচু নিচু ঢেউ। যেন ছাউনি ফেলে বসে রয়েছে একদল ফৌজ। ঐ ভদ্দরলোকটির বক্তৃতার ভাষায় ভুখা ফৌজ।
বুধোকে একপাশে ডেকে নিল মতিচাঁদ। লালমোহন উশখুশ করছে এবার।

অনেক রাত হয়ে গেল বিনি একলা রয়েছে। মতিচাঁদ বলেছিল—লালমোহনের তখন বুকভরা সাহস। মানুষ একটা সাহসের কাজ ঠিকমতো হাঁসিল করতে পারলে তার সাহসের আর কোনো সীমে পরিসীমে থাকে না। পথে যেতে যেতে লালমোহন বলেছিল মতিচাঁদকে—ঘাবড়িও না দাদা—সব ঠিক হয়ে যাবে। নিদেনের বিদেন মেরে তাড়িয়ে দোব পাঁইজিদের।
বুধোকে সব বলল মতিচাঁদ। বুধো চুপ করে সব শুনল। তারপর বলল—মতিচাঁদদা কাল সকালে আমি ইস্টিশনে গিয়ে তোমাদের সব ভাইয়ের সঙ্গে কথা কইব। আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না এক্ষুনি।
লালমোহন বলল, এর আবার বোঝাবুঝির কি আছে, তোমার এত তাগদ তুমি একটু মদত দিলেই হয়, শালার বাস চালানোর সাধ আমরা জন্মের মতো ঘুচিয়ে দোব।
বুধো বলল—লালমোহন, এর মধ্যে এট্টা ব্যাপার আছে। বুথ অ্যাণ্ড হেণ্ডারসনের সঙ্গে বড়ো লড়াই বাধবে চটকল মজুরের, শিগগিরই বাধবে। তারি জোগাড় চলছে চারিদিকে। বজবজে বাউড়িয়ায় সাত-আট বছর আগে বড়ো লড়াই হয়ে গিয়েছে। চটকলের মালিক কোম্পানি সে কথা ভুলে গিয়েছে। এবার তাকে মালুম করিয়ে দিতে হবে। কাজেই এখন আমার সামনে শুধু অ্যাসটন সায়েবের খাঁড়া নাক ছাড়া আর কিছু নেই, এর মধ্যে ফালতু ফ্যাঁকড়া জোটালে আসলি লড়াইয়ের আগেই দম ফুরিয়ে যাবে। তাই বলছিলুম কি একটু ভেবে দেখি।
মতিচাঁদ বলল—ঠিক আছে বুধনাথ ভাই তুমি ভেবে দেখো। কিন্তু তুমি চটকল বাজারের রাজা, তুমি যদি থমকে যাও তাহলে আর আমার কি বলার আছে বলো।
বুধো বলল—আরে না না, সে বাত নয়। আমাকে একটুখানি বুঝতে দাও ব্যাপারটা। কাল সকালে হবে এখন। বুধো ছটফট করতে লাগল ওদের বৈঠকে ফিরে যাওয়ার জন্যে।
বুধো তখন ত্রিভুবনের ধাওড়াতেই থাকতো। শ্যামধারী বুধোকে বলেছিল—তোর তো রোজগার নেই কিছু। ভাই ভাতিজা, মা বহিন কেউই তোর নেই। অথচ তুই লড়বি ঐ বেইমানদের খিলাফ তা তুই থাক আমার এখানে খাটিয়ে নিয়ে পড়ে। আমি ছাতু খেলে তুইও ছাতু খাবি, আমি রুটি খেলে তুইও রুটি খাবি। বুধো বলেছে—আরে ঠিক আছে, নবগঞ্জের

চটকল বাজারে আমার হাত পাতলে কিছুর অভাব হবে না।

ঠিকই তাই, সতু বোস তার নবগঞ্জের ভদ্দরলোক বন্ধু-বান্ধবদের—যদিও তারা সংখ্যায় খুবই কম ছিলেন তাদের কাছে বুধোর কথা বলে দিয়েছিলেন। তাঁরা গোপনে বুধোকে সাহায্য করতেন। বুধোকে সাহায্য করে তাঁরা তাঁদের নিষ্ক্রিয়তার পাপ স্খালন করতেন। কাজেই বুধো তখন সমস্ত মনোযোগ দিতে পেরেছে অ্যাসটন সায়েবের খাঁড়া নাকের দিকে। শুকুর আলি কাজ করে বুথ অ্যাণ্ড হেণ্ডারসনে পেষাই ঘরে। শিউপূজন আর কি করে মহাবীরপ্রসাদ জুট মিলে একটা কাজ জুটিয়ে নিয়েছে হাতিকলে।

বুধো বলল মতিচাঁদকে—আচ্ছা ভাই, কাল দেখা হবে তাহলে।

মতিচাঁদ আর কি বলে, বললে—আচ্ছা।

ক্লান্ত দেহে ক্লান্ত মনে মতিচাঁদ ফিরল। লালমোহন ওখান থেকে ওর বাসায় ফিরে গেল। মতিচাঁদ বলেছিল সে রাতে নবগঞ্জে পয়লা দিন ইলেকট্রিক আলো জ্বলেছিল। কত লোকের মনে কত ফুর্তি ছিল কিন্তু আমার সমস্ত মন উদাস লাগছিল কী বলব। যখন গাড়োয়ান পটির দিকে ফিরলাম তখন মনে হল একবার ঘুরে যাই ইস্টিশনটা। ওরা তো ওখানেই আছে বোধ হয়।

রাত তখন অনেক। রাস্তার লোকজন তখন বাড়ি চলে গেছে সব। বিন্দির গলির ঘরগুলো সব বোঝাই হয়ে গেছে। রাস্তার কুকুরগুলো শুধু এক আধটা লোকজন দেখলে ঘেউ ঘেউ করছিল। আর সেই বুড়ো পাগলাটা যে একটা লাঠি কি শিক নিয়ে কেরোসিন ল্যাম্পের পোস্টগুলো রাত ভোর বাজিয়ে বেড়াত—তার এখন আরো উল্লাস বেড়েছে। ইলেকট্রিক লাইটের ফাঁপা পোস্টগুলো বাজে ভালো। সে খুব ফুর্তিতে সেগুলো বাজিয়ে বাজিয়ে বেড়াচ্ছে।

মতিচাঁদ তাজ্জব হয়ে গিয়েছিল ইস্টিশনে এসে। একখানাও গাড়ি নেই। অথচ খানকতক গাড়ি সবসময় থাকে। ইস্টিশন থেকে সে গাড়োয়ান পটির দিকে ফিরল। কাউকেই ডাকার দরকার ছিল না। কেননা দরজাতেই দাঁড়িয়েছিল পটির মেয়েছেলেরা। এদিক ওদিক আরো দু চারজন মেয়েলোক চুপ করে বসেছিল। রাস্তার দিকে মুখ করে সবাই বসে। মতিচাঁদ ঢুকেই হীরুর বউকে জিজ্ঞেস করল—কী ব্যাপার ভাদ্দর বউ, এত রাত্রে বাইরে যে। হীরুর বউ শুকনো মুখে জবাব দিল—তোমার ভাই তো

এখনো ফেরেনি, কেউই ফেরেনি। মতিচাঁদ দেখল—হাঁ সে-ই বোকার মতো জিজ্ঞাসা করেছে। রাত্রের গাড়োয়ান পটি গাড়িতে বোঝাই থাকার কথা, আস্তাবলে ঘোড়ার নাক ঝাড়ার শব্দ থাকার কথা। কিন্তু এত রাত্রেও ফাঁকা পড়ে রয়েছে। কেন?

কেন, কী হয়েছে ভাদ্দর বউ, কিছু শুনেছ নাকি?

নাকছেদির মা বলেছিল হীরু নাকি পাঁইজিদের একজনকে পরোটার দোকানে একটা থান ইঁটের বাড়ি অ্যায়সা এক ঘা কষিয়েছে যে সে পাঁইজির মাথা ফেটে চৌচাকলা। তারপর পুলিস এসেছিল, হীরুকে ধরে নিয়ে গেছে। পিছু পিছু গাড়ি নিয়ে সবাই গেছে। খুব গোলমাল হয়েছিল তখন ইস্টিশনে।

মতিচাঁদ আবার ইস্টিশনের দিকে পা বাড়াল। ওখান থেকে নিধুব মোড় থেকে লালমোহনকে ডেকে নিয়ে থানায় যাবে। হীরুর বউ বলল—ওকে বোলো যেন রাত না করে। ছেলেটার জ্বর হয়েছে, বাবা বাবা করছে কেবল।

মতিচাঁদ বলল—আচ্ছা, তোরা ঘরে যা সব।

মতিচাঁদ বলল—আমি জানতাম বাবু এই হবে। এ চটকল বাজার এখানে খুনের বদলা খুন দিয়ে হয়। একবার যখন খুন বেরিয়েছে তখন এ বাড় তো বাড়বেই—কিন্তু এখানেও শেষ নয়। আবার বাড়বে—আবার।

শর্টকাট হয় বলে বিন্দির গলির ভেতর দিয়ে মতিচাঁদ চলল। অনেক রাত। বিন্দির গলিও ঘুমিয়ে পড়ে এত রাত তখন। পঞ্চি পানউলির বাড়ির কাছে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পঞ্চি কথা বলছিল। কার সঙ্গে? মতিচাঁদ ঠাওর করে দেখে ধীরুবাবু। মতিচাঁদকে দেখে হঠাৎ ওরা চুপ করে গেল। পঞ্চি আর লালমোহন-বিনির ব্যাপারের পর মতিচাঁদের সঙ্গে কথা বলে না।

কাদের আলি জানিয়েছিল পঞ্চি নাকি সেদিন গিয়েছিল অ্যাসটন সায়েবের কুঠিতে। পঞ্চি আর অ্যাসটন সায়েবে কি কথা হয়েছিল কাদের আলি তা জানে না।

লালমোহনকে আর মতিচাঁদ ডাকল না। ভাবল গিয়ে হয়তো খেয়ে দেয়ে শুয়েছে। থাক, এখন আর জ্বালাতন করে না। ভাবতে ভাবতে মতিচাঁদ চলছিল বড়ো রাস্তা ধরে, ম্যাকফারসনের মোটর হুশ করে চলে গেল মহাবীর প্রসাদ জুট মিলের দিকে। মনে পড়ল মতিচাঁদের সেদিন শনিবার।

ম্যাকফারসন সায়েব ফিরছিলেন অ্যাসটন সায়েবের দ্বিতীয় পক্ষের কাছ থেকে। অ্যাসটন সায়েবের দ্বিতীয় পক্ষ এবার বোধহয় ম্যাকফারসন সায়েবের প্রথম পক্ষ হবে। কিন্তু কতদিন হয়ে গেল—আর কবে?

থানার রাস্তাটায় আলো ছিল। আলোয় আলোয় হাঁটতে হাঁটতে মতিচাঁদ হাজির থানায়। নবগঞ্জের তিরিশখানা ঘোড়ার গাড়ি সেখানে তখন জমা হয়েছে। থানার বারান্দায় আলো জ্বলছে। বড়োবাবু, ছোটবাবু, থানার সেপাই জমাদারেরা সব ঘোরাফেরা করছে। হীরুকে হাজতে পুরে দেওয়া হয়েছে।

এরা সব বারান্দার নিচে মাঠে দাঁড়িয়ে তকরার করছিল জমাদারের সঙ্গে। গদাই বলছিল চেঁচিয়ে—এ কী রকম বিচার হল বড়োবাবু, হীরুকে কাল যখন মারল ওরা তখন আপনাদের কাছে এসেও কোনো ফল হল না, আজ হীরু বদলা নিয়েছে যখন তখন তাকে এনে হাজতে পুরলেন আপনারা।

শিবু বলল জমাদারকে—যদি মন করি তাহলে ধীরুবাবু বাস চালাতে পারবেন নবগঞ্জে? কোন্ ব্যাটার কলজেয় এত তাগদ আছে যে আমাদের ডিঙিয়ে যাবে?

বড়োবাবু কোমরে পিস্তল গুঁজে নেমে এলেন মাঠে—তোমরা সব এখন যে যার ঘরে চলে যাও, হীরুকে এখন ছাড়া যাবে না।

এরা বললে—সে বাত আমরা শুনব না। হয় আপনি হীরুকে আমাদের সঙ্গে ছেড়ে দিন নয় তো আমাদের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে নিন।

জমাদারকে ধমকালেন বড়োবাবু—ক্যা তামাশা দেখতা তোমলোগ, হটা দেও সবাকোইকো। বলেই সামনে দাঁড়িয়েছিল শিবু তার গালে এক চৌরাশি সিক্কার চড় হাঁকালেন বড়োবাবু।— ভাগো সব, জলদি ভাগো।

কিন্তু না। আপনি ইচ্ছে করলে মারলে মারতে পারেন, রাখলে রাখতে পারেন, পিঠ পেতে দিচ্ছি মারুন। তিরিশখানা গাড়ির দুটো মাত্র নেই সেখানে। বাকি গাড়িগুলো সব দাঁড়িয়ে রইল। গাড়োয়ানেরা বলল—না, আমরা এক কথা বলেছি। হীরুকে আমাদের সঙ্গে ছেড়ে দিতে হবে—নইলে আমরা নড়ব না।

গদাই জমাদারকে বলল—যখনি আপনারা গাড়ি চেয়েছেন, বিনি পয়সায় গাড়ি দিয়েছি আমরা, বলুন মিথ্যে কথা বলছি? মোড়ের মাথায় পুলিসের লোক বলে হাত পাতলেই দু-আনা চার আনা পয়সা পায়নি এমন পুলিস আপনার ফাঁড়িতে নেই। আর আপনারা আমাদের সঙ্গে

বেইমানি করছেন আজ।

জমাদার বলল—জরা শান্তসে বাত করো।

কি শান্তসে বাত করব? অনেকক্ষণ থেকে ঠাণ্ডা কথা বলছি দাদা, পায়ে ধরতে বাকি রাখিনি। কিন্তু আপনি চোখের সামনে হীরুকে রুলের বাড়ি মেরে ঠাণ্ডি ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। ঠাণ্ডি বাত ঠাণ্ডি ঘরে ঠেলে দিলে শোনা যায় না, দাদু।

মতিচাঁদ দেখল—এ তো বড়ো গোলমাল বাধিয়েছে এরা। এখন এখানে যদি এরা রাত ভোর এই নিয়ে হুজ্জুত করে তাহলে তো ধীরুবাবুর কাজ হাসিল হয়ে গেল সব।

মতিচাঁদ গদাই আর শিবুকে কাছে ডেকে বলল—এখানে যদি সবাই মিলে হাঙ্গামা করিস তাহলে তো মিটেই গেল সব ফইজত।

কেন?

ঢাকা মেলের প্যাসেঞ্জার আসতে আর দেরি নেই। তোরা সব গাড়ি নিয়ে এখানে জমে রইলি, ফাঁকা রাস্তা পেয়ে বাস চলে গেল ঢাকা মেলের সব প্যাসেঞ্জার তুলে নিয়ে—কোথায় আছিস সব? আজ ভোর থেকে তো বাস চলবে।

গদাই বলল—আরে এটা তো বিলকুল ভুলে গিয়েছিলুম সব। তাহলে মতলব বাতলাও দাদা।

মতিচাঁদ বলল—সব ইস্টিশনে চল্ গাড়ি নিয়ে, হীরুর গাড়ি গদাইয়ের ভাইকে চালাতে বল্।

আটাশখানা গাড়ি মোড় ফিরল। আটাশখানা গাড়ি সার বেঁধে নবগঞ্জের ইস্টিশনের রাতের রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে কুকুর ডাকিয়ে ইস্টিশনের রাস্তায় এসে হাজির হল। লালমোহনের গাড়িও হাজির হয়েছে। লালমোহন হকচকিয়ে গেল এতগুলো গাড়ি একসঙ্গে ফাঁড়ির দিক থেকে আসতে দেখে। মতিচাঁদ ওকে সব বলল। লালমোহন রাগ করল শুনে—বলল, তা আমায় ডাকোনি কেন দাদা। গদাই বলল—দাদা ভাবল থাক ভায়া দু-দিন ফুর্তি করে নিক, দানাপানি তো বন্ধ হবে দু-দিন বাদে, তাই ডাকেনি।

উত্তরদিকে দুখানা বাস দাঁড়িয়ে আছে। প্যাসেঞ্জার নিয়ে চলে যাবে মহকুমা শহর।

মতিচাঁদ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবাইকে ডেকে নিয়ে মতলব পাকা করতে লাগল—কি করতে হবে।

শিবু মাঝে একটা ধমক খেল। বলছিল—দোব মেরে শালাদের।

লালমোহন বলল এগিয়ে গিয়ে—না কিছু দরকার হবে না, বাস এমনিই বন্ধ হয়ে যাবে আজ রাত্রে। শোন্ সব আমার মতলব।

লালমোহনের মতলব ছিল অতি সহজ।

ঢাকা মেল ইস্টিশনে পৌঁছলেই দুখানা ঘোড়ার গাড়ি দাসপুকুরের দিকে এগিয়ে যাবে। বাকি গাড়িগুলো রাস্তা জুড়ে একটু দূরে দূরে আস্তে আস্তে চলবে। মতিচাঁদের ভাষা ছিল—খুব হুঁশিয়ার হয়ে আস্তে আস্তে গাড়ি চালাবি, ঘোড়া যেন বেশ মাটি মাড়িয়ে চলে। বাস সব সময় পিছনে থাকবে—কুমোরতলির ওদিকে যেন গিয়ে পড়তে না পারে সহজে। কেননা ওদিকে গেলেই চওড়া রাস্তা পেয়ে যাবে বাস। পাশ কাটিয়ে চলে যাবে। আমাদের কাজ হবে বাসকে ইস্টিশনের সামনে থেকে সহজে বেরুতে না দেওয়া আর ট্রেনের টাইমে ঠিক সময় ইস্টিশনের কাছে পৌঁছতে না দেওয়া।

গদাই, শিবু, লালমোহন, মহবুব সবাই বলল—ঠিক কথা, এর জন্য যে ক্ষেতি আমাদের হয় হোক। বাস আমরা চলতে দোব না নবগঞ্জের রাস্তায়।

ঘোড়ার গাড়িগুলো রাস্তা জুড়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গেল। এমন ভাবে দাঁড়িয়ে গেল যে বাস যাতে ইস্টিশনের ধারে কাছে না ঘেঁষতে পারে। এমন ভাবে দাঁড়িয়ে গেল যাতে ঘোড়ার গাড়ির সঙ্গে একটা প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে না এসে তাকে রাস্তা থেকে হটানো না যায়। দুখানা চারখানা গাড়ি চলে গেল দক্ষিণ দিকে, নবগঞ্জমুখো বাসকে রাস্তায় আটকে দেবে যাতে বাসের প্যাসেঞ্জার ঢাকা মেল না ধরতে পারে।

ইস্টিশনের পাশের দুখানা বাস আলো জ্বালিয়ে গর্জে উঠল। ঘন ঘন ভেঁপু বাজল বাসের। একটা বাস চলবার জন্যে তৈরি হল। আর ইস্টিশন কাঁপিয়ে হেডলাইটের আলোয় ইস্টিশন ভাসিয়ে বিপুল শব্দ করে এসে পড়ল হাঁপাতে হাঁপাতে ঢাকা মেল।

কোচবাক্স থেকেই গাড়োয়ানেরা ঘোষণা করল—কেউ প্যাসেঞ্জার নিবি না আজ। বাসকে রাস্তা দিবি না। ওদিকে বাসওয়ালারা চেঁচাচ্ছে—কালিবাড়ি, বড়তলা, নবাবপুর। পিটছে বাসের টিনের শরীর—প্যাসেঞ্জারের দৃষ্টি আকর্ষণ

করার জন্যে, ভেঁপু বাজাচ্ছে প্যাঁক প্যাঁক করে। হেডলাইট দুটো রাগী জানোয়ারের চোখের মতো জ্বলছে।

সেদিন ঢাকা মেলের প্যাসেঞ্জার সব নেমে বাসের প্যাঁক প্যাঁক, টিন চাপড়ানো শুনে ঘোড়ার গাড়িগুলোকে পাশ কাটিয়ে বাসে গিয়ে চড়ে বসল। বাস বোঝাই হয়ে যাওয়ার পর কিংবা যাদের মালপত্তর, মোট গাঁটরি বেশি ছিল তারা ঘোড়ার গাড়ির দিকে এল। একবাক্যে সবাই হাত নেড়ে দিল—না, আজ আমরা ভাড়া নোব না। চার পা পুঁতে ঘোড়াগুলো দাঁড়িয়ে রইল। চাবুকগুলো উঁচিয়ে বসে রইল গাড়োয়ানেরা, দরকার হলে যেখানে হোক হাঁকড়ে দেবে চাবুক—কিন্তু ঘোড়ার পিঠে নয়। লাই বলল মতিচাঁদকে—ধীরুবাবু এসে গেছেন। চায়ের দোকানে বসে রয়েছেন।

মতিচাঁদ বলল শুধু—থাক, তোরা কোনো ব্যাপারে মাথা গরম করবি না।

ওদিকে তখন বাস অশ্রাব্য ভাষায় মুখ খারাপ করছিল। বডি চাপড়াচ্ছিল বাস যেন বুক চাপড়াচ্ছে, হর্ন দিচ্ছিল যেন গবগর করছে কেউ। মহবুবের চাবুক কেড়ে নিয়ে এক ঘা কষিয়ে দিয়েছিল মহবুবের ঘোড়াকে এক ছোকরা। শিবুর গাড়ি ছিল পাশে কাজেই মহবুবের ঘোড়া ছুট দিতে পারেনি। শিবু সেই সহিস ছোকরাকে শাসিয়ে দিয়েছিল চাবুক দেখিয়ে—চাবকে কাঠবিড়ালি বানিয়ে দেব।

ঢাকা মেল নবগঞ্জ ছেড়ে চলে গেল। তার অনেকক্ষণ পরে প্যাসেঞ্জার বোঝাই বাস এসে পৌছল মহকুমার দিক থেকে। কেউ আসছে কালি-বাড়ি থেকে, কেউ আসছে নবাবপুর থেকে। কিন্তু রাস্তায় সামনে ছিল তিনখানা ঘোড়ার গাড়ি—তাদের একজনের ঘোড়ার নাল খুলে গিয়েছিল কাজেই রাস্তা জাম হয়েছিল। পাশ কাটানোর উপায় ছিল না। কাজেই বাস ট্রেন ফেল করল।

প্রথম দিনের প্রথম বাস ঠিক টাইমে ট্রেন ধরতে পারল না। প্যাসেঞ্জাররা নেমে গাড়োয়ানদের মা-বাপ উদ্ধার করছিল, বাস কোম্পানিকেও ছেড়ে কথা কইল না।

চায়ের দোকানের বয় এসে মতিচাঁদকে বলল—ধীরুবাবু ডাকছেন তোমায়, দাদা। মতিচাঁদ গাড়ি রেখে ধীরুবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেল।

ধীরুবাবু বললেন—মতিচাঁদ, বুদ্ধিটা মন্দ হয়নি লালমোহনের। কিন্তু এমনি

করে আমি সাত মাস চালাতে পারবো, কিন্তু তোমরা ক-দিন পারবে?

মতিচাঁদ বলল—অত হিসেব করে কিছু হয় না, বড়োবাবু। আপনার বাস নবগঞ্জে ঠিক টাইমে ট্রেন ধরাতে কোনোদিন পারবে না এ বলে দিচ্ছি আপনাকে। আর সাত মাস আট মাসের কথা জানি না তবে সহজে কিছু হবে না।

ধীরুবাবু বললেন—সহজে কিছু হয় সংসারে মতিচাঁদ? বকুলবালাকেই কি আমি সহজে তাড়াতে পেরেছিলাম?

মতিচাঁদ জিজ্ঞাসা করেছিল—কেন ডেকেছিলেন বাবু?

ধীরুবাবু বলেছিলেন—হীরুকে ছাড়িয়ে দিচ্ছি, তোমরা এ রাস্তা ছাড়ো।

মতিচাঁদ জবাব দিয়েছিল এ রাস্তা আমাদের রুটি রোজগারের রাস্তা—এ রাস্তা ছাড়া যায় না।

ধীরুবাবু মতিচাঁদকে সাবধান করে দিয়েছিলেন—তোমরা পরে যেন আমায় দুষো না।

সাত দিন এইরকম চলল।

সাত দিন নবগঞ্জের রাস্তায় বাসে আর ঘোড়ার গাড়িতে গুঁতোগুঁতি চলল। সাত দিন ধরতে গেলে ঘোড়ার গাড়ির ভাড়া জুটল না কিছু। কোনো বাস ঠিক সময় পৌছতে পারল না নবগঞ্জে। বাসের একঘণ্টার বেশি সময় লাগিয়ে দিত ঘোড়ার গাড়িওয়ালারা নবগঞ্জের চৌহদ্দি পেরিয়ে যেতে। হঠাৎ এক একখানা গাড়ি গলি দিয়ে বেরিয়ে আসে রাস্তায়। বাসের রাস্তা ব্লক করার জন্যে। অনেক কষ্টে গালিগালাজ, সময় সময় মারপিট করেও, যদি একখানা ঘোড়ার গাড়ি কাটানো গেল—তাহলেও নিশ্চিন্ত নয়, সামনের তেমাথায় বাঁ হাতি গলি ধরে আর একখানা গাড়ি ঠিক সময়ে বেরিয়ে আসবে। নবগঞ্জের সরু রাস্তায় মতিচাঁদের রণনীতি বাস চালানোকে দুর্ঘট করে তুলল। মহকুমা মুখো বড়ো রাস্তা। কিন্তু রাস্তার দু-পাশে গলাভর্তি নর্দমা রাস্তাকে সেদিন অবধি ভয়াবহ করে রেখেছিল। এ রাস্তায় বাস চালানো বড়ো ঝঞ্ঝাট।

কিন্তু হাহাকার পড়ে গেল গাড়োয়ানপটিতে।

মতিচাঁদের বিবরণ ছিল—বাবু, আমাদের ধাতে পয়সা রেখে দেওয়ার কায়দা জানা নেই। কারুর যদি দিন পাঁচ টাকা রোজগার হল, পাঁচ টাকাই তার সেদিন খরচা। যদি রোজগার হল বারো আনা, তো বারো আনার খোরাকি

নিয়েই সোঁ গুষ্টি উপোস দেবে। গাড়োয়ানী মেজাজ বলে একটা কথাই চালু আছে। আমাদের বেশি রোজগারের দিন ঘোড়াও ঘাড়ের চুল ছাঁটতো।

সাত সাতদিন উপায় নেই। এমনিতেই তখন গাড়ি বেড়ে গেছে সংখ্যায়, আগের মতো দাপটে পয়সা কামানো উঠে গেছে। তারপর সাত সাতদিন আট আনা এক টাকার বেশি আর কিছুই জোটেনি কারুর।

গাড়োয়ানপটিতে ঢোকার উপায় ছিল না মতিচাঁদের। ঢুকতে সবচেয়ে আগে হীরুর জ্বরগ্রস্ত ছেলেটার কান্না কানে আসতো। ছেলেটার বাবার জন্যে মন কেমন করত। হীরুর বউ চুপ করে দরজার চৌকাঠে বসে থাকত। মতিচাঁদকে দেখলেই সবাই ঘিরে ধরতো—কী হবে দাদা, কবে হুজ্জুত মিটবে। সকলেরই কিছু না কিছু ধারকর্জ আছে। মাধো সাহু, কেরামত কাবলিওয়ালা এরা ঠিক ঠিক আসবে। গাড়ি চলছে না বলে তাদের রোজগার বন্ধ থাকবে নাকি?

সবচেয়ে খারাপ লেগেছিল মতিচাঁদের সেদিন যেদিন সে দুপুরবেলায় লাল-মোহনকে ডাকতে গিয়েছিল। গিয়ে দেখে লালমোহন আর বিনি দুজনে চুপ মেরে বসে আছে। মতিচাঁদকে দেখে বিনি ভ্যাঁক করে কেঁদে ফেললে। কাল থেকে নাকি ঘরে কিছু নেই। লালমোহন বলেছিল, ঘোড়ার ঘাস বেচে শেষটা মুড়ি কিনে এনে রাত কাটিয়েছে।

মতিচাঁদ জিজ্ঞাসা করেছিল, তা কেঁদে তুই কি কূল কিনারা করবি? বিনি বলেছিল—না তা নয়, উপোসে ও ডরায় না। কিন্তু ওর চোখে এক ফোঁটা জল দেখে লালমোহন নাকি বলেছে—অত যদি তোর খিদেয় কষ্ট তো তুই ফিরে যা বিন্দির গলিতে—পঞ্চির কাছে। এইতেই বিনির চোখে গঙ্গা-যমুনা বইছে।

বিনি কাঁদতে কাঁদতে বলেছে—আমি কি এই কথা বলেছি, দাদা। দুখ্যু কষ্টের কোনো কথা আমি ওর কাছে বলিনি। ছোঁড়াগুলো রাস্তার কলে জল অবধি ভরতে দেয় না, পেছনে লাগে, পঞ্চিমাসি পুলিসে অবধি খবর দিয়ে দিয়েছে—আমি বে-পাড়ায় উঠে এসেছি। ভাবনায় ভাবনায় আমার মাথা খারাপ আর ও এ-কথা বলে!

লালমোহন বলেছিল—আচ্ছা চুপ কর কাঁদিসনে তুই, আর বলব না।

এ তো গেল এক ঝঞ্ঝাট।

শহরের ভদ্রলোকেরা নাকি গাড়োয়ানদের ব্যাভারে ক্রমে ক্রমে চটে যাচ্ছেন। বাস পাবলিকের সুবিধের জন্যে খোলা হয়েছে—গাড়োয়ানেরা যদি এমন ধারা বদমায়েশি করে তো ওদের লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত করা হবে।

রবিবার দিন মিউনিসিপ্যালিটিতে সবাইকে ডেকে পাঠালেন অ্যাসটন সায়েব। অ্যাসটন সায়েব চেয়ারম্যান, ধীরুবাবু শহরের গণ্যমান্য সব ভদ্দরলোকদের দিয়ে তাঁর কাছে দরবার করিয়েছেন একটা ফয়সালার জন্যে।

রবিবার দিন সকালবেলা বুধোও এসেছিল। বুধো খুব ভালো খবর দেয়নি, বলেছে—চটকলের লোক তোমার দিকে যাবে না মতিচাঁদদা। তোমার ঘোড়ার গাড়ি থেকে বাস সস্তা, দাদা। মানুষের ট্যাঁকের কাছে কোনো তক্ চলে না।

মতিচাঁদ জবাব দিয়েছিল—তা বলে তিরিশটা সংসার ভেসে যাবে? ধীরুবাবুর জয়জয়কার হবে?

বুধো বলেছিল—তা হবে না। ধীরুবাবুর ওষুধ হবে—তবে সে তোমার হাতে নয়। ধীরুবাবুর টেক্কা তুরুপ আমার হাতে আছে।

গদাই হেসে বলেছিল—ও তুই রাখ্, বাস চালানোর বারোটা আমরা বাজিয়ে দিয়েছি।

মিউনিসিপ্যালিটিতে অ্যাসটন সায়েব, ধীরুবাবু, ভূষণবাবু, কার্টিকেষ্ট মিত্তির, থানার বড়োবাবু সবাই জমা হয়েছিলেন। মতিচাঁদ তার দলবল নিয়ে যখন পৌছুল তখন দেখা গেল সভা বেশ জাঁকিয়ে উঠেছে। বেশ গরম গরম দু-চার কথা সবাই বলছেন।

মতিচাঁদ বলেছিল—আমরা সবাই তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলাম বাবু, দেখি কিনা সব শিয়ালেরই এক রা, যত দোষ নন্দঘোষ। গাড়োয়ানদের তাঁ্যাদড়ামোর জন্যেই শহরের লোকজনদের জন্যে কোনো ভালো কাজ করার উপায় নেই। ধীরুবাবু যে বাস চালিয়ে লোকজনদের কত সুবিধে করে দিয়েছেন তা বলবার নয়। গাড়োয়ানদের সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে—থানার বড়োবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভূষণবাবু বললেন—নইলে সব ব্যাটাকে দমদমার লাল দালান দেখিয়ে দেওয়া হবে।

মতিচাঁদ বলেছিল—মনে বড়ো দাগা পেয়েছিলাম বাবু যখন দেখলাম—সিদ্ধিনাথ ঘোষাল মশাই তড়পাচ্ছেন সবচেয়ে বেশি। কতদিন রাতে বেলায় সিদ্ধিনাথবাবুকে থানার মধ্যে থেকে কুড়িয়ে গাড়ি করে বাড়ি দিে

এসেছি বাবু, ওনার পরিবার আমাদের সামনে ওনাকে গোবরজল দিয়ে চান করিয়ে তবে ঘরে ঢুকতে দিয়েছেন—ভাড়া চাইতে গেলে বলেছেন বাবুর জ্ঞান হলে তাঁর কাছ থেকে নিও। একদিনেরও ভাড়া পাইনি, বাবুর নেশা ভাঙলে আর নেশার কথা কিছু মনে থাকতো না। সেই সিদ্ধিনাথবাবুর তড়পানি দেখে সেদিন বড়ো দাগা পেয়েছিলাম বাবু। ভূষণ-বাবুর কথা ছেড়েই দিলাম না হয়। ত্রিলোচনবাবু বললেন—সকালবেলা বাস চলুক বিকেল বেলায় ঘোড়ার গাড়ি। সবাই হেসে বসিয়ে দিল ওনাকে।

মতিচাঁদের দিকে তাকিয়ে ভূষণবাবু বলেছিলেন—তোমাদের মধ্যে একজন আবার বাজারে একটা মেয়েমানুষকে পরিবার সাজিয়ে নিধুব মোড়ে গিয়ে আড্ডা গেড়েছে। পুলিসকে আমি এ সম্বন্ধে খোঁজ নিতে বলেছি।

কার্টিকেষ্ট মিত্তির অ্যাসটনকে বললেন—সে ব্যাটার নাম লালমোহন, নামের খুব বাহার আছে।

অ্যাসটন সায়েব বললেন—ওঃ লালমোহন, ও শালা পাক্কা বদমাশ আছে। হামি চিনে ওকে।

ধীরুবাবু বললেন—বদমায়েশের যাশু ব্যাটা। ধীরুবাবু চেনেন তাকে। বারো বছর আগে 'বিয়ে না হয় নাই হয়েছে' ছড়া বেঁধেছিল লালমোহন—ধীরুবাবু ভোলেননি সে কথা।

সায়েব সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—ছোড় দেও আলটু ফালতু বাত লেকিন শুনো—ক্যা তোমারা নাম? মোটচাঁও?

হাঁ সাব।

আজকা অন্দর সব গোলমালকা ফয়সালা মাঙতা হাম, নেইতো ফাটকমে দে দুঙ্গা। বলে থানার বড়োবাবুর দিকে তাকালেন। বড়োবাবু ফাটকের মতো কপাল কুঁচকে গরাদ করে বসে রইলেন।

এমন সময় বুধো এসে হলঘরে ঢুকলো।

ভূষণবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—কী বুধনাথ তুমিও কি এর মধ্যে আছ নাকি?

বুধো জিজ্ঞাসা করল—তার আগে আমার একটা কথার জবাব দিতে পারেন ভূষণবাবু? মিটিং সুদ্ধু লোক চুলবুল করে উঠল। গুন গুন করে উঠল সবাই কী বলছে বুধো?

ভূষণবাবু রায়বাহাদুর, নবগঞ্জের রাজভক্তির ট্রাষ্টি ছিলেন সেকালে।

রাজভক্তির প্রতিযোগিতায় অ্যাসটন সায়েবকেও মাঝে মাঝে নাজেহাল করে দিতেন তিনি।

ভূষণবাবু জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কী বলে ডাকলে আমায়?

পরিষ্কার গলায় বুধো জবাব দিল—ভূষণবাবু বলে।

রেগে কাঁপতে কাঁপতে রায়বাহাদুর বললেন—তুমি আমায় বাবু বলবে শুধু, উল্লুক, পাজি।

বুধো বলল—আমি ভূষণবাবু বলব আপনাকে।

ধীরুবাবু বললেন—মরুকগে যাক—কী বলতে চাও তুমি?

বুধো বলল—আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি। এটা কী হচ্ছে এখানে?

এটা ফয়সালার মিটিং।

ফয়সালার মিটিং না ফাঁদের মিটিং?

মানে কী তোমার কথার?

মানে, আপনি যখন এখানে এদের ডেকে নিয়ে এসেছেন তখন ওদিকে নিত্যহরিবাবু খানছয়েক রিকশা ইস্টিশনে চালাতে এনেছেন। আপনি চেষ্টা করছেন যাতে এমনি করে এদের শিরদাঁড়া ভেঙে দিতে পারেন। বাস চালালে লোকের সুবিধে আমি বুঝি কিন্তু আপনি সোজা রাস্তায় চলছেন না।

কাটিকেষ্ট মিত্তির কী যেন বলতে গেলেন।

তার আগে আর একবার ঝিলিক দিয়ে উঠেছে বুধো—মিত্তির মশাইয়ের মাথা থেকেই এসব প্যাঁচ ধার নিচ্ছেন আপনি।

মিত্তির বলল—কী সব প্যাঁচ?

রিকশাওয়ালাদের সঙ্গে ঘোড়ার গাড়িওয়ালাদের লড়িয়ে দিয়ে বাসের রাস্তা সিধে করে নেওয়ার প্যাঁচ।

মতিচাঁদ বলেছিল—কিন্তু তখন বুধোর বক্তিমে গাড়িওয়ালারা শোনার জন্যে কেউ বসে ছিল না। রিকশা চালু হবে—একথা বুধোর মুখ থেকে খসা মাত্রই দুড়দাড় করে ছুটেছে সব ইস্টিশনমুখো।

বুধো মতিচাঁদকে বলেছিল—এখানে আর কিছু হবে না, মতিচাঁদদা তুমি ফেরত যাও।

ইস্টিশনের রাস্তায় ঘণ্টা বাজাচ্ছিল দুখানা রিকশা। ধীরুবাবুর কর্মচারীদের

একজন তারি তদারক করছিল। শিবু চুপ করে দাঁড়িয়ে গেল। গদাই কিছু বললো না—শুধু চাবুকটা পাকাতে লাগল হাতের মুঠোয়। মহবুব ক্যাবলার মতো এদিকে একবার ওদিকে একবার তাকিয়ে, চাবুকটা বগলে নিয়ে খৈনি ডলতে লাগল। বাস ক-খানা উল্লাসে হর্ন বাজিয়ে দিল একবার।

ঘোড়ার গাড়িগুলোর কাছে পাল্লার হাতল ধরে পা-দানিতে পা-রেখে দাঁড়িয়ে ছিল গদাইরা—ওরা আর গালাগালও দিচ্ছিল না তখন।

একা লালমোহন শুধু বসেছিল তার গাড়ির মাথায়। চাবুকটা আকাশ-মুখো বসানো রয়েছে। নড়চড়া ছিল না তার। কাঠ পুতুলের মতন স্থির হয়ে বসেছিল সে। মতিচাঁদ বলেছিল—সেই সময় লালমোহনকে আর গাড়োয়ান লালমোহন বলে মনে হচ্ছিল না। লালমোহন যেন চুপ করে বসে মজা দেখছিল—সেই বিন্দির গলির ছড়াদার লালমোহন।

সেদিন সারাদিন আর বাসের সঙ্গে গুঁতোগুঁতি করল না ঘোড়ার গাড়িওয়ালারা। সারাদিন বিনা বাধায় বাসওয়ালারা বাস চালাল। প্যাসেঞ্জার নিল, নামাল। রাস্তায় পথ আটকে দাঁড়ালো না কেউ। ধীরুবাবু কি ভেবেছিলেন কে জানে—বাসওয়ালারা ভেবেছিল যাক ঝামেলা চুকল।

সারাদিন ধীরুবাবুর বিশ্রাম ছিল না। একবার কাটিকেষ্ট, একবার অ্যাসটন সায়েব, একবার পুলিস—জুতোর তলা ক্ষয়ে গেল ধীরুবাবুর।

সন্ধ্যে থেকেই আকাশে মেঘ জমেছিল সেদিন। নতুন তৈরি বিজলী বাতি টিপটিপ বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে আলো ছড়াচ্ছিল রাস্তায়। রাস্তায় লোকজন কম ছিল। মনে হচ্ছিল জোরে বৃষ্টি নামবে। কিন্তু টিপটিপ করে দু-এক ফোঁটা জল যদি বা পড়ছিল এলোমেলো হাওয়ায় ঝড়ের ইঙ্গিত ছিল। বৃষ্টির ছাঁট তীরের মতো ছুটছিল।

সেদিন নবগঞ্জের সমস্ত গাড়োয়ানের দল গাড়ি বোঝাই করছিল সোডার বোতলে, ছোরায় আর লোহার ডাণ্ডায়। গাড়ির সঙ্গে ঘোড়াগুলোর বাঁধন আলগা করে রাখা হয়েছিল। ইচ্ছে করলেই যেন খুলে দেওয়া যায়।

প্রচুর মদ খেয়ে টলতে টলতে লালমোহন এসে দাঁড়ালো। হাতের শাল পাতার ঠোঙায় কাঁকড়া আর ইলিশের তেলকাঁটা ভাজা। বলল—বিনিটা

একটা—একটা—একটা—মেনিমুখো মেয়েমানুষ, বলে কিনা তোমার আজ গিয়ে কাজ নেই। হেঁচকি তুলতে তুলতে ওর গাড়ির দিকে চলে গেল। দমকা হাওয়া বিজলী বাতির তারে লেগে হু হু করে আওয়াজ তুলছিল—কখনো কখনো জোর বাতাস শিস কাটছিল।

ঢাকা মেল আসার একঘণ্টা আগে ওরা আর অন্যদিনের মতো রাস্তা আটকাল না। সারাদিনের অভ্যাসমতো দুখানা বাস স্টেশনের সামনে এসে দাঁড়াল। ভেঁপু বাজিয়ে চিৎকার করে প্যাসেঞ্জার তুলবে গাড়িতে। প্রথম ভেঁপুর আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই লালমোহন তার গাড়ি থেকে পয়লা সোডার বোতল ছুঁড়ল। তারপর বোতল ভাঙার শব্দ, কাঁচভাঙার শব্দ মিলিয়ে যেতে না যেতেই লালমোহন বুঝল লড়াই একতরফা হবে না। মহকুমার দিক থেকে একখানা বাস এসে তক্ষুনি থামল লালমোহনদের পিছন দিকে। কাছেই কোথায় ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করছিল তারা।

ধীরুবাবু সকাল থেকে চুপ করে বসেছিলেন না। কার্টিকেষ্টর বুদ্ধি সব দিকেই খোলে। গাড়োয়ানদের মতিগতি সে ধীরুবাবুকে সব বুঝিয়ে দিয়েছিল। নবগঞ্জের গুণ্ডার দল এখানকার ঘোড়ার গাড়িওয়ালাদের দিকে ঢলে পড়তে পারে ভেবেই তিনি নবাবপুরের গুণ্ডাদের ভাড়া করে আনিয়েছেন। বৃষ্টি ভেজা নিশুতি রাতে বাস বোঝাই গুণ্ডার দল ঝাঁপিয়ে পড়ল লালমোহনদের ওপর।

দুখানা ঘোড়ার গাড়ির গদি চিরে তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিল ওরা। ঢিল মেরে বিজলী বাতি নিভিয়ে দিল। এক ডাণ্ডায় গদাই মাটি নিল। মুখে লাথি মেরে গলাডুব নর্দমার দিকে ঠেলে দিল আর একজন। ছাড়া পাওয়া ঘোড়াগুলো ভয় পেয়ে রাস্তা জুড়ে দাপাদাপি শুরু করল।

ওদিকে লালমোহনের দু-নম্বর বোতল দাড়িতে গিঁট দেওয়া জাঙিয়া পরা একজনকে কাবার করল। শিবু নারাণ গলাভর্তি নর্দমার মধ্যে নেমে পড়ে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। একটা বাসের সামনে হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে উঠে বনেট খুলে বাসখানায় আগুন ধরিয়ে দিল তারা।

কয়েক লহমার মধ্যে নরককুণ্ড হয়ে গেল সারা রাস্তাটা। কে যে চোট খাচ্ছে কে যে দিচ্ছে কিছু আর বোঝা যাচ্ছিল না। ইস্টিশনের কুলিরা ভয়ে পালিয়ে গেল। রাস্তার এপাশের একখানা কাপড়ের দোকান লুঠ হয়ে গেল।

অনেক দূরের মোড়ে দাঁড়িয়ে নবগঞ্জের লোকে মজা দেখল খানিক—তারপরের ঘটনার গুরুত্ব বুঝে থানায় খবর দিতে গেল কেউ। ঢাকা মেলের

প্যাসেঞ্জাররা যখন নামল—তখন বাস একখানা জ্বলছে—ঘোড়ার গাড়ি দুটো ছাই হয়ে গেছে। পুলিস এসেছে।

নবগঞ্জের স্টেশনের তেমাথায় রাস্তায় একটা লাশ উপুড় হয়ে পড়েছিল। রক্তে মাটি ভিজিয়ে কাদায় মুখ গুঁজড়ে পড়েছিল সে। পুলিস এসে লাশটাকে চিত করে ফেলল। হাতকড়া বাঁধা নারাণ আর মহবুব, মাথায় পট্টিবাঁধা গদাই মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল। বড়োবাবু বলল—লোকটা কে হে? চেনো তোমরা?
চেনে না আবার? খুব চেনে।
বিন্দির গলি, গাড়োয়ান পটি এতক্ষণ ঠকঠক করে কাঁপছিল এইবার ভয়ে সিঁটিয়ে গেল শুনে। লোকটা—লালমোহন।

মতিচাঁদ বলেছিল—পুলিস কাউকেই ছাড়ল না, সবাইকেই হাতকড়া দিল। বাসের সহিস ড্রাইভারকেও বাদ দিল না। আর বাপ, তখন আমাদের অবস্থা এমন যে যদি পুলিসে না ধরে তো ইচ্ছে করে সেধে ধরা দিতে হত। কেননা যে খালাস থাকবে তাকেই যেতে হবে বিনিকে খবর দিতে যে লালমোহন নেই। সে কেউ পারবে না, সে বড়ো কঠিন কাজ। তার চেয়ে ধরা দেওয়া ভালো।
মতিচাঁদ তখন কেবলই ছটফট করছিল আর দারোগা সেপাইকে বলছিল—বাবু, আমাদের এখান থেকে থানায় নিয়ে চলুন। মতিচাঁদের ভীষণ ভয় করছিল এই বুঝি বিনি এসে পড়ে, এই বুঝি আসে।

কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে
ডাইনে বাঁয়ে দুই হাতে।

দু-মাস বাদে মামলা মোকদ্দমা সব মিটল।

গদাই আর শিবুর লম্বা মেয়াদের জেল হল। বাসের সহিস ড্রাইভার দু-এক জনেরও সাজা হল।

মতিচাঁদ খালাস পেল।

জেল-হাজতের অত্যাচারে-অনিয়মে মতিচাঁদ তখন রোগগ্রস্ত। ছ-মাসের মামলা মোকদ্দমায় গাড়োয়ান পটি ফাঁকা হয়ে যায়নি, তবে লোকজন সব বদলে গেছে অনেক। মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েছিল প্রায় সবাই—গাড়ি ঘোড়া বেচে ধীরুবাবুর সঙ্গে লড়াইয়ের খেসারত মিটিয়ে দিয়ে শেষ হয়ে গেছে অনেকে।

নবগঞ্জে ফিরে মতিচাঁদ অবাক হয়ে গিয়েছিল। নবগঞ্জ পালটে যাচ্ছে কত তাড়াতাড়ি। আরো কটা রাস্তায় ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বলছে। আরো চারটে রাস্তা পাকা হয়েছে। কত মানুষের ভিড়ে নবগঞ্জ বোঝাই। মহকুমার সঙ্গে বাস সার্ভিস চালু হয়ে গেছে ভালো করেই। ওদিকে দাসপুকুর থেকেই বাস চলছে। বাসের টিন আছড়ে চটকল বাজারের লোকজন কুড়িয়ে হাঁক ডাক করে বাস যাতায়াত করে। ঘোড়ার গাড়িগুলো হাত গুটিয়ে দেখে। সংখ্যায় তখন তারা অনেক কমে গেছে।

সে রাতের সেই রিকশাওয়ালার ক-জনের আর কোনো পাত্তা নেই। ঘোড়ার গাড়িওয়ালাদের সঙ্গে মারামারি বাধানোর মতলবেই বুঝি তাদের আনানো হয়েছিল। মতলব হাঁসিল হলেই তাদের বিদেয় করে দেওয়া হয়েছে।

মতিচাঁদ ফিরেছিল যেদিন সেদিন নবগঞ্জে তিনটে মিটিং হচ্ছিল।

একটা মিটিং হচ্ছিল ধীরুবাবুর জন্যে। তিনি রায়বাহাদুর হয়েছেন। নবগঞ্জের রাজভক্ত প্রজাবৃন্দ তাঁকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছিলেন মিউনিসিপ্যালিটির দালানে। নবগঞ্জের যত সব তা-বড় তা-বড় ব্যবসায়ী, বাণিজ্য-বীরের দল জড়ো হয়েছিল মিটিঙে। ধীরুবাবুর চেয়ারের পিছন দিকে দেওয়ালে

লটকানো ছিল সায়েব-সুবোদের সব ছবি। বুথ অ্যাণ্ড হেণ্ডারসনের প্রাক্তন যত ম্যানেজার, আর সেই সুবাদে মিউনিসিপ্যালিটির ভূতপূর্ব যত চেয়ারম্যানের ছবি। কোনোটা পূর্ণাঙ্গ, কোনোটা আবক্ষ। কেউ ছড়ি হাতে, কেউ বুকে গোলাপ ফুল গুঁজে, ছবির চোখে তাকিয়েছিল সেই সমাবেশের দিকে। অ্যাসটন সায়েবের সেই নাক-ভাঙা স্ট্যাচু আর সেখানে তখন নেই। তার জায়গায় ঝুলছে অ্যাসটন সায়েবের খাঁড়া-নাক দাম্ভিক ছবি। ফুলের তোড়া নিয়ে ঘর ভরিয়ে, ফুলের মালা দুলিয়ে, খানাপিনার সমারোহের মাঝখানে ইংরেজি বক্তৃতার ফুলঝুরি ছড়ালেন ভূষণবাবুর দলবল।

কিন্তু অ্যাসটন সায়েব এ মিটিঙে ছিলেন না। কাছাকাছি যত চটকল আছে তাদের সব কটার সায়েবদের মিটিং হচ্ছিল স্থানীয় ইওরোপিয়ান্‌স্‌ ক্লাবে। সবাই একবাক্যে এ মিটিঙে অ্যাসটন সায়েবকেই প্রেসিডেণ্ট করেছিল। চটকল বাজারের আকাশে মেঘ এসেছিল তখন। চিমনির ধোঁয়ার নকল মেঘ নয়—সত্যিকার আসল মেঘ। অ্যাসটন সায়েবের খাঁড়া-নাক বিপদের গন্ধ পেয়েছে—শীঘ্রই বজ্র বিদ্যুৎ স্ফুরণ আরম্ভ হবে চটকল বাজারে। অ্যাসটন সায়েবের গরুড় পাখি কার্তিকেষ্ট মিস্তির ঘরের বাইরে একটা টুলে বসেছিল। সায়ের কিছু জানতে চাইলে জানিয়ে দিচ্ছিল। বুধোর নাম, বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়নের নাম ঘন ঘন শোনা যাচ্ছিল। ম্যাকফারসন সায়েবও এ মিটিঙে হাজির ছিলেন। অভ্যেস মতো অ্যাসটন সায়েবকে কি একটা ঠোক্কর দিতে গেলেন। ধমকে দিলেন অ্যাসটন সায়েব মনের সাধে—ডোণ্ট ড্রিভেল ম্যাকফারসন, শুকুর আলি ইজ গোয়িং টু সার্ভ স্ট্রাইক নোটিশ বাই দি টোয়েন্টিফার্স্ট ইনস্ট্যাণ্ট। তারপরে মিটিঙকে বলেছিলেন—এই ধরনের ইরেস্‌পন্‌সিবল ইয়ংমেনদের জন্তেই ব্রিটিশ প্রেস্টিজ আর ব্রিটিশ ইণ্টারেস্ট বিপন্ন হতে বসেছে কলোনিগুলোয়। কাদের আলি মদের বোতল সাজানো ঠেলাগাড়িটা নিয়ে ঘরের মধ্যে মদ বিলি করতে করতে শুনেছিল সব।

আর একটা মিটিং হচ্ছিল পঞ্চাননতলার মাঠে।

শ্যামধারীকে বুধো এ মিটিঙের প্রেসিডেণ্ট করেছিল। ক্রাচ বগলে, কাটা-পা শ্যামধারী খালি গায়ে গামছা কাঁধে লোহার চেয়ারে বসে প্রায় কেঁদে ফেলেছিল। পঞ্চাননতলার মাঠে ট্রেড ইউনিয়নের লাল ঝাণ্ডার তলায় বসে হাজারখানেক লোক নির্ভয়ে মিল কোম্পানিকে গালাগালি দিচ্ছিল। বুধো

শিউপূজন আরো কত নওজোয়ান সে মিটিঙে ভল্যাণ্টিয়ারি করছিল। ব্রজেশ্বরী দেবীর মিটিঙের সঙ্গে এ মিটিঙের চরিত্রের পার্থক্য দেখলেই বোঝা যাচ্ছিল। কলকাতা থেকে এসেছিলেন চটকল মজদুর ইউনিয়নের এক নেতা। তাঁর সুদীর্ঘ ভাষণের পর শ্যামধারীও তার বক্তব্য বলল। একই কথা সে বিশ্বাস করত, একই কথা সে বলল—ভগবানকো দুনিয়া বিচার বেগর চলনে নেই শেকতা। কোই কিসিমকা বিচার কাঁহাপরি না কাঁহাপরি এ দুনিয়ামে জরুর হোগি—ইয়ে জালিম কোম্পানিকো ভি বিচার হোঙ্গে।

ওই মিটিঙে চটকল মজদুর ইউনিয়নের নবগঞ্জ শাখার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হচ্ছিল।

কতদিকে নবগঞ্জের বেশবদল হচ্ছিল তখন।

মতিচাঁদ বলেছিল—সংসারের মজা হল এই যে, মানুষ সব সময় ওপরের দিকে তাকায়। চড়াই রাস্তা চলবার সময় দৃষ্টি রাখে মানুষ চূড়োয়। এই চূড়োয় পৌছবার জন্যেই তার যত আকুলি-বিকুলি। নবগঞ্জের গল্পেও দেখুন যে যেখানে ছিল সে যদি সেখানেই নট নড়ন চড়ন হয়ে বসে থাকত তাহলে কোনো গল্প, কোনো কেচ্ছাই গড়ে উঠত না। দাবার ঘুঁটি ঘরে বসে থাকলে যেমন খেলা হয় না—সংসারের খেলাতেও তেমনি যে ঘুঁটি নড়ে না চড়ে না থির থাকে তাকে নিয়ে মানুষের কোনো চিন্তা ভাবনা নেই। বকুলবালা, দুলালচাঁদ, বুধো, বিনি, সিঁটে সকলেই যেমন যেমনটি ছিল তেমন তেমনটি থাকতে পারল না বলেই বিকিকিনির হাটের হট্টগোলের গল্পে এত টান, এত প্রাণ।

মানুষের বেলায় যা সত্যি, নবগঞ্জ-জামতলির বেলাতেও তাই সত্যি। সেই অনেককাল আগের পুরনো গল্পের দিনের নবগঞ্জ কবে হারিয়ে গেছে। গোল-পাতার ছাউনি, কাঁচা রাস্তা, কালকাসুন্দের ঝোপ, কাঁচা মেটে বাড়ি দেখতে দেখতে মুছে গেল, মিলিয়ে যাচ্ছে গোরুর গাড়ি ঘোড়ার গাড়ি—এখন পাকা রাস্তা, ইলেকট্রিক আলো, বাস, লরি। নবগঞ্জও থির নয়।

মুছে গেল ভয়—এল বুধোর দিন, এক নতুন বাঘবন্দী খেলা।

সবাই চড়াই বেয়ে বেয়ে উঠছে। যুধিষ্ঠিররা যেমন পাঁচ ভাই বউ উঠছিলেন ঠিক তেমনি কে পড়ে রইল, কে আর উঠবে না সে দাঁড়িয়ে দেখার সময় কারুর নেই।

মতিচাঁদ বলেছিল—বেকার ঘোড়ার গাড়ির মাথায় বসে বসে ঝিমুনি ধরত।

সারাদিনে দুটো তিনটে ভাড়াও তখন জোটে কিনা সন্দেহ। ঝিমুতে ঝিমুতে নবগঞ্জের চেহারাটা স্বপ্নের মতো মনে হত। ধীরুবাবু মোটা হয়ে পড়েছিলেন আরো। চটকলের ঠিকাদারি গুটিয়ে নিচ্ছেন তখন আস্তে আস্তে—ব্যবসায়ী মহলের মাথার মণি হয়ে উঠেছেন তখন। বকুলবালার পোড়া দালানটা ছাড়া আর কোনো কালো দাগ নেই ধীরুবাবুর জীবনে—এই তাঁর সান্ত্বনা।

সিঁটে গুণ্ডা আস্তে আস্তে সিঁটেবাবু হয়ে গেল। জুতোর দোকান জমে উঠল ভালোই। শুধু মস্ত বড়ো চাঁদ মাথার ওপর উঠলে সকাল সকাল দোকান বন্ধ করে বেরিয়ে পড়তেন তিনি। সাইকেল নিয়ে গঙ্গার ধারের রাস্তায় ছুটে বেড়াতেন হু-হু করে। তারপর অনেক রাতে হাক্লান্ত হয়ে ফিরে যেতেন ঘরে।

মতিচাঁদ একদিন ঝিমুতে ঝিমুতে চটকানা ভেঙে অবাক হয়ে গিয়েছিল—দুলালচাঁদ বই বগলে রাস্তা হাঁটছে? না দুলালচাঁদ নয়, নেপালবাবুর ছোট ছেলে বই বগলে রাস্তা হাঁটছে। সেই ছেলে যাকে আমরা স্কুলের পয়লা সিঁড়িতে দেখেছিলাম, তখন সে বড়ো হয়েছে। নেপালবাবু, দুলালচাঁদের মা নবগঞ্জ থেকে মুছে গেছে কবে। কোনো দাগও নেই আর নবগঞ্জের ধুলোয়। শুধু মতিচাঁদের স্মৃতির খাতায় তারা রয়ে গেল।

বিকিকিনির হাটের জাবেদা খাতায় কত আঁকিবুকি, কত কাটাকুটি। কত-জনের হিসেব খোলা রইল। কতজনের হিসেব খতম হয়ে গেল। দিনে দিনে খাতাখানা বেড়েই চলে—বেড়েই চলে। বিকিকিনির হাটের বিষয়-বস্তু মানুষ। মানুষ কখনো পুরনো হয় না—এ খাতাও পুরনো হয় না।

মতিচাঁদকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—বিনির কী হল শেষটা একটু বলে দাও।

মতিচাঁদ বলেছিল—লালমোহন খুন হওয়ার পর বিনি নিধুর মোড়ে দু-দিনের বেশি তিন দিন টিঁকতে পারেনি। দুটো মাতাল লোচ্চা একদিন রাতে জোর করে ওর ঘরে ঢুকেছিল। বিনি দেখল যেখানেই যাক সে লোকে তার শরীরখানা ছাড়বে না। ঝিবৃত্তি করতে গেল দাসপাড়ায়। বাড়ির বাবুর জন্যে ছেড়ে দিতে হল। পুলিসও বিনিকে যেখানে সেখানে বাসা বাঁধতে দেবে না। মাস কতক এমনি করে একা একা যুদ্ধ করার পর বিনি আবার ফিরে গেল পক্ষি পানউলির দরজায়। 'একতলা, বেলতলা শেষকালে বুড়ির ছেঁচতলা।' এই বলে আগাপাশতলা বোঁটিয়ে পক্ষিই শেষকালে তাকে ঘরে তুলে নিল। পরে পক্ষির কাছ থেকেই শোনা গেল

কিছুদিন বাদে—বিনি যা মদ ধরেছে ও আর বেশি দিন নয়।

কোনো কোনো শেষ রাতে, দাওয়ার সামনে যে পইঠার ওপর লালমোহন আর বিনি পাশাপাশি বসে গল্প করত—সেই পইঠার ওপর বিনিকে বসে থাকতে দেখা যেত। একা।

মতিচাঁদের গাড়োয়ানি চুকে যাওয়ার অনেক দিন পরের কথা।

প্রায় পঙ্গু বাতগ্রস্ত শরীরখানা নিয়ে ওর ঘরের সামনে খাটিয়ার ওপর পড়েছিল সে। শীতকালের সকালের মিঠে রোদে ভর্তি ছিল গলি। একটা ছোট ছেলে এসে বলল—জ্যাঠা, তোমায় একটা ভদ্দরনোক আর একটা মেয়েছেলে খুঁজছে। মতিচাঁদ প্রথমটা মনে করেছিল ছোঁড়া বোধ হয় ভুল করেছে। তারপর খোঁড়াতে খোঁড়াতে গলির মাথায় গিয়ে দেখে হ্যাঁ তাকেই বটে। একজন ধুতি পাঞ্জাবী পরা লম্বা চওড়া সুন্দর মতন ব্যাটাছেলে আর লালপাড় রেশমী শাড়ি পড়া, মাথায় লম্বা করে সিঁদুর টানা একজন লক্ষ্মী প্রতিমার মতন মেয়েছেলে, সঙ্গে একটা ছোট্ট দুষ্টু দুষ্টু খোকাবাবু।

বাবুটি জিজ্ঞাসা করেছিল—চিনতে পারছ মতিচাঁদ?

মেয়েটি তার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসছিল। বেশ খানিকক্ষণ বাদে চিনতে পেরেছিল মতিচাঁদ—বিকাশদাদাবাবু আর শোভাদিদিমণি। অনেক দিন বাদে নবগঞ্জে ফিরেছেন তাঁরা। বাড়ির সঙ্গে ঝগড়া মিটে গেছে। খোকা-বাবুটি তাঁদের। বিকাশদাদাবাবু পশ্চিমে কোথায় যেন চাকরি করে।

মতিচাঁদের খবরাখবর সব নিলেন তাঁরা। বিকাশদাদাবাবু বার বার বললেন—সেদিন তুমি না থাকলে কিছুই হত না, মতিচাঁদ।

শোভাদিদিমণি হেসে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েছিলেন। আরো খানিক একথা সেকথার পর শোভাদিদিমণি জিজ্ঞাসা করেছিলেন—সেই যে বিনি? সে কোথায়? তার বর লালমোহন কেমন আছে?

মতিচাঁদ বলেছিল—তারা এখানে থাকে না আর, কোথায় যেন চলে গিয়েছে দুজনে।

যাবার সময় বিকাশদাদাবাবু মতিচাঁদকে দশ টাকা দিয়েছিলেন—বললেন, তোমার অসুখ শরীর, নাও।

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—ওদের কাছ থেকে তুমি টাকা নিলে?

মতিচাঁদ বলেছিল—আমার না নেওয়ার কী আছে, বাবু?